শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

ষষ্ঠ খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
প্রণীত

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সম্পাদিত

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

কারুণ্যামৃত ধারা

ষষ্ঠ খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
সম্পাদক, মহানাম সম্প্রদায়
প্রণীত

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সম্পাদিত

শ্রীশ্রীবঙ্কুলীলা তরঙ্গিণী
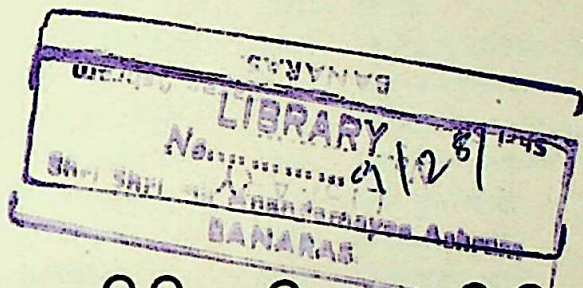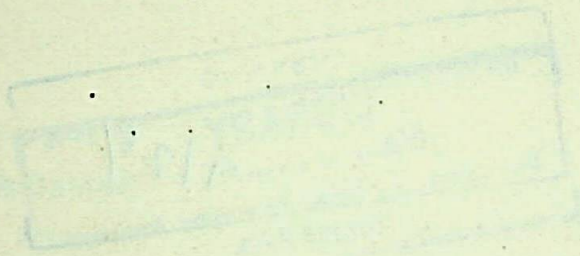
৭/২৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রহ্ম ও ভগবান	১২৪৯	কাহা ঠাকুর	১৩২৬
"জীবন কাণ্ডারী"	১২৫১	বিধানী	১৩৩০
"মহাপ্রভুর অঙ্গহানি হয়"	১২৫৪	"খুঁটি ছুয়ে প্রতিজ্ঞা কর"	১৩৩৩
কৃপাভিখারী	১২৫৬	ভক্তবর মথুরানাথ	১৩৩৪
"কৃষ্ণ প্রেম শুচ্যাহুতি"	১২৫৮	টেপাখোলায় কৃপার ধারা	১৩৩৫
"আমি অসম্প্রদায়ী নই"	১২৬০	"ও মেটে শালগ্রাম"	১৩৩৯
"ফরিদপুরে হাঁটুজল"	১২৬১	ভক্ত কুঞ্জবিহারী	১৩৪১
পলাতক আসামী	১২৬২	সেবাইত হররায়	১৩৪২
ভক্ত ও ভগবান	১২৬৫	"বন্ধু মানুষ নয়"	১৩৪৩
মান অভিমান	১২৬৭	নববর্ষের উপদেশ	১৩৪৬
"কেমনে বিদায় দিব"	১২৭৩	গৌরকিশোর সাহা	১৩৪৯
দেহ গেহ ধন্য হ'ল	১২৮৩	মুক্তাদাসী	১৩৫১
"নবা, শিবকে বাতাস কর"	১২৮৪	মাদারী সাহা	১৩৫৫
শ্রীঅঙ্গন প্রকাশ	১২৮৫	ডাঃ উষারঞ্জনের প্রতি কৃপা	১৩৫৭
শ্রীশ্রীবন্ধুকুণ্ড	১২৯২	নবাবের স্পেশাল ট্রেণ	১৩৬২
"আমায় ঝেড়ে দে"	১২৯৩	"যে বস্তুর যতক্ষণ সুকৃতি"	১৩৬৪
"তিন ডাকেই কেষ্ট পেলি"	১২৯৫	"সুধা বড় লোভী"	১৩৬৭
ছোট জয়নিতাই	১২৯৬	"প্রকৃতির পুলক"	১৩৬৯
"ওকে মায়ায় গ্রাস করেছে"	১৩০৩	"হিন্দু মুসলমান সমান"	১৩৭২
আত্মার খেলা	১৩০৪	হরিনাম করবো না	১৩৭৮
অপ্রাকৃত স্মরণ	১৩০৫	বিষদানে পরীক্ষার চেষ্টা	১৩৮৩
"নাম শুনে মুক্ত হলেন"	১৩০৬	শিশির কুমারের উপর কৃপাবর্ষণ	১৩৮৬
কেদার কাহা	১৩০৮		
ডুগু ডুগুতা	১৩১২	নবদ্বীপের উপর বিশেষ কৃপা	১৩৮৭
রাসলীলা স্মৃতি	১৩১৪	পূর্ণ সুধার পানিফল	১৩৯৩
সর্পাঘাত ও চন্দ্রপাত	১৩১৭	বন্ধুসুন্দরের নিজ জন	১৩৯৩
মহালীলার রেখাচিত্র	১৩১৯	চম্পটীর ভিক্ষার ঝুলি	১৩৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
"প্রলয়কাল কীর্ত্তন সত্য"	১৪০৫	পুলুবাবুর মধুরভাব	১৪৮৮
শ্যাম ডাক্তারের কথা	১৪০৭	কুম্ভমেলায় "সত্যযুগ"	১৪৯১
আট দফা ফর্দ্দ	১৪০৯	ভক্তবর তারক গাঙ্গুলী	১৪৯৩
মহর্ষি সংবাদ	১৪১২	পাতা-ঢাকা টাকা	১৫০১
জগন্নাথ মন্দিরে বঙ্কুহরি	১৪১৯	"জলে পোকা পড়িয়াছে"	১৫০২
অমাবস্যায় চাঁদের আলো	১৪২৩	নৈশভ্রমণ লীলা	১৫০৬
রজনী নাগ	১৪২৬	ভক্তবাৎসল্য	১৫১০
চালিতা বৃক্ষ	১৪৩১	"আমি শবাকার হইয়া পড়িতেছি"	১৫১১
গান লেখা শেষ	১৪৩৫	ভাবোন্মাদ অবস্থা	১৫১৬
"নিতাই শক্তি বদলানে মহাপরাধ"	১৪৩৬	কীর্ত্তনের শক্তি	১৫৩৩
শাক ভিক্ষা	১৪৩৯	কালিন্দীমোহন	১৫৩৫
"ক্ষণে জন্মিয়াছি"	১৪৪২	"নাম কর, সময়ে বুঝতে পারবি"	১৫৪০
আত্ম পরিচয়	১৪৪৬	"ইংরেজকে সুহৃদ বলে জানবি"	১৫৪৬
কুঞ্জবিহারীর নির্য্যাণ	১৪৪৮	ডোম রমণীদের বীরপণা	১৫৪৭
হরিনামে শক্তি	১৪৫০	মহাভাবাবিষ্ট	১৫৪৯
শুধু তোমাকেই চাই	১৪৫৫	"মানব জন্ম পাপ করিবার জন্য নয়, কৃষ্ণসেবার জন্য"	১৫৫৩
কলহ কৌতুক	১৪৫৬	"যম তো উদ্ধার হয়ে গেছে"	১৫৫৫
"জয়চন্দ্র বাঁচবে রে"	১৪৬০	লোকনাথ সরকার	১৫৫৬
"গোবিন্দ আয়"	১৪৬৬	নগরবাড়ী বিজয়	১৫৬৩
দুইটি ভাব	১৪৭১	কাঙ্গাল রজনী	১৫৬২
মানীর অপমান	১৪৭৪	কালিকাবাড়ী বিজয়	১৫৬৭
আর্ত্তিতে আবির্ভাব	১৪৭৫	মহামৌন মন্দির	১৫৬৯
"আমার তত্ত্ব আমি বলছি"	১৪৭৯	টেপাখোলার দান	১৫৭১
শরৎকে সংবাদ দে	১৪৮২		
তারকেশ্বরের বিদায়	১৪৮৪		
জ্যোতীশবাবুর আম	১৪৮৬		

নিবেদন

লীলাময়ের অপার করুণায় লীলাতরঙ্গিণীর ষষ্ঠখণ্ড প্রকাশিত হইলেন। আমরা ভাঙ্গা যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রীর ইচ্ছাতেই যখন যাহা হইবার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের লীলা-সম্ভার সকলই ভক্তগণের কৃপার দান। মহিমদাস মহাশয়ের কথা, কেদার কাহার কথা, পূর্ণঘোষ মহাশয়ের কথা, ঊষারঞ্জন ডাক্তারের কথা, সুরতকুমারী দেবীর কথা, রজনী নাগের কথা, সকলই তাঁহাদের নিজ নিজ মুখ হইতে একাধিকবার শুনিবার ভাগ্য পাইয়াছি। শ্যাম ডাক্তারের কাহিনী কুঞ্জ দাদার দান। হরিদাস মোহন্তের কথা তাহার পুত্র মনোমোহন মোহন্তের নিকট শুনিয়াছি। সুধন্ব সরকারের কাহিনী প্রেমদাসজী নিজে শুনিয়া ডাইরী করিয়া ছিলেন তাহা হইতে গৃহীত। রামদাসজীর কাহিনী ও তারক গাঙ্গুলীর ঘটনা মহানামব্রতের সংগ্রহ। রমেশ দাদা শেষ শয্যায় অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আর নবদ্বীপ দাসজীর ভাণ্ডারের চাবী ত আমাদের হাতেই দিয়াছেন।

মহর্ষি সংবাদ মহেন্দ্রজীর "জগদ্‌গুরু" গ্রন্থ হইতে লওয়া। ভাবোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা সুরেশ চক্রবর্ত্তী দাদার বন্ধুকথা হইতে হুবহু উদ্ধৃতি। জগদ্‌গুরুর গ্রন্থকর্ত্তা মহেন্দ্রজী ও "বন্ধুকথা" প্রণেতা সুরেশদাদার কাছে আমাদের ঋণ সর্ব্বাধিক। শুধু মামুলি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সে ঋণ ঘুচে না। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা অনুকরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"তার কৃপায় করি তার উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ।"

আর এক কথা এই যে, একই লীলা ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের মুখ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাহির হয়। তন্মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়া সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

যাহারা নিপুণভাবে গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাহারা কিছু কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কোন কোন লীলাকথা একাধিকবার বলা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ছোটবড় ভুল রহিয়াছে। কতক আমাদের অসাবধানতায়, কতক প্রেসের ত্রুটিতে। কুঞ্জবিহারীর নির্য্যাণ ১৩০৭ সন স্থলে ১৩১৭ হইয়া রহিয়াছে (পৃঃ ১৪৪৮) 'আটদফা ফর্দ্দের' লিষ্ট (পৃঃ ১৪০৯) খুব সম্ভব ঠিক হয় নাই। উহার মধ্যে লণ্ঠন, ইজিচেয়ার প্রভৃতি ছিল শুনিয়াছি। আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র জীব, ভুল ভ্রান্তিতে জীবন ভরা। লীলাগ্রন্থকে নির্ভুল নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা সততই আছে। নিজ অযোগ্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ আছি। ভক্তবান্ধব কৃপা করিয়া দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিলে সযত্নে সংশোধন করিতে সর্ব্বদাই আগ্রহশীল রহিয়াছি। শ্রীপাদ কুঞ্জদাদা প্রত্যেকটি অক্ষর পাঠ করিয়া বহু উপদেশ দানে গ্রন্থকে দোষশূন্য করিতে যত্ন করিয়াছেন।

"বাণীবিজয়" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী প্রথিতযশা লেখিকা জীবনবালা দেবী জীবনের শেষভাগ শ্রীবৃন্দাবন ধামে গভীর ভজনানন্দে কাটাইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীধামেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। একবার তিনি ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন দর্শনে আসিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার স্নেহলাভ করি ও তাঁহার গভীর ভজনাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। ব্রজে দেহ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে "শ্রীভগবানের লীলাবিলাস" কবিতা লিখিয়া তিনি আমাদিগকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐটি এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপে সংযোজিত করিলাম।

শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন নিজ মহানাম নিজেই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (পৃঃ ১৩২৪) ঐ ঘটনাকে মহানাম মহাকীর্ত্তনের "শুভ অধিবাস" বলিয়া অভিহিত করতঃ পূজনীয় কুঞ্জদাসজী মঙ্গলাচরণ পাঠাইয়াছেন। তাহা পুরোবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

এই খণ্ডে কারুণ্যামৃত ধারা শেষ হইল। জীবগণকে অশেষ প্রকারে

কৃপা করিবার প্রয়োজনে, ভক্তগণকে বিবিধপ্রকারে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে বন্ধুসুন্দরের দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যে ছুটাছুটি, তাহা শেষ হইল। করুণার নদনদীর প্রধাবন এখন গম্ভীরার মহাসাগরের স্তব্ধতায় পর্য্যাপ্ত হইবে। এখন হইতে বন্ধুহরি ফরিদপুর-ধামে শ্রীঅঙ্গনের লাবণ্যামৃত সমুদ্রে স্থির শান্ত অচঞ্চল হইয়া স্বানুভাবে স্বাস্বাদনে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবেন। লাবণ্যামৃতধারা আরম্ভ হইবে। ইহার মধ্যেও করুণার প্রবাহ চলিবে, সমুদ্রের অন্তস্তল দিয়া। বাহিরে আস্বাদনের প্রশান্ততা, অন্তরে করুণার উদ্বেলতা, এবম্ভুত পরবর্ত্তী লীলা যদি স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রকটিত হন, তবেই সপ্তম খণ্ডে, তাহা রূপ লাভ করিবে।

আমি গাধা, বাজারের বোঝা বই মাত্র। লীলাসম্ভার জোগাড় করি, আস্বাদন ত করিই না, সাজাইতে গোছাইতেও জানি না। সাজাইয়া গোছাইয়া রসুই করে শ্রীমান মহানামব্রত। আর ভক্তদের পাত্রে পরিবেশন করে প্রিয়জনেরা, চন্দ্রনাথ প্রেসের সহায়তায়। ভক্তগণ আমাকে কৃপা করিবেন, যেন লীলা-লাবণ্যামৃতের বাজার এ ভগ্নপৃষ্ঠে বহিতে পারি। যে রসুই করে ও যারা পাত্রে দেয় তাহাদেরও আশিস করিবেন, যেন তাহাদের উৎসর্গীত জীবনের সেবা লীলানটবর গ্রহণ করেন।

—গোপীবন্ধু

~ লীলাতরঙ্গিণী প্রাপ্তিতে ~

পূজ্যপাদ কুঞ্জদাদার কল্যাণ বাণী

শুভ অধিবাস

"অযাচিত উদ্ধারণ বাসিত সংসার"

"পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোঽপি দুষ্কর্ম্মণাং
সীমাপি শ্বপচাধমোঽপি সততং দুর্বাসনাঢ্যোঽপি চ।
দুর্দ্দেশপ্রভবোঽপি তত্র বিহিতাবাসোঽপি দুঃসঙ্গতো
নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে॥"

—শ্রীচন্দ্রামৃত ৭৮

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালুতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই কৃপালুতা শ্রীগ্রন্থে শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এইবার শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরে সাক্ষাৎ কৃপালুতা দর্শন করিতে ভাগ্য পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীবন্ধুর কৃপালুতা কি অপরিসীম! কত অতি-পাতকী, কত শত নীচ জাতি, কত কদর্য্য স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি, কত দুষ্কর্ম্মের চরমসীমায় উপনীত ব্যক্তি, কত সর্ব্বদা দুর্ব্বাসনারত ব্যক্তি, কত দুর্দ্দেশজাত, দুর্দ্দেশে বাসকারী ব্যক্তি, অসৎসঙ্গে নষ্টব্যক্তি শ্রীশ্রীবন্ধুহরির কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন।

করুণার সমুদ্র শ্রীশ্রীবন্ধুহরি শ্রীহরিকথা গ্রন্থে স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"কোন দোষ নাই হে, কীট কুহকজাত'
কীট গুরু-তাপ-তাত॥"

কুহকজাত গুরুতর তাপে তাপিত কীট-স্বভাব জীবের কোন দোষ নাই। মহাঅপরাধী জীবেরও দোষ গ্রহণ করেন নাই। এই করুণা

বর্ণনাতীত। যেন মূর্ত্তিমান করুণা! কোন যুগে এমন করুণার কথা শ্রবণ করা যায় নাই।

যখনই শ্রীভগবান লীলায় আসেন, তখন তাঁহার ভক্তগণই তাঁহার মধুময় লীলাকথা বর্ণনা করিয়া জগজ্জীবকে ধন্য করেন। কিন্তু, এবার কি করুণা প্রকাশ! স্বয়ং নিজেই তাঁহার মহাউদ্ধারণ লীলাগ্রন্থ লিখিয়া প্রিয়গণের দ্বারা গান করাইয়া এবং নিজেও গাহিয়া মহাউদ্ধারণ লীলার **শুভ অধিবাস** করিলেন। শ্রীগ্রন্থের নাম রাখিলেন চন্দ্রপাত। পৃষ্ঠা ১৩১৭-২৫। শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে চন্দ্রপাত গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। "চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে। কীর্ত্তন হইতে অধিক আর কিছুই নাই।"

স্বনাম-প্রিয় প্রভুবন্ধু নিজ মহানামানন্দে বিভোর। শ্রীশ্রীবন্ধুনামে শ্রীশ্রীবন্ধুহরির কত আনন্দ!

১৩২৫ সালে চৈত্র মাসে একদিন শ্রীশ্রীঅঙ্গনে পাকা মন্দির মাঝে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীশয্যায় শয়ান আছেন। আমরা চারি পাঁচজন শ্রীচন্দ্রপাত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম, শ্রীচরণতলের দিকে বসিয়া। একখানি শ্রীমৃদঙ্গ বাজিতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর দিকে চেয়ে চেয়ে কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রীশ্রীবন্ধুর শ্রীচরণ তালে তালে দুলিতেছে। যখন "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাবে" এই পদ গাইতেছি, তখন শয্যা হইতে উঠিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিলেন অতি মধুর দোলান ভাবে। যেন কত আনন্দ!

জয় শ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী। সুমধুর শ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা সুমিলিত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলার জয়। জয় জগদ্বন্ধু! জয় বন্ধুভক্তবৃন্দ!!

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম
শ্রীধাম ডাহাপাড়া

কাঙ্গাল—কুঞ্জদাস

ব্রজকুঞ্জে ভজনরতা, অধুনা নিত্যধামগতা

'প্রেমমঞ্জরী' শ্রীযুক্তা জীবনবালা দেবীর গভীর ভজনাবেশে

—বিরচিতা—

লীলা-ভূমিকা

শ্রীভগবানের লীলাবিলাস

হইলে ধর্ম্মের গ্লানি, বাসুদেব চক্রপাণি,
অবতীর্ণ হ'ন মর্ত্ত্যলোকে।
পরিত্রাণ সাধুজনে, দণ্ডদান দুষ্টগণে,
এইকার্য্য করি ধর্ম্মালোকে॥
অন্ধকার করি নাশ, হন পুনঃ অপ্রকাশ,
বটপত্রশায়ী নারায়ণ।
শিশুভাবে ক্রীড়ারত, বাধা ও বন্ধন গত,
সাত্মানন্দে হইয়া মগন॥
মর্য্যাদা পুরুষ নাম, পুরুষ উত্তম রাম,
মর্য্যাদায় দিয়া দরশন।
রামরাজ্য সংস্থাপন, করিয়া অদৃশ্য হন,
করি সেই লীলাসম্বরণ॥
লোকে ভাবে ব্রহ্ম বুঝি, শুধু মর্য্যাদার পুঁজি?
সেই ভাবে ভাবে আর বলে।
অন্তরালে ব্রহ্ম হাসে, সে ঘোর অন্ধতা নাশে,
নিল জন্ম পুনঃ ধরাতলে॥

গোপীকার প্রেমে ম'জে, নানা লীলা করে ব্রজে,
গোপ-বেশী শ্রীরাধারমণ।
প্রেমলীলা করি শেষ, মথুরায় হৃষীকেশ;
দুষ্ট কংসে করিলা নিধন॥

ব্রজভূমে শ্যাম রায়, নাচে খেলে হাসে গায়,
ছলা কলা করিয়া আশ্রয়।
কোথায় মর্য্যাদা তাঁর, খুঁজিলে পাওয়াই ভার,
সূক্ষ্মভাবে ভাবিলে মিলয়॥

কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানেশ্বর, বেত্রপাণি রথোপর,
পার্থের সারথি রূপ ধরি।
দ্বারকায় রাজ রাজ, শ্রেষ্ঠ ভোগী ভূবি মাঝ,
বিরাট ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করি॥

পূর্ণব্রহ্ম অবতারী, হয় কৃষ্ণচন্দ্র হরি,
সর্ব্ব ভাবাশ্রয় কেহ বলে।
ব্রহ্মে আর ভাব নাই, নিঃশেষ হয়েছে ভাই,
কৃষ্ণচন্দ্র উদিয়া ভূতলে॥

পুনঃ নব বিপ্রবেশ, ধরিলেন হৃষীকেশ,
অভিনব রাধাভাবাশ্রয়ে।
নিজ নব ভাবধারা, বহায় উন্মাদ পারা,
অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে॥

কীর্ত্তন অঙ্গনে গিয়া, কাঁদে কৃষ্ণনাম নিয়া,
কভু ব্রহ্মভাব প্রকাশয়।
ভক্ত ভগবান দুটি, একাধারে উঠে ফুটি,
কি বিচিত্র ভাবের নিলয়॥

লোকের লাগিল ধাঁধা, এ কি কৃষ্ণ! কিংবা রাধা!
আরাধিকা আরাধ্য উভয়ে।

মিলে মিশে করে খেলা, বসায়ে প্রেমের মেলা,
এ উহার মাঝে লয় হ'য়ে॥

একি অভিনব রস, অনাস্বাদ্য অপরশ;
শ্রীগৌরহরি পরশিল?

যাহা পানে মত্ত লোক, ভুলি লোক পরলোক,
গৌরাঙ্গে পরাণ সমর্পিল॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, সৎচিৎ আনন্দকন্দ,
ভগবান কৃষ্ণ বলরাম।

করে লীলা নদীয়ায়, দুই ভাবে দুজনায়,
বিলাইয়া হরেকৃষ্ণ নাম॥

ভগবান ভাবোল্লাসে, যথা ক্রমে ক্রমে আসে,
প্রেমের বিকাশ করি ক্রমে।

নিত্য হ'তে মর্ত্ত্যে আসে, প্রেমিকের প্রাণে ভাসে
গর্ব্বে জ্ঞানী পড়ে মহাভ্রমে॥

অনন্ত ব্রহ্মের ভাব, কেবা বুঝে সে স্বভাব,
জ্ঞানের বড়াই কার আছে?

স্বেচ্ছাময় ভগবান, স্বেচ্ছায় আসেন যান,
নিজের কীর্ত্তনে নিজে নাচে॥

হরির হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীরাধার প্রেমাভক্তি,
অনর্পিত জগতে যা ছিল।

করিতে তা' সুপ্রকাশ, অবতীর্ণ শ্রীনিবাস,
দিব্যোন্মাদ ভাবে প্রকাশিল॥

এইরূপ নানা কাজ, করিলেন বিশ্বরাজ,
নানাভাব করিয়া বিস্তার।

লোকে ভাবে শেষ এই, আর কিছু ভাব নেই,
ভগবানে দেখাতে আবার॥

কিছুকাল মতভেদ, বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে খেদ,
উপজিল বাংলার বুকে।
চৈতন্য আদর্শ ভুলি, বৈষ্ণবীয় ঝুটা বুলি,
বলিতে লাগিল লোকে সুখে ॥

দেখিয়া ধর্ম্মের গ্লানি, বাসুদেব চক্রপাণি,
অবতীর্ণ হলেন ধরায়।
শ্রীজগদ্‌বন্ধু নাম, ধরিলেন গুণধাম.
জগত উদ্ধার অভিপ্রায় ॥

রূপের নাহিক শেষ, চরিত্রে মালিন্য লেশ,
নাই, নাই স্বভাবে বন্ধন।
মুখে রটে নিজনাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম,
বিশ্বজনে করি আকর্ষণ ॥

কৃষ্ণনাম আকর্ষয়, রাম রমে বিশ্বময়,
শ্রীমুখে বোলয় যবে নাম।
কি শক্তি সঞ্চারে লোকে, দেখা নাহি যায় চোখে,
প্রভু জগদ্বন্ধু গুণধাম ॥

সুদূর প্রসারী গন্ধ, অঙ্গে বহে মন্দ মন্দ,
সেই গন্ধে মেতে আসে লোক।
ভৃঙ্গ সম দলে দলে, দর্শন আশায় চলে,
ভুলি গৃহদ্বার দুঃখ শোক ॥

যে আসে সে নাহি ফিরে, বন্ধু-কমলেরে ঘিরে,
থাকে তারা ভুলিয়া আপন।
বাজে করতাল খোল, মুখে বলে হরিবোল,
শ্রীঅঙ্গনে করিয়া কীর্ত্তন ॥

মেতে উঠে বঙ্গভূমি, বন্ধুর চরণ চুমি,
লোকে বলে এসেছে আবার।
নদীয়ার গোরাচাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
বশীভূত করিতে সংসার ॥

নিতাই গৌরাঙ্গ দোঁহে, এসেছে একাঙ্গ হ'য়ে,
আচণ্ডালে হরিনাম দিতে।
জয় জগদ্বন্ধু রোল, উঠে এই মহারোল,
সংকীর্ত্তনে ডোম বুনা মাতে ॥

কিছুদিন এই লীলা, বঙ্গভূমি মাতাইলা,
পরে প্রভু গম্ভীরায় পশে।
ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃকালে, সূর্য্যকর অন্তরালে,
থাকিল ডুবিয়া কোন্ রসে ?

দশ দশা শ্রীরাধার করে যেন অঙ্গীকার,
গম্ভীরায় গোপন হইয়া।
চেতন কি অচেতন, নাহি জানে কোনজন,
বাহির হইতে তথ্য নিয়া ॥

কভু কিছু খাদ্য খায়, কভু উপবাসে যায়,
কতদিন কেহ নাহি জানে।
নির্ব্বাক নিঃশব্দ থাকে, কিবা মহাভাব চাখে,
ক্ষুধা তৃষ্ণাহীন কোন্ প্রাণে ॥

কেহ যদি মনে চায়, প্রভুর যুগল পায়,
আত্মদান করিতে আপন।
থাকিয়াও অন্তরালে, ইঙ্গিতে "তথাস্তু" বলে,
মধুকণ্ঠে শব্দের সৃজন ॥

বহু মাস বর্ষ দিন, এ ভাবে হইল লীন,
দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ মাঝে।
এক মাঘী পূর্ণিমায়, বন্ধুচাঁদ বাহিরায়,
স্বানুভাবানন্দে রস সাজে ॥

নিমিষে হরিল সুধা, লোকের চোখের ক্ষুধা,
বন্ধুচাঁদ উদিল যখন।
একদৃষ্টে সবে চায়, অদ্ভুত বালক প্রায়,
বন্ধুহরি মহাউদ্ধারণ ॥

ভাবে গড়া দেহ প্রাণ, নরাকারে ভগবান,
সেই বটপত্রশায়ী হরি।
বালোচিত হাব ভাব, ভাঙ্গা গড়া সে স্বভাব,
দেখাইতে এলো দয়া করি ॥

শিশুব্রহ্ম শিশুরাজ, লোকের গোচরে আজ,
প্রকটিত হইলেন আসি।
সে সরল ভাবোচ্ছ্বাসে, অন্তরঙ্গগণ ভাসে,
প্রভুরে প্রাণের সম বাসি ॥

সে বাল-মুকুন্দ আজ, সাজিয়া বালক সাজ
প্রভু শিশু হইয়া ধরায় ॥
মহাউদ্ধারণ লীলা, মহানাম প্রচারিলা,
ফরিদপুরের আঙ্গিনায় ॥

ধ্যানে যোগী ডাকে যাঁকে, উলঙ্গ বসিয়া থাকে,
শিশুভাবে বন্ধু ভগবান।
মুখেতে গাম্ভীর্য্য রাশি, কভু সারল্যের হাসি,
মাতায় ভক্তের মনপ্রাণ ॥

কখন কি ভাবে রয়, কে বুঝিবে কি উপায় ?
অনন্তের অনন্ত ভাবনা।
নির্ব্বাক হইয়া লোকে, শুধু দেখে দুই চোখে
সহজ কি ক্ষিপ্ত এই জনা ?
এখানে সেখানে যায়, বসে আরাম কেদারায়,
পঙ্গু সাজি করয় আদেশ।
এইরূপে অন্ত্যলীলা, সে অনন্ত সমাপিলা,
রক্ষা করি প্রেমার আবেশ॥
এইবার অবতরী, শিশুভাব ধরে হরি,
নারায়ণ বটপত্রশায়ী।
নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ চুষি, দেখায় আপন খুসী,
আত্মানন্দ অনুভাবযায়ী॥
আবার আসিব বলি, গিয়াছে এবার চলি,
জানিনা "আবার" কবে হবে।
এবার কি ভাব নিয়া, আসিবে সে বিনোদিয়া,
রঙ্গমঞ্চ তার এই ভবে॥
হে প্রভু ত্রিতাপ জ্বালা, জীবন করিল কালা,
ডাকিতে পারি না প্রাণ খুলে।
অহেতু কৃপার গুণে, এস ক্ষীণ ডাক শুনে,
স্মরি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সকলে॥

শ্রীজীবনবালা দেবী, হাড়াবাড়ী কুঞ্জ
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম

৩১শে আষাঢ়,
১৩৬২
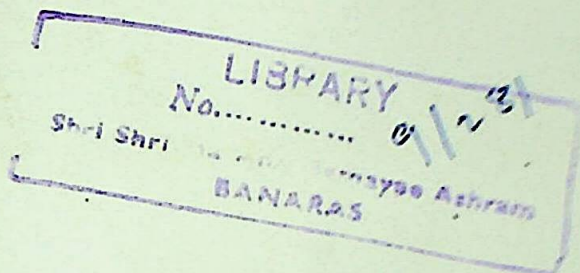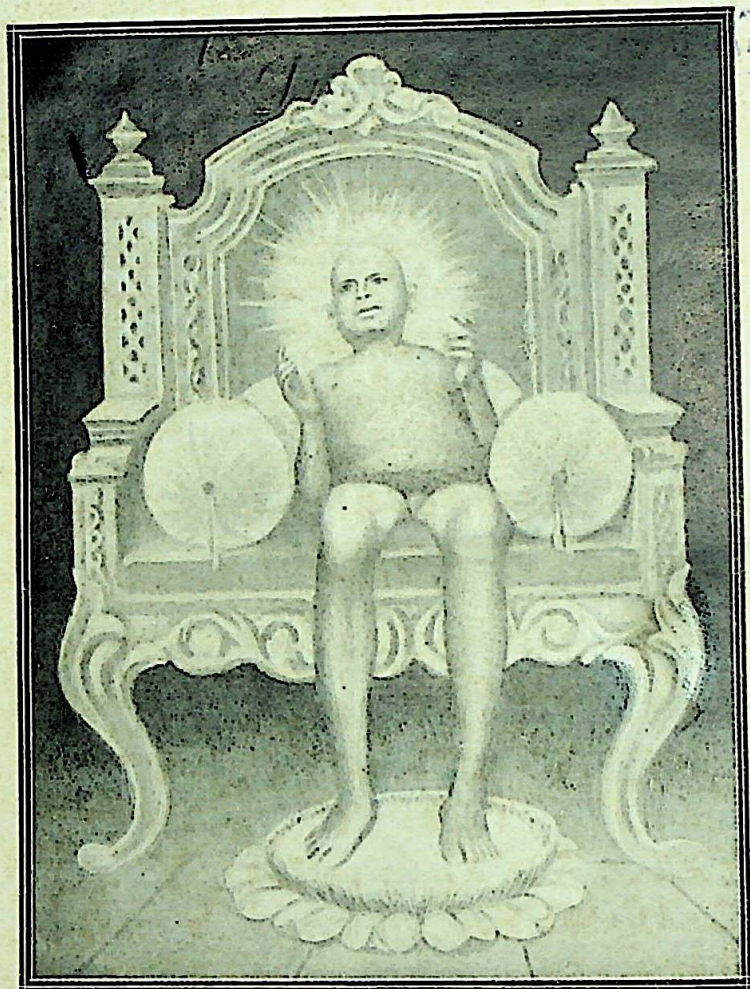
শিশুভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর
(৫০ বৎসর)

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

কারুণ্যামৃত ধারা

ব্রহ্ম ও ভগবান

"কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার"

—কবিরাজ গোস্বামী

ব্রহ্মতত্ত্বটি অন্য নিরপেক্ষ। ভগবত্তত্ত্বটি কিন্তু তদ্রূপ নহে। ভগবত্তত্ত্বটি ভক্ততত্ত্ব সাপেক্ষ। ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার। ভগবান সগুণ সবিশেষ চিদাকার। স্বরূপ-সত্তার জন্য ব্রহ্ম অপেক্ষা রাখেন না কাহারও। ভগবান অপেক্ষা রাখেন ভক্তের।

ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ। ভগবদ্বস্তু ভক্ত সঙ্গে সম্পূর্ণ। ভক্ত ভগবান দুই মিলিয়া অখণ্ডতা। পত্নীত্ব ছাড়া পতিত্ব অর্থহীন, ভক্ততত্ত্ব ভিন্ন ভগবত্তত্ত্ব নিরর্থক। রসনা সহযোগেই শর্করার মধুরতা। ভক্ত সঙ্গমেই ভগবানের ভগবত্তা।

ভক্ত, ভগবানের একটি বিলাস বিগ্রহ। ভগবানও ভক্তের প্রীতিসম্বন্ধাবগাহী একটি রসবিগ্রহ। ব্রহ্ম "অপাণিপাদ", ভগবান "জবনো গৃহীতা।" ব্রহ্মের হস্তপদ নাই। ভগবান চলেন ও গ্রহণ করেন। ভক্তের দিকেই চলেন, ভক্তের দেওয়া প্রীতি-রসই গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম অচল, ভগবান সচল। ভক্তের অভিমুখেই তাঁহার চলন।

ব্রহ্ম-স্বরূপের কোন কর্ম্ম নাই। বিভু কিনা, তাই কর্ম্ম হইতে পারে না। ভগবৎ-স্বরূপের কর্ম্ম আছে, নিশ্চয়ই আছে। করুণানিলয় কিনা, তাই কারুণ্য থাকিলে কর্ম্ম না থাকিয়া পারে না। ভগবানের কার্য্যের হেতুভূত হইতেছেন ভক্ত।

ভক্তের জন্য ভগবান সবই করেন। ভক্তই যে তাঁর সব। ভক্তের জন্য করিবেন না ত কার জন্য করিবেন! ভক্তের জন্য তিনি যা করিতে পারেন, মানুষের সাধ্য নাই তাহা কল্পনাতেও আনে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥

আপন ইচ্ছায় ভক্তের দাসত্ব করেন। নিজের ইচ্ছাতেই। কেহ কিন্তু বাধ্য করে না। ভক্তিবশতা তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম।

প্রহ্লাদকে বাঁচাইয়াছেন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া। মহারাজ পরীক্ষিতকে বাঁচাইয়াছেন জননী উত্তরার গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিয়া। আজ ভক্তবর মহিমদাসকে বাঁচাইয়াছেন পদ্মার স্রোতে নামিয়া স্বহস্তে তাহার নৌকা ঠেলিয়া। এই সকল ভক্তরক্ষণ কার্য্য ইচ্ছা হইলে করিতে পারেন গোলোকে বৈকুণ্ঠে থাকিয়া, বা নিজ-মন্দিরে বসিয়া। কিন্তু কেন যেন তাহা করেন না। ইহাই লীলার বিচিত্রতা। ভক্ত তাই লিখিয়াছেন—"মহিম রক্ষণ লীলা বিচিত্র।"

———

জীবন কাণ্ডারী

"মহিম জীবন চির-কাণ্ডারী বন্ধু"

ভক্তবর মহিমদাসের প্রথমা স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন। মহিম মনস্থির করিয়াছেন, আর বিবাহ করিবেন না। তাহার পিতা রাজনাথ দাস মহাশয় পুত্রের সংকল্পের কথা জানিয়া, শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

কেন মহিমের আবার বিবাহ করা উচিত তাহা নানা ভাবে প্রভুর সন্নিধানে ব্যক্ত করতঃ দাস মহাশয় প্রভুর শ্রীচরণে অনুনয় করিয়াছেন, মহিমকে বিবাহ করিতে আদেশ দিতে। শ্রীশ্রীপ্রভু মহিমকে ডাকিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।

বলিবার সুযোগ পাইয়া মহিম তখন কতিপয় সাংসারিক অশান্তি উদ্বেগের কথা প্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। সে সকল কথার কোন মৌখিক জবাব না দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীলেখনী করে লইয়া লিখিলেন,—

"উপহাস যাবে,
মান্য হবে,
ঐশ্বর্য্য হবে,
শত্রু যাবে,
সর্ব্বমঙ্গল হবে।"

পিতা মহিমের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, ঢাকা জেলায়। দিন স্থির। যাত্রার পূর্ব্বে মহিম শ্রীশ্রীপ্রভুকে প্রণাম করিতে আসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "মহিম, যাও, সর্ব্বকার্য্যে ভানুনন্দিনীর জয় দিও। সকলে ষ্টীমারে যাতায়াত করিও।"

বিবাহ-কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এখন সকলে ফিরিবেন। ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার মধ্যে বিশাল পদ্মানদী। যাইবার সময় ষ্টীমারেই পার হইয়া গিয়াছেন। ফিরিবার সময় বরযাত্রী কন্যাযাত্রী মিলিয়া বহু লোক। মহিমের পিতা বলিলেন, এত লোক ষ্টীমারে গেলে ভাড়া খরচ বিস্তর—একটা বড় নৌকা করিয়া সকলে যাইব।

মহিম পিতাকে নিষেধ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পিতা বলিলেন, পদ্মা এখন খুবই শান্ত, আকাশ পরিষ্কার। কোন ভয়ের কারণ দেখি না। বিবাহের দিনে পিতার সঙ্গে পুত্রের বাদ প্রতিবাদ অশোভন মনে করিয়া মহিমও রাজী হইলেন।

নৌকা ছাড়িয়া মধ্য-পদ্মায় আসিয়াছে। এমন সময় গগনে ঘনঘটা দেখা দিল। মুহূর্ত্তে ঘূর্ণীবায়ু প্রবল হইয়া উঠিল। এপাশে ওপাশে দুই তিনখানা বড় নৌকা ডুবিয়া গেল। মহিমদের নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। কখন শেষ হইয়া যায় তাহার স্থির নাই।

সবাই বিষণ্ণ। মহিম ডাকিতেছেন আকুল কণ্ঠে। জয় রাধে জয় রাধে বলিয়া ভানুনন্দিনীকে ডাকিলেন। তারপর বুক ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় জগদ্বন্ধু হরি!"

মহিমের সঙ্গে সকলে যোগ দিল। চারিদিকে ঝড়বাতাসের প্রচণ্ড গণ্ডগোল। তার মধ্যে বহুকণ্ঠে "জয় জগদ্বন্ধু বোল" রোল উঠিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সকলেরই মনে হইল, যেন একটা দমকা বাতাস কোন্ দিক হইতে আসিয়া নৌকাখানিকে একটা

চড়ার মধ্যে উঠাইয়া দিল। সেখানে জল খুবই কম। নৌকা বাঁচিয়া গেল।

ঝড় থামিলে নৌকা ছাড়িল। মহিম বাড়ীর ঘাটে পৌঁছিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিতেই মহিম ব্যস্ততার সহিত তীরে উঠিয়া প্রভুর দর্শন উদ্দেশে ছুটিলেন। বাবা বলিলেন, "মহিম, বিবাহের পর বাজনা বাজাইয়া বধূসহ আগে ঘরে উঠিবার নিয়ম।" মহিম বলিলেন, "বাবা, প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসি, তারপর বিধিমত কার্য্য করিব।"

ছুটিয়া গিয়া মহিম শ্রীশ্রীপ্রভুর সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছেন, মনের ইচ্ছা, দণ্ডবৎ করিয়া পথের বিপদের কাহিনী বলিবেন। কিন্তু বলিবেন কি? প্রভুর শ্রীঅঙ্গের অবস্থা দর্শন করিয়া একেবারে বেদনাহত হইয়া পড়িলেন।

অতীব ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু এ কী! আপনার শ্রীহস্তের এ কী হইল! কব্জী হইতে কনুই পর্য্যন্ত যে চামড়া উঠিয়া গিয়া রক্ত ফুটিয়া উঠিতেছে! আহা হা! কোমল অঙ্গে এত কঠিন আঘাত কিরূপে লাগিল!!"

প্রভু নীরব। দুই তিনবার জিজ্ঞাসার পর অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন। "তোদের একগুয়েমী যায় না। নিষেধ করিলাম তবু নৌকায় আসলি। শেষে রক্ষ রক্ষ, ডাকাডাকি করিস। হাতে কী হ'ল আবার জিজ্ঞাসা করছিস্। তোদের নৌকা তলিয়ে যাইতেছিল। ঠেলিয়া উঠাইলাম। নৌকার ঘসায় হাতের চামড়া উল্টিয়া গিয়াছে।"

নবনী-অঙ্গিয়া প্রাণারাম শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তের ঐ

অবস্থা দেখিয়া ও শ্রীমুখের উক্তি শুনিয়া ধৈর্য্যচ্যুত মহিম হাহাকার করিতে লাগিলেন। নয়ন ধারায় তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। ধরাস করিয়া সংবিৎশূন্য অবস্থায় শ্রীপদতলে পড়িয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পরে মাথা তুলিয়া দেখেন—বন্ধুসুন্দর নিজ মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন।

জীবনে এই কাহিনী যখনই বর্ণনা করিতেন তখনই মহিম অস্থির হইয়া পড়িতেন। বদন রাঙ্গা হইয়া যাইত। নয়নে শ্রাবণের ধারা গলিত।

ধন্য ভক্ত, ধন্য ভক্তের ভগবান।

"মহাপ্রভুর অঙ্গহানি হয়"

ভগবান যেমন ভক্তের সর্ব্বস্ব, ভক্তও সেইরূপ ভগবানের সর্ব্বস্ব। ভক্ত, ভগবানের এত আপন যে, তাহাকে শুধু স্নেহ দ্বারাই রক্ষা করেন না, কঠোর শাসন দ্বারাও রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু নৌকাযোগে বাকচর হইতে বদরপুর আসিতেছেন। একপাশে ছোট ছইয়ের মধ্যে প্রভু বসিয়াছেন। গোপাল মিত্র, নিচু সাহা, বনমালী সাহা, মহিম দাস প্রমুখ পাঁচ সাতজন ভক্ত ও খোল করতাল সঙ্গে আছে। প্রভু বলিলেন, "নবদ্বীপ, কীর্ত্তন কর।" সন্ধ্যা প্রায় সমাগত দেখিয়া নবদ্বীপ কীর্ত্তন ধরিলেন,—

প্রদোষ অম্বর, প্রফুল্ল অন্তর,
চপল চঞ্চল মতি।

মুঞ্জন মঞ্জির, মন্থর অধীর,
খঞ্জন গঞ্জন গতি ॥
বামে বলরাম, দক্ষিণে শ্রীদাম,
চৌদিকে গোবৎস পাল।
সম্মুখে উজ্জ্বল, সুবল মঙ্গল,
পশ্চাতে সব রাখাল ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু নৌকার ছইয়ের মধ্যে থাকিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সকল ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। ক্রমেই আনন্দ জমিতে লাগিল।

হঠাৎ নবদ্বীপের তন্দ্রা আসায় কীর্ত্তনের তাল কাটিয়া যায়। শ্রীশ্রীপ্রভু তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ রাখিয়া দেন। পার্শ্বস্থ কমণ্ডলুটি হাতে করিয়া ছইয়ের বাহিরে আসেন। নবদ্বীপের মস্তকে বেশ জোরে পর পর তিনটা আঘাত করেন। নবদ্বীপ চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। অতীব বেদনার সুরে শ্রীশ্রীপ্রভু বলেন—"তুই আজ কি করলি তা জানিস ? কীর্ত্তনে তাল কাটিলে কি অপরাধ হয় তা কি বুঝিস ? কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর দেহ। কীর্ত্তনে তাল কাটিলে মহাপ্রভুর অঙ্গহানি হয়।"

প্রভুর দুঃখ দেখিয়া নবদ্বীপ আঘাতের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। নিজ অলসতার জন্য নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া প্রভু পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সজল চোখে আবার গান ধরিলেন,—

কটাক্ষ কঞ্জন, কুমারী রঞ্জন,
যাবট তোরণে চায়।

রা রা রা রা রবে, বরজ গৌরবে,
সঘনে বেণু বাজায় ॥
ললিতা হেলনে, কুন্দলতা সনে,
নেহারেন প্রাণেশ্বরী।
নয়নে নয়ন, কলঙ্ক মিলন,
বন্ধু সাধ মরি। মরি ॥

তারপর গানে যে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তাহা অবর্ণনীয়। ভক্ত ও ভগবানের লীলা খেলা দেখিয়া সকলে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন চলিয়া যান।

"কৃপা-ভিখারী"

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন আসিয়াছেন। আসিবার পথে হাতরাসে অটলবিহারী নন্দী মহাশয়ের বাসায় তিন দিন থাকেন। তাহাকে শ্রীশ্রীপ্রভু বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

নন্দী মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের শিষ্য। তিনি নিজ গুরুদেবকে নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন এবং সেইরূপ অনুভব লইয়াই সেবা করিতেন। হাতরাস থাকাকালে শ্রীশ্রীপ্রভু রামবাগানের হরিদাসকে একটি পত্র লিখেন। তাহাতে লেখা ছিল—"হরিদাস, এটি প্রলয়কাল, আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত ভিন্ন এ সৃষ্টিতে রক্ষা পাওয়া দায়।"

এই বোধ হয় প্রভুর শেষবার ব্রজে যাওয়া। এইবার অহল্যা-বাঈর ঘাটের পাশে একটী গোফার মধ্যেই ছিলেন। তৎকালের সিদ্ধ বৈষ্ণব মাধবদাসজী ও জগদীশ বাবার কাছে শ্রীশ্রীপ্রভু মাঝে মাঝে যাইতেন। তাহারা বন্ধুসুন্দরকে অসীম ভক্তি করিতেন। দণ্ডবৎ নতি করিতেন।

একদিন জগদীশ বাবা শ্রীশ্রীপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনি কাছে এলে আমার স্মরণ মনন আর থাকে না; আপনার ভিতরে যেন কী একটা আছে। যাহা আমার ভজন ভুলায়ে দেয়।" বাবার কথা শুনিয়া প্রভু মধুর হাস্য করিতেন।

ব্রজগোবিন্দ দাস বাবাজী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ব্রজে বাস করিতেন। নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝাড়ু সেবা করিতেন। তিনি একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনার পরিচয় কী?" উত্তরে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বলিয়াছিলেন, "আমি একজন বৈষ্ণব-কৃপা-ভিখারী। বৈষ্ণব-কৃপা পাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াই।"

প্রভুর উত্তরে বাবাজী মহাশয় আনন্দে পুলকিত-তনু হইয়াছিলেন।

"কৃষ্ণপ্রেম শুচ্যাহুতি"

অহল্যাবাঈর গোফায় থাকাকালে, শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় আপন মনে লিখিতেন। কখন কি আবেশে কাহাকে কোন্ কথা লিখিতেন, তাহা বুঝা ছিল বড়ই দুরূহ। সেই সব লেখাও আমরা সব পাই নাই। দুইটি লেখা পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা লেখা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

(১)

কালা-কলঙ্কিণী মুই যাবট নিবাস
কালিন্দী পুলিনোদ্যানে আশ্রম অমল
কানুকমলিনী পদে চিরদাস্যাভাস
কেকী কুরঙ্গিণী সনে প্রণয় কেবল।
কামাব্ধি সম্বরাগাধে কুল নিমগন।
করম ধরম ধর, ভরম সরম ভর,
কৃষ্ণপ্রেম শুচ্যাহুতি বন্ধু নিবেদন ॥

(২)

মায়া শক্তি নও যে মা বলে ডাকিব
চিৎশক্তি জীবশক্তি নহ ত কখন
ভানুসুতা সহোদরা ইহাই ডাকিব
রেবতী বলিতে শুধু নাহি সরে মন।

কানু অনুরাগিণী অনঙ্গমঞ্জরী
আর্ত্তে উদ্ধার কর পাপাব্ধি সত্বরে
ভীম প্রপঞ্চ ভয়ে ভ্রামিত তরী
দুরন্ত অন্তক ডরে প্রাণ শিহরে।

নিতাই জাহ্নবা আর বসুধা সুন্দরী
রেবতী অচ্যুতাগ্রজ অনঙ্গমঞ্জরী
তিনে তিন তিন হয়ে, এলে প্রেমবন্যা লয়ে,
অসাধনে নিত্যধন দিলে জগভরি।
বারেক কটাক্ষ কর বরজ সুন্দরী ॥

মুগধ হৃদয় সদা করুণা পাশরি
মুই মতিহীন অতি, বিপথে নিয়ত গতি,
যা কর বন্ধু অধমে এসে কেশে ধরি।
রাই কানু সোহাগিণী অনঙ্গমঞ্জরী ॥

"আমি অসম্প্রদায়ী নই"

শ্যামদাসজী কোনও বৈষ্ণব মুখে জানিতে পারিলেন, প্রভু ব্রজে আসিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানে অহল্যবাঈর ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী গোফায় আসিয়া দর্শন পাইলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্যামদাসজীর নানা প্রসঙ্গ হইল।

নানা কথার মধ্যে শ্যামদাস বলিলেন, প্রভু, আপনি কোন গুরুকরণ করেন নাই। অনেকে আপনাকে অসম্প্রদায়ী বলে। প্রভু বলিলেন, "তোদের শ্রীমতী আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন। আমি অসম্প্রদায়ী নই। এই জন্যই অমুককুণ্ডে পা দিয়া নামিতে পারি না—তাই স্নানও হয় না। ভানুকুমারী আর তাঁর নামীয় শ্রীকুণ্ড অভিন্ন বস্তু কিনা! শ্যামসুন্দরের দুই-ই সমান প্রিয়।"

শ্যামদাস বলিলেন, "প্রভু, স্বয়ং রাধাঠাকুরাণী আপনাকে মন্ত্র দিয়াছেন একথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে?"

প্রভু বলিলেন, "করিবে। ভানুনন্দিনী যাঁকে কৃপা করিবেন, সে করিবে। আমি ত তাঁর আদেশেই চলি বসি উঠি। ভানুদুলালী যা করান তাই করি। রাইকিশোরীই আমার একমাত্র ভরসা। তোমরাও সকলে তাঁর চরণ সার কর।" বলিতে বলিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। শ্যামদাস শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অধিরূঢ় মহাভাবের বিকার সকল দর্শন করিয়া আনন্দে জয় রাধে জয় রাধে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্যামদাসজীর সেই দিন মনে হইল, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীমতীই।

"ফরিদপুরে হাঁটুজল"

অপর একদিন, শ্যামদাসজী প্রভুর পাদমূলে বসিয়া কথামৃত পান করিতেছেন। তিনি কাহারও কাছে শুনিয়াছিলেন, প্রভু ফরিদপুরে শ্রীঅঙ্গন করিয়াছেন এবং সেখানেই থাকিবেন। তাই বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ফরিদপুর ভক্ত বৈষ্ণব-শূন্য স্থান। একটা তুলসীগাছ পর্য্যন্ত মানুষের বাড়ী নাই। এমন পতিত স্থানে আপনি থাকিবেন কেন? বৃন্দাবনে যমুনা তীরে আপনার ভজন কুটীর করিয়া দিব, সেখানে ভজন করিবেন।

প্রভু বলিলেন,—"ওরে! যেহেতু ফরিদপুরে তুলসী সেবা নাই, সেই হেতু এবার আমার ফরিদপুরেই থাকিতে হইবে। ফরিদপুর পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিত স্থান। কিন্তু জানিস, যদি কোন দিন সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ে জলে ডুবে যায়, সেদিনও ফরিদপুরে হাঁটুজল। ফরিদপুরকে এবার আমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত করবো।"

শ্রীমুখের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্যামদাস শ্রীশ্রীপ্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পলাতক আসামী

ব্রজভামিনীর ভাবে বিভাবিত বন্ধুসুন্দর ব্রজ হইতে বাংলায় ফিরিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। বড় বড় ষ্টেসনের অনেক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী জানেন—প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এই ভাবে চলেন। তাহারা সাধ্যমত চলাফিরার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন।

কে জানে, কেন ঘুরিতে ঘুরিতে হুগলী ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই ছোট ষ্টেসনের কেহই পূর্ব্বে প্রভুকে এই ভাবে দর্শন করেন নাই। ষ্টেসনে একজন গোয়েন্দা পুলিস বন্ধুসুন্দরকে কোন পলাতক আসামী মনে করিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলেন না। তাহাতে পুলিসের সংশয় আরও দৃঢ়ীভূত হইল। একেত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত কাপড় ঢাকা। পুরুষ কিংবা নারী বুঝিবার কোন উপায় নাই। কথা না-বলাতে বাঙ্গালী কিংবা অন্য কোন দেশীয় তাহাও নির্দ্ধারণ করা গেল না। পলাতক আসামী আত্মগোপনের জন্য ছলনা করিতেছে—এই ধারণা পুলিসের অন্তরে বদ্ধমূল হইল।

পুলিস শ্রীশ্রীপ্রভুকে ট্রেণ হইতে নামিতে হুকুম করিল। না নামিলে জোর করিয়া নামাইয়া দিবে বলিল। অন্য লোকের স্পর্শ ভয়ে তখন প্রভু আপনিই গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন। পুলিসের অনুগমন করিয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবুও অনেক প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন

না। শেষে, কলিকাতায় আপনার পরিচিত কেহ আছে, থাকিলে বলুন, তাদের খবর দিব—এই কথা বলায় শ্রীশ্রীপ্রভু দুইটি ঠিকানায় দুইটি টেলিগ্রাম লিখিয়া দিলেন। থানার দারোগা বাবু টেলিগ্রাম করাইয়া দিলেন।

তন্মধ্যে একটি টেলিগ্রাম চম্পটী ঠাকুরের নামে, অপরটি সুরতকুমারী দেবীর নামে। টেলিগ্রামে লেখা থাকিল—প্রভু বন্দী, শীঘ্র এস। Prabhu arrested, come immediately.

দারোগা বাবু প্রভুকে কোন সাধু মহাপুরুষ বুঝিতে পারিয়া, থানার হাজতে না রাখিয়া একজন ভক্তপ্রাণ নাজিরের বাসায় তাহার হেপাজতে রাখিলেন। নাজিরের বাড়ীতে যাইয়া প্রভু একটি গরুর ঘরে থাকিতে চাহিলেন। নাজির মহাশয় পরম যত্নে গরুর ঘরে প্রভুর থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন।

গরুর ঘরখানি বেশ আবদ্ধ ছিল। নাজির বাবু ঘরের দরজায় তালা দিয়া রাখিলেন। প্রভাতে উঠিয়া দেখা গেল, ঘর খালি, প্রভু ঘরে নাই। নাজির মহাশয় ভাবিয়া অস্থির, না জানি কী বিপদ হইবে।

প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে চম্পটী মহাশয়, সুরতকুমারী দেবী ও অন্যান্য কতিপয় ভক্ত আসিয়া হুগলীতে পৌঁছিলেন। থানায় অনুসন্ধান করিয়া তাহারা সকলে নাজির বাবুর বাসায় আসিলেন।

নাজির বাবু ত আসামী পলাতক এই চিন্তায় মহা ভাবনাতুর। নাজির মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভুর রূপ ও গতিবিধির বর্ণনা

পাইয়া চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "নাজির বাবু, আপনার কোন ভয় নাই। আপনি পরম ভাগ্যবান। ব্রহ্মা শিব ভজন করিয়া যাঁকে পান না, তিনি আপনার গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনার মঙ্গলই হইবে।"

ভক্তগণ কলিকাতা ফিরিয়া নানা স্থানে শ্রীশ্রীপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফরিদপুর হইতে পত্র আসিল। তাহাতে জানা গেল—শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর পৌঁছিয়াছেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাজির মহাশয়ের পদোন্নতি হইয়াছিল। বর্দ্ধিত বেতনে তিনি রাজসাহীতে বদলী হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে পরম অনুরাগী ভক্তমধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন।

যে গো-গৃহে প্রভু বদ্ধ ছিলেন, ঐ গৃহে প্রভুর অঙ্গগন্ধ ছিল প্রায় দশবার দিন। শুনিয়াছি, ঐ স্থানের এক বদ্ধ পাগল যুবক ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া কয়েকঘণ্টা অবস্থান করিলে ঐ অঙ্গগন্ধে প্রকৃতিস্থ হয় ও তাহার সর্ব্বপ্রকার পাগলামি দূর হইয়া যায়।

কী উদ্দেশ্যে কখন তিনি কী লীলা করেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। অন্যের রহস্যোদ্ঘাটনে সামর্থ্য কোথায়?

ভক্ত ও ভগবান

বিন্দু জল সিন্ধুর অংশ। সুযোগ পাইলে কোন স্রোতস্বিনীর সঙ্গে ছুটিয়া বিন্দু আবার সিন্ধুতে যাইয়া সিন্ধুর জল হইতে পারে। জীব ঈশ্বরের অংশ। মহতের সঙ্গগুণে প্রবল চেষ্টার ফলে মানব ঈশ্বরের স্বধর্ম্মতা লাভ করিতে পারে। গীতায় অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, "মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"।

এই হইল বেদ উপনিষদ গীতার কথা। এর পর ভাগবত শাস্ত্রের একটা নূতন কথা আছে। মানব যেমন চেষ্টা করিয়া ভগবত্তুল্য হয়, ভগবানও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া মানবতুল্য হন। মানুষের চেষ্টার নাম সাধনা। ভগবানের চেষ্টার নাম করুণা। সাধনা মানুষকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। করুণা ভগবানকে মানুষের নিকট লইয়া আসে।

তুইটি দৃশ্যই সুন্দর। মানুষটি ছবির মত হইলেও সুন্দর। ছবিটি ঠিক মানুষটির মত হইলেও সুন্দর। ভগবত্তুল্য মানব দর্শনীয়। মানবতুল্য ভগবান আস্বাদনীয়। মানুষ কী উপায়ে ঈশ্বরের স্বাধর্ম্ম্য লাভ করিবে, উপনিষদাদি শাস্ত্রের ইহাই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আর ঈশ্বর কি করিয়া মানুষ হইয়া মানুষের তুয়ারে আসিলেন, ইহাই ভাগবতীয় শাস্ত্রের প্রধানতম আস্বাদনীয় সামগ্রী।

ভক্ত-ভগবানের নিবিড় মিলন-বিরহলীলা পরম গম্ভীর ও অভিনব মাধুর্য্যমণ্ডিত। ভক্ত এগিয়ে চলেন ভগবানের দিকে, ভগবান এগিয়ে আসেন ভক্তের দিকে। মধ্যস্থলে হয় তুজনের

দেখা। আবার প্রেমের গাঢ়তায় হয় অ-দেখা। এই দেখা অ-দেখার দাক্ষিণ্য বাম্যের লীলা চলিতে থাকে পাতালস্থ ভোগবতী প্রবাহের মত নিগমে। ভক্ত-ভগবানের এই লীলার শেষ নাই। অসীম অনন্ত, দুরধিগম্য, জীববুদ্ধির অগোচর।

ভক্ত ও ভগবানের লীলা অর্দ্ধেক মানবীয়, অর্দ্ধেক ঈশ্বরীয়। মানবীয় অংশ ঈশ্বরীয় অংশের অনুপ্রবেশে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ঈশ্বরীয় অংশ মানবীয় ভাবের বিলাসে মাধুর্য্যপূর্ণ। এই গম্ভীর মধুর লীলা জৈব বিচারের মাপকাঠীতে মাপা যায় না। কেবলমাত্র ভক্তজনের আনুগত্যে আস্বাদনীয়।

কেবল ঈশ্বরীয় ভূমি মহৈশ্বর্য্যময়। তাহা ভোগ করিতে গেলে বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনের মত নয়ন-মন দুই-ই ঝলসিয়া যায়। লৌকিক কেবল-মানবীয় ভূমি জড়ভোগময়। তাহা উপভোগ করিতে গেলে বিষয়াসক্তি বাড়িয়া যায়, কৃষ্ণাসক্তি বিনষ্ট হয়। প্রাণমন পঙ্কিল হইয়া উঠে।

মানবীয় ঈশ্বরীয় মিলনে গোলোক ভূলোক সংমিশ্রণে ভক্ত ভগবানের লীলাবৈচিত্র্য সুন্দর ও মধুর। তাহার অনুশীলনে জীবন স্নিগ্ধ হয়। গতি ছন্দোময় হয়। সর্ব্বাত্ম-স্নপনে আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেলিত হয়।

মান অভিমান

মানবীয় ভূমিকায় মান অভিমান রজঃ ও তমোগুণময় বলিয়া অতীব দোষাবহ। পক্ষান্তরে ভক্ত-ভগবানের লীলা-কৌতুক শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া সেখানকার মান অভিমানও সুখাবহ। আপাতদৃষ্টিতে দুঃখদায়ক হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা পরম সুখদ। মানবীয় মান অভিমান ঈর্ষায় ভরা তাই ত গ্লানিকর। গোপীর মান, জগদানন্দের অভিমান শুদ্ধ প্রণয়ে গড়া, তাই সুখদ ও মনোমদ।

বদরপুর বাদল ভবন যেন শ্রীবাস অঙ্গন। ভক্তসঙ্গে বন্ধুসুন্দর সেথায় সতত লীলাস্বাদনে ভরপুর। আজ সন্ধ্যা সমাগমে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যস্থলে বন্ধুচন্দ্রমা, চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রের মত ভক্তবৃন্দ। কানাই মিত্র মহাশয় গান ধরিয়াছেন,—

নিতাই নিতাই নিতাই বলে চল নদীয়ায়।
শচীর ঘরে নয়ন ভরে হেরবি রে গৌরাঙ্গরায়॥

মিত্র মহাশয় নিজেই গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ সঙ্গতি করিতেছেন। মূলদোহারে গান ধরিয়া গাহিবার মত আর কেহ উপস্থিত নাই। মিত্র মহাশয় ভাবিতেছেন, গোপাল বা রজনী কেহ আসিলে ভাল হইত। প্রভুকে আনন্দ দিবার জন্যই ভক্তদের গান কীর্ত্তন। প্রভু বন্ধুসুন্দর প্রত্যহ যেমন গান শুনিয়া শ্রীচরণ দোলান, আজ আর তেমন করিতেছেন না, তাই মিত্র মহাশয় বুঝিতেছেন, কীর্ত্তনানন্দময়ের আনন্দ বিধান পূর্ণাঙ্গ হইতেছে না।

এমন সময় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম

আদরের শারিকা শ্রীরামদাস আসিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই কানাই মিত্র হাত ও চোখ ইসারা করিয়া ডাকিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও ইঙ্গিত করিলেন। সকলের অন্তরের ইচ্ছা রামদাস আসিয়া কীর্ত্তনের মুখ ধরেন। কিন্তু শ্রীরাম ত আজ আর অগ্রসর হইতেছেন না। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দরজার কাছে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামদাস, কিসের যেন অপেক্ষায়।

প্রতীক্ষারত ভক্ত

ব্রজবাস কালে রাম বৈষ্ণবজনের মুখে শুনিয়াছেন, বিধিমত দীক্ষা না হইলে ভজন শুদ্ধ হয় না। রাম জানেন প্রভুবন্ধু কাহাকেও দীক্ষা দেন না। অনেক মন্ত্র খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্রীয় নীতিমত কাহাকেও কর্ণে অর্পণ করেন নাই। রাম কিন্তু তাহাই চায়। প্রভু যাহা দেন না সেবক তাহাই চায়। প্রভু না দিলে অন্য স্থান হইতে নিতে চায়।

শ্রীরাম মনের অভিপ্রায় শ্রীশ্রীপ্রভুকে জানাইয়াছেন। জানাইবামাত্র প্রভু নীরব হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। ভক্তও অভিমান করিয়া গম্ভীর হইয়াছেন। কিছুদিন উভয়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ। শ্রীশ্রীপ্রভু অন্য এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—"রামকে বল, একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না।"

এত অনুরাগ রামের প্রভুতে। এত স্নেহ প্রভুর শ্রীরামের প্রতি। সেই দুইজনে কথাবার্ত্তা বন্ধ। ইহা লইয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে জল্পনা কল্পনা বহু। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরাম নবদ্বীপের শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের দর্শন লাভ করিয়াছেন। দর্শনে রাম বিমুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তনে রাম গলিয়া গিয়াছেন। রামদাসের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীরাধারমণ শ্রীবন্ধুসুন্দরেরই একটি প্রকাশ মূর্ত্তি।

শ্রীরাধারমণ ও শ্রীবন্ধুসুন্দরের মধুর মিলনের সংবাদও রাম শুনিয়াছেন। তাহার দৃঢ় অনুভব এই যে, গৌরসুন্দর যেরূপ গম্ভীরায় গুপ্ত থাকিয়া নিতাইচাঁদকে পাঠাইয়া গৌড়দেশে নাম বিলাইয়াছেন, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও সেইরূপ নিজে গুপ্ত থাকিয়া শ্রীরাধারমণকে দিয়া নাম প্রচার করাইতেছেন। বন্ধুসুন্দরের রচিত পদ পদাবলী কীর্ত্তনে রাধারমণের অপূর্ব্ব উল্লাস দর্শনে রামদাসের ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে।

প্রভুবন্ধু সেদিন বলিয়াছিলেন, "একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না।" রামদাস সেদিন তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। আজ তাহার উত্তর দিতে আসিয়াছেন। তিনি জানেন, প্রভুবন্ধুর কাছে কোনও কথা মুখে না বলিলেও চলে। অন্তর্য্যামী দেবতাকে অন্তরে জানাইলেই সব জানিতে পারেন। তাই আজ দুয়ারে দাঁড়াইয়া অন্তরের দেবতাকে অন্তরে নিবেদন করিতেছেন।

"প্রাণবন্ধুসুন্দর! আমি তোমারই ক্রীতদাস। তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র দীক্ষা নিলে ব্যভিচারী হইব—বালিকাদের

বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়া তুমি সেদিন এই কথা কহিয়াছ। এর উত্তর আমার আছে।—

"আমি নবদ্বীপে যাঁহাকে দর্শন করিয়াছি তিনি তোমারই আর এক মূৰ্ত্তি। তুমি নিজে যাহা দেওনা, তাহা যদি তাহাকে দিয়া আমাকে দেওয়াও, তবে তাহাতে আমার ব্যভিচারের আশঙ্কা কোথায়? স্কুলে হেড্‌মাষ্টার একজনই। তিনি নিজে না পড়াইয়া যদি অন্য শিক্ষকদ্বারা কোনও ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা করেন, তবে তাহাতে দোষের অবকাশ কোথায়?

"সেদিন তুমি আমাকে বলিয়াছ,—"যে খেয়ে খাওয়ায় সেই মানুষ।" সেই খেয়ে খাওয়ান মানুষ আমি শ্রীরাধারমণে দর্শন করিয়াছি। তিনি তোমার বাণীর মূৰ্ত্তি। শ্রীহরিনামসুধা যেভাবে তিনি খান ও খাওয়ান তাহা নিরুপম। তুমি দাতা, তিনি ভাণ্ডারী। দাতার সম্পদ ভাণ্ডারীর হাত হইতে নিলে ব্যভিচারী হইব কেন?

একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না একথা ঠিক। কিন্তু পঞ্চস্বামী গ্রহণ করিয়াও দ্রৌপদীদেবী পরমা সতী। আমিও সতীত্ব হারাইব না, তোমার প্রাণের মন্ত্রই তোমারি প্রিয় মুখ হইতে গ্রহণ করিয়া। তবে দোষী হইব নিশ্চয়, তোমার অবাধ্য হইলে। তোমার অনুজ্ঞা ছাড়া কৰ্ম্ম করিলে। তাই আজ আসিয়াছি, আদেশ গ্রহণ করিতে।

"যদি আদেশ কর, গিয়া দীক্ষা লইব। যদি আদেশ না কর এই দরজায় দাঁড়াইয়াই থাকিব। আর নিকটেও আসিব

না, পিছনেও যাইব না। যুগ যুগ ধরিয়া এইখানেই প্রতীক্ষায় রহিব।”

শ্রীরামদাস দাঁড়াইয়া আছেন। বর্ষণোন্মুখ একখণ্ড জলভরা মেঘের মত। প্রভু নিজে না ডাকিলে আর নিকটে আসিবেন না।

“ভিতরে আসতে বল”

ভক্তগণের ইঙ্গিতে, ইসারায়, ডাকে—কিছুতেই রামদাস আসিলেন না। ধীর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

ভক্তের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রদেবতা বুঝি-বা ষড়যন্ত্র করিয়া সহসা আকাশে মেঘের উদয় করাইলেন। মুষল-ধারে বৃষ্টি নামিল। পশুপাখী পর্য্যন্ত আশ্রয় খুঁজিল। কেবল ভক্তরাজ রামদাস অচল হইয়া রহিলেন।

ইন্দ্রদেবতা রণে ভঙ্গ দিলেন। বৃষ্টিধারা থামিয়া বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল। রামের নয়নধারা কিন্তু থামিল না। বাড়িতেই লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইল। রামের সঙ্গে বন্ধুশ্যামের রাম্যলীলা চলিতেই লাগিল।

আকাশে মেঘ ছুটাছুটি করিতেছে। ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের চন্দ্রিকা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। ভক্ত প্রতাপ ভৌমিকের দিকে তাকাইয়া করুণাময় বন্ধুসুন্দর কহিলেন, “ও বাহিরে দাঁড়ায়ে ভিজছে কেন? ওকে ভিতরে আসতে বল।”

কথাগুলি এত স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যে, বাহির হইতে রামদাস তাহা শুনিতে পাইয়াছেন। বিদ্যুতের ঝলকের মত রামের কর্ণে প্রভুর কণ্ঠ পৌঁছিল। অন্তরে প্রবল ইচ্ছা ছুটিয়া শ্রীচরণোপান্তে যান, তবু তাহার পা নড়ে না।

প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় শ্রীরামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "রাম, প্রভু তোমায় ভিতরে ডাকছেন, এস।"

অন্তরে ব্যস্ততা, বাহিরে ধীরতা। রামদাস ভিতরে গেলেন। ভিতরে গিয়াই শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ সমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ভক্তের সিক্ত নয়নে ও সিক্ত বসনে ধরণী পঙ্কিল হইয়া উঠিল।

"সুযোগ উপস্থিত হ'ল"

কতক্ষণ পরে রামদাস উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া দেখেন্ প্রভু বিপরীত দিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়াছেন। প্রভু ডাকিয়াছেন শুনিয়া অন্তরে যে আনন্দ পুলক দেখা দিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা দূর হইয়া গেল। আবার অভিমানের ঘনঘটা দেখা দিল।

তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিবার মত ভঙ্গিতে রামদাস ভৌমিক মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি পিছন ফিরিয়াই বসা হবে, তবে ডাকা হ'ল কেন ?"

বাহিরে ভাষায় বক্রতা দেখাইয়াও রামদাস অন্তরে অতি সরলভাবে প্রাণের নিবেদন প্রাণে প্রাণে প্রাণারামের নিকট জানাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল নীরবতার পর অন্তর্য্যামী সাড়া দিলেন। অতি ধীরে জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "মহাপ্রভুর কৃপা হয়েছে। এখন সুযোগ উপস্থিত হল। আর হারিও না।" কথা কয়টি বলিয়া বন্ধুসুন্দর নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

আজ্ঞা পাইয়া শ্রীরামের প্রাণে আনন্দের উদয় হইল। অন্তরের দেবতা অন্তরের সকল নিবেদনই শুনিয়াছেন বুঝিয়া প্রাণে শান্তি হইল। কিছুকাল স্থির ভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে রামদাস কহিলেন, "তবে বিদায় দেও।"

"কেমনে বিদায় দিব"

রামের অস্ফুট কথা কানে গিয়াছে। শ্রীকরে কম্পমান লেখনী ধরিয়া বন্ধুসুন্দর নিজ মনের সন্তাপ ছন্দে ব্যক্ত করিলেন। কয়েক মিনিট কাগজ কলমের মিলন ধ্বনি শ্রুত হইল। তার পর একখানি বড় পত্রখণ্ড প্রভুর কক্ষ হইতে শ্রীরামদাসের বক্ষে গড়াইয়া আসিল।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
কেমনে কহিব রে কেমনে সহিব রে,
স্মরিতে দারুণ কথা শরীর শিহরে,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
কেমনে লিখিব রে কেমনে দেখিব রে,

সাধিতে স্বীকার হায় হৃদয় বিদরে,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
কেমনে সহিব রে কেমনে বহিব রে,
স্মৃতিশূল নিদারুণ রহিবে অন্তরে,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
কেমনে তুলিব রে কেমনে ভুলিব রে,
সুখময় সঙ্গ আর কারে দিব ধরে,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
যতনে পোষিত স্মৃতি ডুবাব কেমনে,
যদিও মিলেছে সাধ নৈরাশ্য অম্বরে,
কি বলে বুঝাব করে মৃদঙ্গ দর্শনে,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
যার আগে আজ্ঞাকারী ছিলনা রে কেহ,
রহিত নির্ভর মোর সদা যার করে,
যার সনে অহরহ ব্রজরস লেহ,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে,
সাত্ত্বিক ভূষিত বপু থাকিত যে সদা,

বন্ধুনাম অম্বরে যে তুলিত সুস্বরে,
অন্য লক্ষ্য সঙ্গ যার নাহি ছিল কদা,
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।

সঙ্গ অগ্রে পরে শোভে ব্রজবাস।
কাতরে বিনয় করে জগদ্বন্ধু দাস ॥

বরের করে কন্যা সমর্পণ করিয়া জননী যেমন বেদনাহতা হন, আজ রাধারমণের করে রামীকে দিয়া বন্ধুসুন্দরও সেইরূপ তাপ তপ্ত হইলেন। তাই পত্রের শেষে লিখিলেন,—

"সন্তাপীর পত্র" *

পত্রখণ্ড হাতে তুলিয়া রামদাসের দেহতরু কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। বহু কষ্টে পত্রের প্রথম পংক্তিটি পাঠ করিলেন। তারপর শতবার মুছিতে চেষ্টা করিয়াও প্রবল অশ্রু-ধারাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া পত্রখণ্ডকে বহির্ব্বাসের কোণে বাঁধিয়া লইলেন।

ভক্ত-ভগবানের এই প্রাণস্পর্শী লীলা দর্শনে বিশ্ব প্রকৃতিও অশ্রুপাত করিতে লাগিল। গগনে চাঁদের সঙ্গে মেঘের খেলা, আর বদরপুর বাদল অঙ্গনে রামের সঙ্গে বন্ধুর খেলায় কোথায় যেন সাদৃশ্য দেখিয়া দূরে উচ্চ ঝাউয়ের শাখায় বন-বিহঙ্গ "অহো!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

---

* বাবাজি মহাশয়ের নিজ মুখোক্তি।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজি মহাশয় সম্বন্ধে বন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর কয়েক খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে যত কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম বাবাজি মহাশয়ের মুখ হইতেই শ্রুত। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বাবাজি মহাশয়ের পদোপান্তে

বসিয়া অনেকদিনই তাঁহার নিজমুখ হইতে নিজ কথা শ্রবণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ডাঃ অশোকনাথ রায় নামক আমাদের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বাবাজি মহাশয়ের শ্রীচরণ পার্শ্বে বসিয়া একদিন কতিপয় প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাবাজি মহাশয়ের নিজ মুখের উত্তর লিখিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহা যথাযথ নিম্নে লিখিত হইল।

অশোক ডাক্তার—প্রভুর প্রথম জীবনের ঘটনা ও তাঁহার সঙ্গে আপনার মিলন সম্বন্ধে আপনার মুখে আমি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। বাবাজি মহাশয় বিশেষ আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন—প্রভুর প্রতি প্রথম যখন আকৃষ্ট হই তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর। আমি তখন ফরিদপুরের বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ি। একদিন স্কুলে গিয়াছি, দেখিলাম বর্ত্তমান জিলাস্কুলের কাছে যে বটগাছ উহার নিকটে এক অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য লাবণ্য মূর্ত্তি। মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, মধুর হাসি। তখন নয়ন আমাকে প্রলুব্ধ করিল। স্কুলের ছুটীর পর খোঁজ করিয়া বাজারের জলধর ঘোষ মহাশয়ের কাছে সন্ধান পাইলাম, উনি ব্রাহ্মণকান্দায় থাকেন। সে সময়ে তিনি বহু তীর্থ স্থান ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

প্রভুর জন্মস্থান ডাহাপাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায়। পরবর্ত্তী কালে কোনও সময় আমি প্রভুর জন্মস্থান দেখিবার জন্য ডাহাপাড়া গিয়াছিলাম। স্থানটি ঠিক নবাব বাড়ীর অপর পারে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেখানে একটি টোল ছিল, সেখানে গেলে দুইটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হইল। তাহার মধ্যে একজন প্রভুর মাতৃহীন অবস্থায় লালন পালন করিয়াছিলেন। আমাদের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, জগত মানুষ ছিল না, সে দেবতা। প্রভুর কোষ্ঠি প্রস্তুত হইলে বড় বড় পণ্ডিত গণিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ আছে।

বাল্যলীলাখেলা অধিকাংশই ব্রাহ্মণকান্দার নূতন বাড়ীতে। প্রভু

বাল্যকাল হইতেই (উপনয়নের সময় হইতেই) কঠোর ব্রহ্মচারী। সুধন্ব মিত্র, বকুবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তগণ ইতঃপূর্ব্বেই প্রভুর আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

বাসা হইতে পলাইয়া প্রভুর নিকট যাওয়া আসা আরম্ভ করিলাম। তিনি গৃহে অধিষ্ঠিত দেবতা রাধা গোবিন্দের সেবা করিতেন, তৎপ্রসাদই পাইতেন। প্রভু প্রায়ই মৌন থাকিতেন, আকার ইঙ্গিতে কথা বলিতেন। ঘন ঘন পলাইয়া প্রভুর নিকট আসিতে লাগিলাম। তিনি খুব ভালবাসিতে লাগিলেন, কিন্তু বাড়ীতে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল।

সুধন্ব দাদাকে আমার জন্য অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি এখনও আমাকে সেইরূপ স্নেহের চক্ষেই দেখেন। কিছুদিন পরে গৃহ ত্যাগ করিলাম। তখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর। প্রভু আমাকে লোক সঙ্গে দিয়া হাতরাস হইয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। সে সময়ে তাঁহার আদেশে আমাকে অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত; তাহার মধ্যে একটা তোমাকে বলি। প্রভুর নিজের হস্তাক্ষর ভিন্ন আর কাহারও হস্তাক্ষর আমার দেখিবার হুকুম ছিল না। তজ্জন্য আমার চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস আজ পর্য্যন্তও নাই বলিলেই চলে।

(ইহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করেন)

প্রভুর সঙ্গে আমার যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহা আর কী করিয়া বুঝাইব? এক সঙ্গে কত খেলিয়াছি। প্রভুকে ঠাকুর বুদ্ধি বা ভগবান বুদ্ধি করিতে ভাল লাগে নাই। তবে শোন, উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে শ্রীমতী ও তাঁহার সখিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ওহে উদ্ধব, তোমাদের প্রভু কৃষ্ণ কেমন আছেন?" উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের প্রভু এ কথা কেমন?" সখিরা উত্তর করিলেন," কৃষ্ণ তোমাদের প্রভু। আমাদের নন্।" প্রভুর সঙ্গে যে সব খেলা হইয়াছে তাহা কি আর ভুলিতে পারি? আমার

সন্ধ্যা আহ্নিক আর কি আছে? ধ্যানে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা আর কোথায়? এই লীলাই দেখ্‌তে থাকি।

কত রাত্রি গিয়াছে এক ঘরের মধ্যে প্রভু আর আমি। আমি গান করিয়াছি, প্রভু খোল বাজাইয়াছেন। রাত্রে ঘুমাইবার নিয়ম ছিল না। ঘুমাইলে হয় কুশাসন দ্বারা আঘাত করিতেন, নয়ত জল ঢালিয়া দিতেন। প্রভু আমাকে কতই স্নেহ করিতেন।

অশোক—প্রভু আদর করিয়া শুনিয়াছি আপনার সম্পূর্ণ নাম বলিতেন না।

বাবাজি—প্রভু রাধা শব্দ উচ্চারণ করিতেই পারিতেন না। কখনও করেন নাই। নিতান্ত দরকার হইলে বলিতেন "অমুক।" কি সম্বন্ধ কে জানে? কখনও রাধাকুণ্ডে স্নান করেন নাই। আমাকে রাধিকা না বলিয়া আদর করিয়া বলিতেন, "শারিকা", কখনও কখনও বা "রানি"ও বলিতেন।

প্রভুর রচিত কুঞ্জভঙ্গ গান আমি করিতে পারিতাম না। গান দেখিয়া পড়িতে পড়িতেই কাঁদিয়া আকুল হইতাম। প্রভু তিন সময় আমাকে ঐ গান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনবারই আমার ঐ একই দশা। তৃতীয় বারে বিশেষ চেষ্টায় এক লাইন গান করিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়ি। প্রভু সেই হইতে ঐ গান করিতে আর কখনও আমাকে বলেন নাই।

একবার কলিকাতায় শুনিতে পাইলাম প্রভু অসুস্থ। ছুটিয়া প্রভুর প্রিয় ছানা ও ফল প্রভৃতি লইয়া গোয়ালচামট আসিলাম। তখন প্রভু বর্ত্তমান আঙ্গিনায় ঘরের মধ্যে থাকেন। আঙ্গিনায় তখন সেবাইত কেহ উপস্থিত ছিল না। আমি ঘরের নিকট যাইতেই প্রভু মনমাতান সুরে হৃদয় আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে রে?" আমি বলিলাম, "পুরাণ তেতুল, জ্বর বিকার হইলে কাজে লাগে।" আদর করিয়া

ঘরের মধ্য হইতেই বারান্দায় বসিতে বলিলেন। অনেক ঐ ভাবের কথাবার্ত্তা হইল। পরে আনীত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিতে বলিলে গ্রহণ করিলেন।

অশোক—আচ্ছা, প্রভুর সঙ্গে ত এতদূর সখ্য ভাব ছিল, আবার ভয়ও করিতেন কি?

বাবাজি—হাঁ ভয় খুবই ছিল। হুকুম অমান্য করিবার উপায় ছিল না। একবার প্রভু আমাকে বৃন্দাবন হইতে আলমবাজারে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতেই প্রাতঃ-স্নান করিবার জন্য আমার হাঁপি কাশি মত দেখা দিয়াছিল। সেইজন্য প্রাতঃস্নান বন্ধ করিয়াছিলাম। একদিন ভোরে গঙ্গার বাঁধান ঘাটের কাছে বসিয়া আছি, দেখি প্রভু প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। আমি প্রাতঃস্নান করি নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও অনুযোগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতে আদেশ করিলেন। আমি অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে দয়ার্দ্র হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অসুখের কথা জানাইলাম। সেই হইতে প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার অনুমতি হইল।

অশোক—আচ্ছা, প্রভুতে এই সময় আপনি কি বুদ্ধি করিতেন?

বাবাজি—ভগবদ্বুদ্ধি করিতাম।

অশোক—প্রভু মানুষ হিসাবে আপনার কি মনে হয়?

বাবাজি—অসাধারণ মানুষ।

অশোক—আপনি কখনও প্রভুকে সাধনা করিতে দেখিয়াছেন?

বাবাজি—কি সাধনা করিতেন তাহা আমি জানিতাম না।

একবার পাবনাতে শ্রীযুত রণজিত লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহ সন্নিকটস্থ কেলীকদম্ব তলে ঐ বৃক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, এইখানেই বুড়োশিব তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য সাধন দান করেন। বুড়োশিবকে তিনি খুব শ্রদ্ধা

করিতেন। বুড়োশিব যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। ইহা ভিন্ন আর কোন সাধন তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

অশোক—আচ্ছা, প্রভুকে ভগবদ্‌বুদ্ধি ছিল, তবে আপনি ভগবান সামনে থাকিতেও আবার দীক্ষা নিলেন কেন?

বাবাজি—দীক্ষার পর হৃদয় প্রস্তুত না হইলে ভগবান দেখা দিয়াও ধরা দেন না। দেখ না ধ্রুব প্রহ্লাদকে সর্ব্বদা নিকট থাকা সত্ত্বেও দীক্ষার পর দর্শন দান করিলেন। তৎপূর্ব্বে নহে। প্রভু সামনে আসিলে কি হয়, দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

অশোক—প্রভুকে আপনি নিজে আত্ম পরিচয় অর্থাৎ তিনিই ভগবান এই পরিচয় দিতে শুনিয়াছেন?

বাবাজি—হাঁ শুনিয়াছি। তিনি নিজের ফটো পূজা করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। তাঁহার পরিচয় প্রচার হইলে শুনিয়া আমি কলিকাতা হইতে প্রভুর নিকট আসিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই পরিচয় দেন। তাহাতে আমি বলি, তুমি ঠাকুর কি ভগবান সে পরিচয়ে আমার দরকার নাই। ইহা আমার ভাল লাগে না। উহাতে তোমাকে অনেক দূরের বলিয়া মনে হয়।

অশোক—আপনি প্রভুর নিকট দীক্ষা না লইয়া অন্যত্র দীক্ষা লইলেন কেন?

বাবাজি—প্রভু দীক্ষা দিতেন না। আমার দীক্ষার সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক রকম ধারণা, অনেকেই ঠিক জানে না। আমি প্রভুর অনুমতি লইয়া তবে দীক্ষা লইয়াছি।

একবার প্রভু বৃন্দাবনে, আমি সঙ্গে। আমি দীক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি বাংলায় ফিরিবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে আসিবার জন্য অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কিছুতেই সঙ্গে আনিলেন না। অবশেষে একখানা মন্ত্রের বই তাঁহার নিকট ছিল সেইখানা দেখাইয়া

নিত্যানন্দ গায়ত্রী ও মহাপ্রভু গায়ত্রী সংখ্যাপূর্ব্বক জপ করিতে ও হরিনাম লক্ষবার জপ করিতে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু রীতিমত দীক্ষার জন্য আমার মানসিক ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ইহাতে প্রভু এবং তদীয় ভক্তবৃন্দ অনেকেই আমার প্রতি বিরক্ত হন। এই সময়ে আরও কতকগুলি ঘটনায় আমি ক্রমেই প্রভুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকি।

কিছুদিন পরে আমি ফরিদপুর সহরে আসিয়া জানিতে পারিলাম, প্রভু বদরপুর আছেন। তখন তাঁহার প্রতি একটা অভিমান ও দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলতা উভয়ই ছিল। বদরপুরে যাইয়া প্রভু যে ঘরে আছেন তাহার সামনের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ইচ্ছা, না ডাকিলে আর কাছে যাইব না। প্রভুও ডাকিলেন না। ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাহিরেই ভিজিতে লাগিলাম। তখন প্রভু একজন ভক্তকে বলিলেন, "ও বাইরে বসে ভিজছে কেন? ওকে ভিতরে আসতে বল না? আমার অভিমান ভাঙ্গিয়া গেল। ভিতরে গেলাম কিন্তু প্রভু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন। অভিমানে বলিলাম, "যদি পিছন ফিরিয়াই বসা হবে তবে ডাকা হল কেন? কিছুক্ষণ পরে প্রভু ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাপ্রভুর কৃপা হয়েছে, এখন সুযোগ উপস্থিত হলে আর হারিও না।"

প্রভু আমার দীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিলেন মনে করিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলাম। তার কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম।

অশোক—প্রভু যদি ভগবান তবে তাঁর কথা দশজনকে বলতে দোষ কি?

বাবাজি—দেখ তর্কের দ্বারা ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতির ভগবত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট শাস্ত্র প্রমাণ আছে। তবু তর্ক উঠে। আমার মনে হয় আমরা অনুপযুক্ত, আমরাই তাহাকে ষোল আনা বিশ্বাস করি না। এ অবস্থায় তাঁহাকে প্রচার করতে গেল অপরাধ হয়। একদিন জয়নিতাইকে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, জয়নিতাই, তুমি স্থির বলত—তুমি কি সর্ব্ব মুহূর্ত্তেই প্রভুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি রাখিয়া থাক? উত্তরে জয়নিতাই বলিয়াছিলেন, "না, তা আর পারি কই!" এ অবস্থায় প্রচার করা কি সঙ্গত?

আমরা এমনভাবে উপযুক্ত হব, ভক্তির এমন অধিকারী হব যে, আমাদের প্রতি অনুরক্তেরা আপনা আপনি আমাদের প্রভুকে জানিয়া ভগবদ্‌বুদ্ধি করিবে।

যাঁকে যে ভাবে সেবা করলে সুখী হন তাঁহাকে সেই ভাবেই সেই সেবা করা উচিৎ। সেবা তাঁর সুখের জন্য, আমার সুখের জন্য নয়। অনেকক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন, প্রভুর সম্বন্ধে আমারও একটা ভাব আছে।

(সন ১৩৩৩ সালের বৈশাখ রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকা হইতে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা যাবৎ ডাক্তার শ্রীঅশোকনাথ রায়ের সহিত শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পাংশা থানার অন্তর্গত পাট্টা গ্রামবাসী শ্রীযুত মন্মথনাথ কুণ্ডুর গৃহে এই সব কথাবার্ত্তা হয়)।

"দেহ গেহ ধন্য হল"

প্রভাতে উঠিয়াই প্রভু নবদ্বীপ দাসকে ডাকিলেন। "চল্ নবা, পাবনা যাই।" নবদ্বীপ পুটলী বাঁধিয়া প্রভুর সঙ্গে পাবনা চলিলেন। ঈশ্বর পুরুষ কিনা, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যসিদ্ধি।

রাজবাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া প্রভু স্নান করিলেন। নবদ্বীপ দাস প্রভুর মটকার কাপড় ধুইয়া ষ্টেসনের বেড়ার উপর শুকাইতে দিলেন। ট্রেণ আসিলে প্রভু রওনা হন। নবদ্বীপ সঙ্গী হন। কুষ্টিয়া পৌঁছিয়া প্রভু পরিধানের বস্ত্র না পাইয়া নবদ্বীপকে মৃদু ভৎসনা করেন। নবদ্বীপের মনে পড়ে, রাজবাড়ী ষ্টেসনের বেড়ার উপর হইতে প্রভুর কাপড় তোলা হয় নাই।

কাপড় খোঁজ করিতে নবদ্বীপ রাজবাড়ী ফিরিয়া চলেন। প্রভু একাকী নৌকাযোগে পাবনা পৌঁছেন। পাবনা পৌঁছিয়া কালাচাঁদপাড়া থাকেন।

নবদ্বীপ রাজবাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিয়া বেড়ার উপর প্রভুর বস্ত্র না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। বস্ত্র অপেক্ষাও তাহার অসতর্কতার জন্য প্রভু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন অধিক। আরও হইবেন—ভাবিয়া নবদ্বীপ বসিয়া পড়িলেন ও হা প্রভু হা প্রভু বলিয়া ডাকিতে থাকিলেন।

ষ্টেসন মাষ্টার বাহির হইয়া নবদ্বীপের সঙ্গে নানা রসিকতা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে উহা তাহার ভাল লাগিল না। শেষে রসিকতার ঢংয়ে বুঝিতে পারিলেন, মাষ্টার মশায় হয়ত প্রভুর বস্ত্রের সন্ধান জানেন। শেষে মাষ্টার মশায় হো হো

করিয়া উচ্চহাস্য করতঃ গৃহ হইতে অতি যত্নে ভাজ-করা অবস্থায় প্রভুর বসন মাথায় তুলিয়া আনিয়া নবদ্বীপের হাতে দিলেন।

বস্ত্র পাইয়া আনন্দে নবদ্বীপ বলিলেন, "মাষ্টার মশায়, আজ আপনি আমায় চির কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিলেন।" মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "দাদা, এ মহাবস্তুর স্পর্শে আজ আমার দেহ গেহ ধন্য হইল।"

"নবা, শিবকে বাতাস কর"

বস্ত্র লইয়া নবদ্বীপ পাবনা পৌঁছিলেন। নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বুড়োশিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপ বাহিরে বসিলেন। প্রভু ক্ষেপার অন্ধকার গোফার মধ্যে গেলেন।

কি যেন কোন্ কথায় কথায় বুড়োশিব অতীব রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। রাগের বেগে শ্রীশ্রীপ্রভুর কোমল অঙ্গে বেশ দুই তিনবার করাঘাত করিলেন। অবশেষে নিজেও কাঁপিতে লাগিলেন।

প্রভুবন্ধু নবদ্বীপকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র শিবকে বাতাস কর।" প্রলয়ঙ্কর রুদ্র-দেবতার রোষে তুচ্ছ পাখার বাতাস কী করিবে—ভাবিতে ভাবিতে নবদ্বীপ বাতাস করিতে লাগিলেন। শিব পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"আমার কথা কিছুতেই শুনবি না! কিছুতেই শুনবি না!!"

কিছুক্ষণ পর শিব শান্ত হইলেন। প্রভু বলিলেন, "শিব,

তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেয়ো লও।" "তুই কিছু দিবি না, খাব কি ? এবার না খেয়েই মরব" বলিয়া শিব মুখ গম্ভীর করিয়া ফিরিয়া বসিলেন।

প্রভুবন্ধু তখন নবদ্বীপকে বাজারে পাঠাইয়া ভাল সন্দেশ, রসগোল্লা ও চমচম আনাইলেন। উহা নবদ্বীপের হাতে দেখিয়াই শিব চেঁচাইয়া উঠিলেন। "উয়া আনবার গেছিস্ ক্যন্। আমার কি উয়ার ক্ষিদা নাকি রে!" এই বলিয়া একটা লাঠি লইয়া নবদ্বীপের পিঠে তিন ঘা লাগাইয়া দিলেন।

নবদ্বীপ হঠাৎ হতভম্বের মত হইয়া গেলেন। তাহার মুখ মলিন দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "নবদ্বীপ, আজ তোর মহাভাগ্য। ভক্তরাজের স্পর্শে আজ তোর সকল অপরাধ ঘুচিয়া গেল।"

প্রভুর বাক্যে নবদ্বীপের মনে আনন্দ হইল। কিন্তু সেদিনকার লীলা খেলার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

শ্রীঅঙ্গন প্রকাশ

ভক্তবর কুঞ্জ সরকারের উপর শ্রীশ্রীপ্রভু অঙ্গনটি নির্ম্মাণ করিবার ভার দেন। প্রথমে প্রভু নবদ্বীপ দাসকে দিয়া আশী টাকা দেন। তারপর নবদ্বীপ নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া অর্থ জোগাড় করিয়া কুঞ্জ সরকারকে পাঠান।

পাবনা জেলায় নগরবাড়ী নামক একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের বিহারী লাল সাহা মহাশয়ের আত্মীয় আছে বাকচর

গ্রামে। তিনি বাকচরে আত্মীয় বাড়ী আসিয়া প্রভুর কৃপাস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

প্রভু গোয়ালচামট বনের মধ্যে নূতন অঙ্গন করিবেন, এই সংবাদ নবদ্বীপ দাস নগরবাড়ী গিয়া বিহারী সাহাকে বলিলে তিনি ঘরের চাল করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন। তাহার বাড়ীতে বহু বাঁশ বন ছিল। তিনি ভাল ভাল বাঁশ কাটিয়া চালের রুয়া আটন তৈয়ারী করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখেন। কয়েক মাস পরে উহা তুলিয়া নৌকায় সাজাইয়া ফরিদপুর আসেন এবং প্রভুর গৃহের চাল বাঁধিয়া দেন। ভক্তের এতখানি আর্ত্তি ছিল, ঐ গৃহের চাল তৈয়ারী ব্যাপারে। তাই ভক্তবৎসল ঐ চালার নীচে সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর মহামৌন অবস্থায় ছিলেন।

প্রভুর মন্দিরের জন্য সালটি কাঠের খুঁটি আসে। খুঁটি-গুলি দশ বার হাত লম্বা ছিল। মিস্ত্রী ঐ খুঁটিগুলি কাটিয়া ছোট করিতে চায়, রামকুমার ও রামসুন্দর তাহাতে রাজী হন না। তাহারা বলেন, "প্রভুর সেবার জন্য যারা আসিয়াছেন সবাই ভক্ত। এই খুঁটিগুলিও ভক্ত। ইহাদিগকে কাটিয়া সেবায় বঞ্চিত করার আমাদের কি অধিকার আছে? যত লম্বাই হউক এগুলিকে নীচে পুতিয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।"

যে মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল সে অতগুলি খুঁটি অতখানি করিয়া পুতিয়া দিতে রাজী হইল না। কথা কাটাকাটির ফলে মিস্ত্রী কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পদ্মার ওপার হইতে দুইজন ভাল মিস্ত্রী খোঁজ করিয়া আনিতে অনেক দেরী হইয়া যায়।

প্রভুর জন্য মন্দির হয় চৌচালা। বার হাত দীর্ঘ, নয় হাত

প্রস্থ। নীচে শীতলপাটী দিয়া খুব পুরু ছোন দিয়া ছাউনী হয়। ডবল চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া হয়। শালটী খুঁটির সঙ্গে বহু বাঁশের খুঁটি লাগান হয়। বাঁশের খুঁটিগুলি বাহির দিয়া লাগান ছিল।

পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুইটি দরজা হয়। জানালা মোটেই রাখা হয় না। এ সকল প্রভুর নির্দ্দেশে হয়।

চৌচালা প্রভুর মন্দির গৃহ ছাড়া আরও তিনখানা ঘর হয় তিন ভিটিতে। প্রভুর ইচ্ছা ঐসব গৃহে ভক্তেরা থাকিবেন ও কীর্ত্তনাদি হইবেন।

———

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা

"নিত্য পাঁচবার অঙ্গন দেখো"

বাংলা ১৩০৬ সন ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। গোয়ালচামট গ্রামবাসী নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ শ্রীশ্রীবন্ধু-সুন্দর শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিবেন।

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীশ্রীপ্রভু নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া-দিয়াছেন। দুইদিন পূর্ব্বে রামসুন্দরকে ডাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন, "তোমার জায়গায় আঙ্গিনা সুতরাং তোমারি আঙ্গিনা প্রতিষ্ঠা উৎসব। তুমি সবাইকে পত্র দিয়া আমন্ত্রণ কর।" রামসুন্দর তাহার সহকর্ম্মী নগরবাসী ও পঞ্চানন্দকে সঙ্গে লইয়া চিঠির খসড়া তৈয়ারী করিলেন ও তিন নাম স্বাক্ষরে সকল বিশিষ্ট ভক্তদের নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন।

প্রথম নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীরাধারাণী

মহামহিমেষু

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দিবস প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফরিদপুর গ্রামে দরবেশের খালের নিকট প্রভুর অঙ্গনে শ্রীশ্রীকীর্ত্তন এবং চৌদ্দমাদল সংকীর্ত্তন হইবে। আপনারা সকলে খোল করতালসহ শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীকীর্ত্তন করিবেন। স্নানাহার করিবেন। নিজগুণে দোষ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। এই সামান্য পত্রিকা দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদন ইতি—

১৩০৬ সন	অকিঞ্চন
২১শে জ্যৈষ্ঠ	শ্রীরামসুন্দর মুদী,
ফরিদপুর গ্রাম	শ্রীনগরবাসী সাহা,
	শ্রীপঞ্চানন্দ সাহা।

অশ্বিনী দত্ত, কুঞ্জ সরকার, রামসুন্দর, রামকুমার, নগরবাসী, ঈশ্বর মাষ্টার, নিবারণ মিত্র, কানাই মিত্র সকলে উৎসবের আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন। উষাকালে মোহন্ত সম্প্রদায় "জাগ গোরা গুণমণি যামিনী প্রভাত হ'ল" গান ধরিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাদল বিশ্বাসকে সঙ্গে করিয়া বদরপুর হইতে গোয়ালচামট আসিলেন। দরবেশের জোলায় (জলাশয়) অবগাহন স্নান করিয়া অন্ধকার থাকিতেই নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

নবদ্বীপদাস, কৃষ্ণদাস, সকলেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন প্রভুর ফর্দ্দমত দ্রব্যাদি লইয়া। নূতন ধূপচিতে প্রচুর নারিকেলের ছোবড়া জ্বালাইয়া ধূপ গুগ্‌গুল চন্দনের

গুড়া পোড়াইয়া শ্রীঅঙ্গনকে গন্ধময় করিয়া দিতে শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে আদেশ করিলেন।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া সাজি ভরিয়া লইয়া সারি সারি আসিতে লাগিল। কেহ জল তুলিতে লাগিল, কেহ তরকারী তৈয়ারী করিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহোৎসবের উনুন ধরাইয়া দিলেন।

কীর্ত্তনের রোলে শ্রীঅঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। কুল-ললনাগণ উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

চৌদ্দমাদল

চৌদ্দমাদল নগর কীর্ত্তন বাহির হইল অপরাহ্নে। সর্ব্বাগ্রে মোহন্ত সম্প্রদায়। হরিদাস মূল গায়ক। মহিম মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় দলে বাকচরের দল। মূল গায়ক গোপাল মিত্র। বনমালী, নব দত্ত, মহিম দাস প্রভৃতি সঙ্গে গায়ক। তৃতীয় দলে বাকচরের বালক সম্প্রদায়। চতুর্থ দলে ব্রাহ্মণকাঁদার সম্প্রদায়। পঞ্চম দলে গোয়ালচামটের অশ্বিনী দত্তের দল। গোয়ালচামটের একটি বালকদের দল আছেন। তাহাতে জগবন্ধু সাহা, কেদার শীল, রামসুন্দরের বালকপুত্র কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি আছেন। ষষ্ঠ দলে বদরপুরের ভক্তগণ। সপ্তম দলে চৌধুরী বাবুদের দল।

স্বয়ং প্রভু কীর্ত্তনের দল বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রত্যেক দলে দুইখানা মৃদঙ্গ ও চারি জোড়া করতাল দিয়া কোন্ দলে কী

কীর্ত্তন হইবে তাহা স্থির করিয়া দিলেন। ফরিদপুর সহর প্রদক্ষিণ করতঃ হরিনাম রোলে সহর কাঁপাইয়া মহাকীর্ত্তন অঙ্গনে ফিরিল।

সুরেশ, উপেন, দেবেন, নকুল, লোকনাথ প্রমুখ বালক ভক্তগণ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের গোপনে আনীত "মালসা ভোগ" গ্রহণ করিয়া প্রভু আনন্দে হাসিলেন।

সন্ধ্যায় মহোৎসবের মহাপ্রসাদ বিতরণ হইল। কয়েক সহস্র নরনারী আকণ্ঠ পুরিয়া পরম তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিল। প্রসাদ প্রাপ্তিকালে নারীগণের উলুধ্বনির রোলে শ্রীঅঙ্গন যেন নাচিয়া উঠিল। অঙ্গন প্রতিষ্ঠা উৎসব পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইল। নিত্য লীলাধাম প্রপঞ্চে প্রকট হইলেন।

পরমানন্দে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইল। অঙ্গন হইবার পর শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর আসিলে অঙ্গনেই থাকিতেন। কলিকাতা হইতে প্রায়শঃ ভক্তদিগকে চিঠি দিতেন, অঙ্গনটিকে যত্নে পালন করিবার জন্য।

একবার শ্রীরামসুন্দরকে লিখিয়াছিলেন,—

"রামসুন্দর! রাধাবিনোদ স্মরণ কর। অঙ্গনটি পালন কর। ভক্তিশিক্ষা দেও। নিত্য কৃষ্ণনাম জপ ও ধ্যান কর। নগর কীর্ত্তন কর।"

অপর একসময় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "রামসুন্দর! নিত্য পাঁচবার অঙ্গন দেখো। তোমাদেরই অঙ্গন। তোমাদেরই ধর্ম্ম ও ইষ্ট স্থান।"

শ্রীঅঙ্গনের পবিত্রতার প্রতি প্রভুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রভুর চৌচালা মন্দির গৃহ ছাড়া আরও তিনখানি ছোটঘর ভক্তদের জন্য নির্ম্মিত হয়। কিছুদিন প্রভুর ইচ্ছামত ঐ সব গৃহে ভক্তেরা থাকিতেন ও কীর্ত্তনানন্দ ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। কিন্তু প্রভুর অনুপস্থিতি কালে কখনও কখনও ঐ সব ঘরে বৈষয়িক কথাবার্ত্তা বা তাস পাশা খেলা চলিত।

শ্রীশ্রীপ্রভু উহা জানিতে পারিয়া রমেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, রমেশ, আঙ্গিনা পচিয়া গিয়াছে, আমার ঘর ছাড়া আর সব ঘর-গুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া বিষয় কথার আড্ডা দূর করিয়া দিও।"

পত্র পাইবামাত্র রমেশচন্দ্র প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন। তিনি একখানি কুঠার লইয়া গিয়া ঘরগুলির খুঁটিগুলি কাটিয়া দিয়াছিলেন। ঘরগুলি হুড়মুর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের পতনের শব্দ শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে, ভক্ত ভগবানের সেবায় বঞ্চিত হইয়া গৃহগুলি বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া জীবন ত্যাগ করিল।

এই ঘটনায় ভক্তেরা ভীত হইলেন। শ্রীঅঙ্গন মধ্যে বাজে কথা আলোচনা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। একদিন প্রভু মন্দিরে আছেন। বাহিরে ভক্তগণ প্রভু কি বস্তু তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রীশ্রীপ্রভু ভিতর হইতে শুনিতে পাইতেছিলেন। গৃহ মধ্য হইতেই গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—
"যেদিন রাস্তায় ইটপাটকেল সজীব পদার্থের মত নৃত্য করিতে থাকিবে, সেইদিন জগদ্বন্ধু নামের সার্থকতা জানিবে।"

———

শ্রীশ্রীবন্ধুকুণ্ড

শ্রীঅঙ্গনের পশ্চিম পার্শ্বে যে জলাশয়টি উহা একটি দেবখাত। মনুষ্য নির্ম্মিত নহে। প্রাচীনেরা উহাকে রাধাকুণ্ড কহিতেন। নবীনেরা বলেন বন্ধুকুণ্ড। বর্ষাকালে পদ্মানদী হইতে প্রবলবেগে জল আসিয়া শ্রীকুণ্ডে পতিত হয়। তখন অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে

ঐ জলে বন্ধুসুন্দর প্রায়শঃই স্নান অবগাহন করিতেন। কখনও পাঁচ দশ ঘণ্টা পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পদ্মের মত ভাসিতেন। বহু ভাগ্যবান জন তীরে দাঁড়াইয়া সে অপূর্ব্ব জল-বিহার লীলা দর্শন করিত।

শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্ব উত্তর কোণে একটি প্রকাণ্ড ঝাউগাছ। তাহার তলদেশে অনেক সময় আপন মনে বসিতেন। স্বানু-ভাবানন্দে রসে ঢল ঢল করিতেন। শ্রীকুণ্ড তখন শ্রীঅঙ্গের প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া আনন্দে নাচিত। বন্ধুকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনায় শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী লিখিয়াছেন,—

যেই বন্ধু সেই কুণ্ড
বন্ধু বন্ধু বন্ধুকুণ্ড।
জাহ্নবী যমুনা মিলন
রস সরসী ॥

"আমায় ঝেড়ে দে"

অঙ্গন প্রতিষ্ঠা হইবার পর বন্ধুহরি শ্রীঅঙ্গনেই আছেন। বনবিহারী বনমধ্যে নূতন আসন রচনা করিয়া ভক্তগণের প্রেম প্রীতি আস্বাদন করিতে কত রঙ্গের খেলা আরম্ভ করিলেন। কতজনের সঙ্গে কত প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইলেন। কাহাকেও কাকা, কাহাকেও জেঠা, কাহাকেও খুড়ী, কাহাকেও মাসী ডাকিয়া কত রঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের কোণের স্নেহ-মধু আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

রামসুন্দরের ঘরণীকে বন্ধুসুন্দর কখনও "মা-বুড়ি," আবার কখনও বা "জেঠি" সম্বোধন করেন। তাহারাও বন্ধুধনকে প্রাণধন করিয়া লইয়াছেন।

একদিন অতি ভোরে বন্ধুসুন্দর ব্যস্তত্রস্ত ভাবে রামসুন্দরের বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। মা-বুড়ীকে সম্মুখে পাইয়াই বলিলেন, "মা-বুড়ি, জেঠি, আমায় ঝেড়ে দে। কাল অনেক রাত্রে গিয়েছিলেম কুণ্ডের পারে ঝাউতলায় দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে। তখন প্রলয়ের গরম বাতাস এসে আমায় বড় ভয় দেখায়ে গেল। শরীরটা শিউরে উঠল। ওঃ এখনও কাঁপছে। মা-বুড়ি, তুই ঝেড়ে দে। তুই ঝেড়ে দিলেই সেরে যাবে।"

কথা বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দরের অঙ্গজ্যোতি শত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বদন-মণ্ডলে শতচন্দ্রের স্নিগ্ধতা। আধ আধ মধুর ভাষায় মাধুর্য্যের উৎস। রামসুন্দর ঘরণী অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হইতেছেন না। ঝাড়িবার মন্ত্রও তিনি জানেন না। হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া তিনি কেবল রূপমাধুরী আস্বাদন ও কথামাধুরী পান করিতে লাগিলেন।

একটু পরে শ্রীরামসুন্দরও আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। গৃহিণী তখন স্বামীকে বলিলেন, "ওগো যাওনা, খাবাসপুর হতে ওঝা ডাকিয়া লইয়া আইস। পিরভু ভয় পাইছেন। ভাল ঝাড়ফুক করা দরকার, আমি আর কি জানি!"

রামসুন্দর বন্ধুসুন্দরের লীলারঙ্গের কথা অনেক শুনিয়াছেন। অনেক খেলা নিজেও দেখিয়াছেন। তিনি জানেন, ইহা একটি লীলা-চাতুরী মাত্র। তিনি তখন পত্নীকে বলিলেন, "ওগো তুমিই ঝাড়িয়া দেও। ও প্রভুর ভয় টয় কিছু না। তোমাকে ভাগ্য দিবার জন্য এই সব ছলনা মাত্র। যাঁহার শ্রীচরণ দেবতাগণেরও দুর্লভ, তাঁহার গায়ে হাত দেওয়া, সেত মহাভাগ্যের কথা। হরিবোল হরিবোল বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেও।"

রামসুন্দর-গৃহিণী তখন ছেলে ভুলান ছড়া গাহিবার মত হরিবোল হরিবোল বলিয়া সেই কুসুমিত কোমলাঙ্গে কর স্পর্শ করতঃ ঝাড়িয়া দিলেন। বন্ধুর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার দেহ যেন জড় হইয়া গেল—এক পরমানন্দ সমুদ্রে তিনি নিপতিত হইলেন। ব্যাহ্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ভক্তঅঙ্গের বিকার লীলারঙ্গময় উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মধুর স্বরে কহিলেন, "মা-বুড়ি, তোর ঝাড়ায় আমি ভাল হয়ে গেছি। এখন আর কোন ভয় নেই।"

নানা রঙ্গে ভঙ্গে হেলিতে দুলিতে বন্ধুসুন্দর অঙ্গনে চলিয়া গেলেন। রামসুন্দর ও মা-বুড়ী অপলকে চাহিয়া রহিলেন।

"তিন ডাকেই কেষ্ট পেলি"

রামসুন্দরের একটি বালক পুত্র। নাম তার কৃষ্ণকুমার। কৃষ্ণকুমার মায়ের অঞ্চলের নিধি। মা-বুড়ী একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকাল বেলা, ছেলে কোলে নিয়ে এসেছেন আঙ্গিনায়।

প্রভুর শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই কয়েকটি আমগাছ আছে। তাহাতে ঝুলিতেছে পাকা পাকা আম। মা-বুড়ী ছেলেকে ভূমিতে রাখিয়া আকসী দিয়া গাছ হইতে আম পারিতে লাগিলেন। চঞ্চল বালক খেলিতে খেলিতে যেন কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মা ছেলেকে দেখিতে না পাইয়া আম পারা ছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ছেলেকে ডাকিতে লাগিলেন—"ও কেষ্ট, ও কেষ্ট কেষ্টরে—" মায়ের ডাকে কেষ্ট ছুটিয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। "কেষ্ট কেষ্ট" ডাক শুনিয়া ভাবাবিষ্ট বন্ধুসুন্দর খট করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"মা-বুড়ি কেষ্ট পেলি ?"

কৃষ্ণজননী কহিলেন, হাঁ পিরভু পেয়েছি, দুষ্ট কোথায় যেন গেছিল একা একা।

প্রভু বলিলেন, "জেঠি, আমি ত কত ডাক ডেকেও কেষ্ট পাই না। আর তুই তিন ডাকেই কেষ্ট পেলি !! তোর মত ডাকতে পারি না।"

মা বলিলেন—পিরভু যে কী বলেন। আপনিই ত কেষ্ট।

পার্শ্বস্থ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা কেষ্ট, পিরভুকে প্রণাম

কর।” বালক কৃষ্ণ দূরে ভূমিষ্ঠ হইল। বন্ধুসুন্দর কৃষ্ণকুমারের প্রতি কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মণকান্দা হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীঅঙ্গনের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে কানাই মিত্র ও রামসুন্দর আছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীপ্রভু কানাই মিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“এই গানটা করত ?

“জগৎ মাতালে জগত জগদ্বন্ধু নাম দিয়ে।”

ভক্তদ্বয় পরমানন্দে এই গান গাহিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। প্রভু খুব হাসিতে লাগিলেন।

ছোট জয়নিতাই

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রীশ্রীপ্রভু অধিকাংশ সময় শ্রীঅঙ্গনেই থাকেন। কাছে কাছে থাকে একটি নূতন সেবক। সেবকটির নাম জয়নিতাই। প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামও জয়নিতাই বলিয়া সকলে এই নূতন সেবককে “ছোট জয়নিতাই” বলিয়া ডাকেন। তাহার দক্ষিণ গণ্ডে একটি টিউমার ছিল। এইজন্য কেহ কেহ তাহাকে গুঠলি জয়নিতাই বলিয়াও বলিতেন।

ছোট জয়নিতাই অল্পদিনে নিজগুণে ভক্তগণকে আপন করিয়া লইয়াছেন। প্রভুও ভালবাসেন। নিষ্ঠা পবিত্রতা ইহার জীবনের ব্রত।

বৃথা সময় নষ্ট করা নাই। গ্রন্থাদি পাঠ, উচ্চকীর্ত্তন, প্রভুর আদেশ উপদেশ আলোচনা, অবসরে ছোট জয়নিতাইর এই কার্য্য। আর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য অনুরাগে প্রভুর সেবা।

প্রত্যহ প্রভাতে প্রভুর আদেশমত টহল কীর্ত্তন করিতেন। নবযুগের নবগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের নামেই নিত্যটহল দিতেন।

"ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

ইহাই ছিল ছোট জয়নিতাইর টহলের প্রধান পদ। কাহারও কাহারও মতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এই পদ গাহিয়া। কেহ কেহ বলেন, চম্পটী ঠাকুর এই পদ প্রথম গান করেন বুড়াশিবের ইঙ্গিতে পাবনা সহরে।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত পদকীর্ত্তনে ছোট জয়নিতাইর খুব উল্লাস ছিল। সন্ধ্যাবেলা নগর ঘুরিয়া নিজের তৈয়ারী একটি পদ গাহিতেন,—

সারাদিন গেল ভাই,
ভজ গৌরাঙ্গ নিতাই।

বাকচর বদরপুর ব্রাহ্মণকাঁদা, গোয়ালচামট, টেপাখোলা সকল লীলাভূমির ভক্তগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন, ছোট জয়নিতাই।

———

ভক্ত দণ্ড

মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজভক্তে দণ্ড করে মর্ম্ম বুঝাইতে॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস

মাঘ মাসের প্রবল শীতের দিন। একজন মহিলা আসিয়াছেন শ্রীঅঙ্গনে সন্ধ্যার সময়। তাহার জনৈক আত্মীয় তাহাকে শ্রীঅঙ্গনে পোঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কথা থাকে, কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীঅঙ্গন দর্শন করিয়া মহিলাটি সঙ্গী ভদ্রলোকের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন! কিন্তু তিনি আর ফিরেন না।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অল্পক্ষণ পরেই ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। মহিলাটি সহরে নিজ আত্মীয়ের বাসায় যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কিন্তু ভীষণ অন্ধকারে একাকী পথ চলিতে সাহসী হন না।

কর্ত্তব্য বোধে ছোট জয়নিতাই তাহাকে সহরের তাহার আত্মীয়ের বাসা পর্য্যন্ত পোঁছাইয়া দিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া নিজ শয়ন-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

প্রভাতে উঠিয়া উষাস্নান করতঃ তিনি নগর পরিভ্রমণ করিয়া টহল কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন শেষে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রণত হইবার উদ্দেশ্যে। অন্যদিন বন্ধুসুন্দর দাঁড়াইয়া জয়নিতাইর কীর্ত্তন শোনেন, আজ আর শুনিলেন না।

ভক্ত নিকটে আসিতেই প্রভুবন্ধু তিন পা পিছনে সরিয়া

গিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তুমি গৃহে যাও। এ জীবনে অঙ্গনে এস না। সাধু বেশ ত্যাগ কর। যোষিত সংস্পর্শে তোমার দেহ কলুষিত হয়েছে।"

প্রভুর কঠোর বাণী শুনিয়া ছোট জয়নিতাই শুষ্ক কাষ্ঠের মত নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভু তখন অতি দ্রুত নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একখানি কাগজ লিখিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া গেলেন। কাগজখানি তুলিয়া শিরে ঠেকাইয়া ভক্ত তাহা পাঠ করিলেন,—

শ্রীজয়নিতাই !

গৃহে যাও, বিবাহ কর, কলুষ দেহ ত্যাগ কর। মানস বৈরাগ্য কর। বন্ধু কাকচরিত। সত্য জান। দেশে দেশে কীর্ত্তন সর্ব্বত্র প্রচার কর। ত্রিকালে ভ্রমণ কর। নিষ্ঠা কর। দেহ পবিত্র কর। ইতি !

চিরবন্ধু ! অঙ্গন !

"চিরবন্ধু"

জয়নিতাই এতক্ষণ বজ্রাহত বৃক্ষের মত স্পন্দন-রহিত অবস্থায় ছিলেন। তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। প্রভুর কঠোর বাক্য বজ্রের মতই তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী লিখিত বাণী পাইয়া যেন প্রাণের স্পন্দন একটু ফিরিয়া পাইলেন।

প্রভুর শ্রীমুখের উক্তির মধ্যে ছিল শুধুই বর্জ্জন। শ্রীহস্তের বাণীর মধ্যে ছিল কিঞ্চিৎ গ্রহণের সরসতা। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী কথাটি হইল "চিরবন্ধু,"। ভক্ত বুঝিলেন, প্রাণের দেবতা ত্যাগ করিয়াও চরণে রাখিয়াছেন।

"চিরবন্ধু চিরবন্ধু" শব্দটি কত মধুর! কঠোরতার মধ্যে এ মাধুর্য্য নিরুপম। জয়নিতাই পুনঃ পুনঃ উহা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া বুকে পড়িতে লাগিল। শেষে একখণ্ড দণ্ড যেমন ভাবে মাটিতে পড়িয়া যায়, সেইভাবে ধরাস করিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অঙ্গনের পবিত্র ধূলায় গড়াইতে গড়াইতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরের মধ্যে বন্ধুহরি পাষাণ বিগ্রহের মত বসিয়া রহিলেন।

"আবার যেন মনেরমত হইয়া আসিতে পারি"

ছোট জয়নিতাই প্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত কাগজখানা লইয়া ফরিদপুর সহরের বালক ভক্তদের একজনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বালকদের কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। প্রভুর পদাতিক সৈন্য বালকদলের পাঁচ ছয়জন শ্রীঅঙ্গনে আসিলেন। তাহার প্রিয় ভক্তের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বন্ধু-সুন্দরের শ্রীচরণে শত শত অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু প্রভু তাহাদের কোন কথাই কানে তুলিলেন না। বালকভক্তগণ তাহাদের কুসুম-কোমল প্রাণবন্ধুকে এমন বজ্র-কঠোর দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন।

ছোট জয়নিতাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ফরিদপুর সহর প্রান্তে একটি নির্জ্জন ঘরে একখানি তক্তার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। দীর্ঘ দেড় মাস একভাবে থাকিলেন। দেহ গেল জীর্ণ শীর্ণ হয়ে। তবু অন্ন জল গ্রহণ করিলেন না। কেবল "চিরবন্ধু চিরবন্ধু" জপিতে লাগিলেন।

কোন কোন ভক্ত বলিলেন, "জয়নিতাই, আপনি চলুন, প্রভুর কাছে শ্রীঅঙ্গনে। আপনার এ অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই প্রভুর দয়া হবে। আমরা সকলে আপনাকে লইয়া প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা চাহিয়া লইব। প্রভু এত নির্দ্দয় হইবেন না, নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন।

ভক্তদের কথা শুনিয়া জয়নিতাই ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেন, "আপনারা ওকথা বলিবেন না। আমি আর এজীবনে শ্রীঅঙ্গনে

যাইব না, সত্যই আমার এ দেহ কলুষিত হইয়াছে, প্রভু ঠিকই বলিয়াছেন। আমার মনে হয় আমি সন্নিধানে থাকিলে আমার বাতাসেও প্রভুর কষ্ট হইবে। আমার জন্য যেন প্রভুর কোন কষ্ট না হয়, এই আমার অন্তরের ইচ্ছা।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন "আপনারা সকল ভক্ত মিলিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিয়া আবার যেন তাহার মনের মত হইয়া আসিতে পারি।"

সকল ভক্তগণ তখন চেষ্টা করিয়া তাহাকে তাহার নিজ বাটীতে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ী রওনা হইবার আগে ভক্তবর অতি ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গনের নিকটে আসিলেন। অঙ্গনের সীমার বাহিরে যশোহর রোডের উপর দাঁড়াইলেন। কতক্ষণ অতীব কাতর চক্ষে শ্রীঅঙ্গনের অভিমুখে প্রভুর গৃহের দিকে তাকাইয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—

"চেয়ে কৃপা-চক্ষে কর রক্ষে দণ্ড-কমণ্ডলু-ধর"

শেষে নত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। বাড়ী পৌঁছিবার একমাস যাইতে না যাইতে তাঁহার দেহান্ত হয়।

অপরাধ দেখি প্রভু যারে শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে॥

———

"ওকে মায়ায় গ্রাস করেছে"

নবদ্বীপদাস কোনও ভক্তের নিকট হইতে দশটি টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। নিয়ম ছিল, যেখানে যাহা ভিক্ষা মিলিত প্রভুর চরণ পাশে তাহা দিয়া দিতেন। এই টাকাটা দেওয়া হয় নাই। পুটলীর মধ্যে বাধাই ছিল।

কয়েকদিন পর একদিন প্রভু নবদ্বীপের পুটলী খুলিয়া টাকা নিয়া রাখিয়া দিলেন। নবদ্বীপ তখন ঘরে ছিলেন না। পরে পুটলী খুলিয়া টাকা না পাইয়া উদ্বিগ্ন হন। দুই একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ টাকা নিয়াছেন কিনা।

নবদ্বীপের উদ্বেগ ও জনে জনে জিজ্ঞাসা দেখিয়া প্রভু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ দেখিয়া নবদ্বীপ বুঝিলেন, টাকা প্রভুই লুকাইয়াছেন। টাকাটা এতদিন প্রভুর কাছে গোপন করিয়া রাখা ঠিক হয় নাই বুঝিয়া নবদ্বীপ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রভু একখানি বাঁশের চটা দ্বারা নবদ্বীপকে একটা আঘাত করিলেন। নবদ্বীপ এককোণে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নবদ্বীপকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন "ওকে মায়ায় গ্রাস করেছে।"

———

আত্মার খেলা

শুনিয়া মুরলী রব দিব্যমূর্ত্তি লোলসব,
আসি দরশন করে সভে॥

গভীর রাত্রে ফরিদপুরের বালকভক্তগণ আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে একত্রিত হন। সারারাত্র প্রভু তাহাদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ান। বালকগণের দিনে আসিবার তেমন সুযোগ সুবিধা হয় না। রাত্রে আসে সকলের অগোচরে। এই লীলা চলে শীতগ্রীষ্ম বারমাস।

মাঘ মাস। শীতের কুয়াসামণ্ডিত জোৎস্নাময়ী রাত্রি। প্রভু বন্ধুসুন্দর বালকগণ সঙ্গে ফরিদপুরের মেলার মাঠে বিচরণ করিতেছেন। হঠাৎ একটা বাবলাগাছের নীচে আপাদমস্তক বস্ত্র-ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ আপনমনে দূরে দূরে ঘুরাফিরা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ এদিক ওদিক ঘুরেন বটে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টিটা নিবদ্ধ থাকে বাবলাগাছের দিকেই। দৈবাৎ তাহারা দেখিতে পাইলেন, প্রভুর শ্রীমস্তকের নিকট একটা নীলবর্ণ ক্ষীণ আলো রেখা। দেখিতে দেখিতে আলোটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, আবার নিভিয়া গেল। আবার জ্বলিয়া নীল আভা বিকীর্ণ করিল। এইরূপ ভাবে কিছু সময় ধরিয়া আলো জ্বলিল ও নিভিল।

মস্তকের দিককার আলো নিভিয়া যাইবার পর পাদদেশে পুনঃ তিনটি আলো দেখা দিল। আলো তিনটি একবার পদপ্রান্তে যায়, আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপ ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এই আলোর খেলা চলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা জানিবার জন্য সকলে বিশেষ কৌতুহলী হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন সকলে মিলিয়া প্রভুবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধুসুন্দর মধুর হাসিয়া বলিলেন, "ও সব উদ্ধার প্রয়াসী আত্মার খেলা।"

অপ্রাকৃত স্মরণ

ঢাকা হইতে রমেশচন্দ্র শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট কতিপয় প্রশ্ন করিয়া পত্র দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কি, উহা দাম্পত্য প্রণয় কিনা, উহা দোষদুষ্ট কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার পত্রের উত্তর লিখিয়াছেন,—

শ্রীঅঙ্গন
গোয়ালচামট

পরম কল্যাণীয়েষু
রমেশচন্দ্র শর্ম্মা,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি প্রতিদিন দুইখানি করিয়া পত্র আমাকে লিখিবে। এই পত্রে তোমার সমগ্র প্রশ্ন থাকিবে।

ছয় বৎসর বয়সে শ্যাম রাস করেন, ভাগবতে দেখিও। অবশ্য তিনি অস্ফুট। তাহার সখীগণ অবশ্য তা অপেক্ষা ছোট। সুতরাং অস্ফুট ও অক্ষত। তবে কন্দর্প কোথা? সব প্রাকৃত কল্পনা মাত্র।

গোপীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত। পয়োধর উপস্থ কটাক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃত জীবেরই কল্পনা মাত্র।

যে বিষ্ণু বিশ্বকর্ত্তা এই শ্যামই সেই বিষ্ণুর উপাস্য। সুতরাং শ্যাম সকলের প্রিয়তম। বিষ্ণুই পরমেশ্বর। বিষ্ণু প্রকৃতি। সুতরাং সবেই প্রকৃতি। শ্যাম ভিন্ন আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই।

শ্যামের বা ব্রজগোপীর প্রতি সাধারণের অপ্রাকৃত ও অকৈতব স্মরণ স্ফুরণ দর্শন সীমন্তন আস্বাদন আবশ্যক। দম্পতি ভাব নয়, দম্পতির ভাব প্রাকৃত মাত্র।

ফকীর

"নাম শুনে মুক্ত হলেন"

অপর একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু ভক্তসঙ্গে নৈশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, ব্রাহ্মণকাঁদার দিকে। ব্রাহ্মণকাঁদার নিকটে গিয়া উত্তর মুখে রাজবাড়ী রোড়ে চলিলেন। ফরিদপুর হইতে রাজবাড়ী অভিমুখে একটি বিশ মাইলের অধিক দীর্ঘ রাস্তা আছে। রাস্তাটি বড় সুন্দর। দুই পার্শ্বে বহু ছায়া-তরু। ঐ সকল ছায়া-তরুর প্রত্যেকটির তলেই প্রভু কোন না কোনদিন উপবেশন করিয়াছেন।

রাস্তার দুই দিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে দুই একটি গাছ। বাবলা গাছই বেশী॥ শ্রীশ্রীপ্রভু রাস্তার পার্শ্বস্থ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। "আমি এখানে

বিশ্রাম করি, তোরা ঐ বাবলা গাছটা ঘিরিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করগে।"

ভক্তগণ প্রভুর আদেশবাক্য শুনিয়া বৃক্ষ ঘিরিয়া কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। নাম করিতে করিতে তাহারা তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

শীতের আকাশ। মেঘমুক্ত, পরিষ্কার। কোন প্রকার ঝড় বৃষ্টির বিন্দুমাত্র লক্ষণ নাই। হঠাৎ গাছ হইতে ঝর ঝর শব্দে জল পড়িতে লাগিল। একটু পরেই মরমর শব্দ করিয়া একখানি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বালকগণ ভয় পাইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। বন্ধুসুন্দর যেদিকে আছেন সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বন্ধুসুন্দর জোরে হাততালি দিলেন। বালকগণ হাপাইতে হাপাইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণোপান্তে উপনীত হইলেন। তাহাদের দশা দেখিয়া প্রভু খুব হাসিতে লাগিলেন। বন্ধুর শ্রীমুখে খলখল হাসি দেখিয়া তাহারা শান্ত হইলেন।

তখন বন্ধুহরি কহিলেন, "বাবুলোক সব, গান বন্ধ করলে কেন? গান বন্ধ না করলে একজন মহাত্মার দর্শন পেতিস, তিনি উদ্ধারণ প্রয়াসী হয়ে আমাপানে চেয়েছিলেন। তোদের মুখে নাম শুনে মুক্ত হলেন। নাম বন্ধ না করলে স্বরূপ দেখতে পেতিস্।"

বালকভক্তগণ কিন্তু খুব একটা ঠকিয়া গিয়াছেন এমত মনে করিলেন না। বন্ধুসুন্দরের কথার জবাবে তাহারা বলিলেন, "আমরা ওসব কিছু দেখতে চাই না। শুধু তোমাকেই দেখতে চাই।"

বালকদের প্রেমের ভাষায় বন্ধুসুন্দর সুখী হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। নিশা প্রায় অবসানে বন্ধুহরি ফিরিলেন নিজ শ্রীঅঙ্গনে। বালকগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইবার কালে তাহাদের অন্তরের একটি জিজ্ঞাসা অন্তরে জানিয়া অতি মর্ম্মস্পর্শী সুরে কহিলেন,—

"অণু পরমাণু স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধারণ প্রয়াসী হয়ে আমাপানে চেয়ে আছে। এবার সবকেই হরিনাম আস্বাদন করাইব। তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

এই প্রাণভরা বাণী হৃদয়ে লইয়া বালকগণ স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

কেদার কাহা

শ্রীশ্রীপ্রভুর নৈশ-ভ্রমণের সঙ্গী কেদারশীল নামক অপর একটি কিশোর বয়স্ক ভক্ত ছিলেন। প্রভু রাত্রের ভ্রমণে কোনও দিন সহরের বালক ভক্তগণকে সঙ্গী লইতেন। কোনও দিন বা কেবলমাত্র কেদারকে সঙ্গী করিতেন।

কেদারের বাড়ী গোয়ালচামট গ্রাম, শ্রীঅঙ্গনের অতি সন্নিকট। শ্রীঅঙ্গন হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু ডাক দিলে কেদার তাহা শুনিতে পাইতেন। ডাক শুনিবার আশায় কেদার সর্ব্বদা কান পাতিয়াই থাকিতেন। কেদারকে শ্রীশ্রীপ্রভু উপানন্দ বলিতেন। আবার অধিকাংশ সময় "কাঁহা" ও বলিতেন।

"কাহা"—শ্রীকেদার
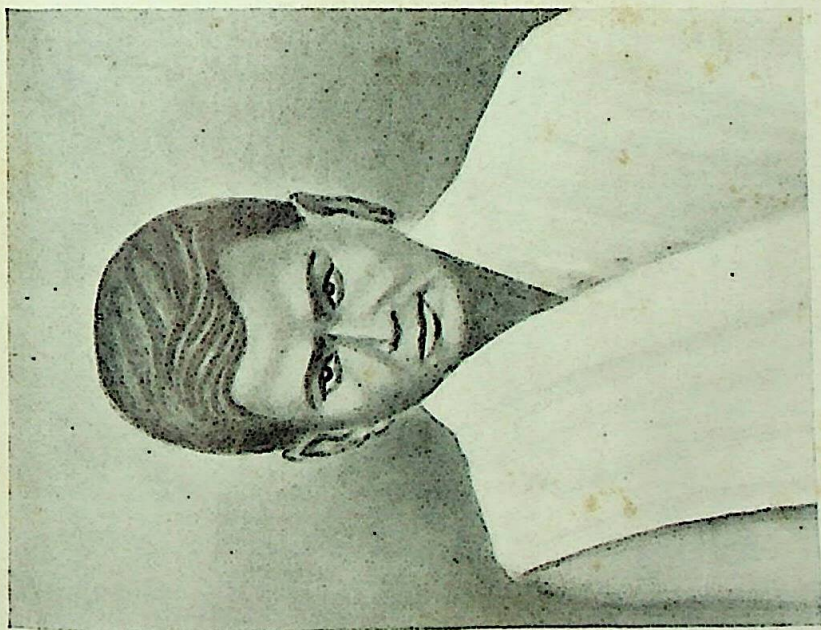
শ্রীমথুরানাথ কর্ম্মকার

উপানন্দ ব্রজরাজ নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। প্রভুবন্ধু নিজেকে নন্দনন্দন অভিমানেই উপানন্দ কেদারকে "কাকা" বলিতেন। ফরিদপুরের কথ্য ভাষায় আদরাতিশয্যে কাকাকে কাহা বলে। ভক্ত সমাজে কেদার শীল কেদার কাহা নামেই সুপরিচিত। আমরাও "কাহা" বলিব।

কাহার বয়স অপেক্ষা মূর্তিখানি ছিল অধিকতর কমনীয়। ত্রিশ বৎসর বয়সেও কাহাকে দেখাইত বার বৎসরের বালকের মত। তাহার কণ্ঠটি ছিল নারীকণ্ঠের মত সুমধুর। প্রভুর রচিত সংকীর্ত্তনগুলিকে যথাযথ সুর তালে গান করিবার যোগ্যতা খুব বেশী ভক্তের ছিল না। যাঁহাদের ছিল তন্মধ্যে কেদার কাহা একজন বিশিষ্ট। কীর্ত্তনের মধ্যে কেদার থাকিলে তিনিই গানের মুখ ধরিয়া আগে গাহিতেন। কাহার কণ্ঠের গানে প্রভুবন্ধু তন্ময় হইয়া সব ভুলিয়া যাইতেন।

কাহাও প্রভুর রচিত গান ছাড়া আর কিছু গাহিতেন না। "কাঁহা, অমুক গানটা গা'ত!" প্রভুর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাহা গান ধরিতেন। অন্য দশজনের মত গড়িমসি বা কাহারও অপেক্ষা করিতেন না। কাহা যখন শেষ রাত্রে গাহিতেন—

গঙ্গা নীরে গৌরচন্দ্র উষাবগাহন।
কল্লোলিনী মালিনী করে আবাহন॥
(দুই কর জু'ড়ে রে)
ধবলিম বীচিমালা ধোয়ায় চরণ।

তখন বন্ধুসুন্দর আর ঘরে থাকিতে পারিতেন না। ছুটিয়া গিয়া বন্ধুকুণ্ডের জলে ঝাপাইয়া পড়িতেন ও বহুক্ষণ ধরিয়া

সন্তরণ ও স্নান করিতেন। নদীয়ালীলার আবেশে বীচি-মালার সঙ্গে জলখেলা খেলিতেন।

প্রভুর 'কাহা' ডাকে কেদার গলিয়া যাইতেন। কাহার মধুর গানে প্রভু গলিয়া যাইতেন। দু'জনে মধুর লীলাখেলা চলিত।

কাহার শ্রীমূর্ত্তিটি যেমন বালকের মত, স্বভাবটিও ছিল তদ্রূপ। কৌমার বয়সেও বাল্যচাপল্য তাহার ভূষণ স্বরূপ ছিল। চপলতা বশতঃ কাহা অনেক সময় প্রভুর অবাধ্যতা করিতেন। এক কথা পাঁচবার বলিলেও শুনিতেন না। ইহাতে প্রভু অভিমান করিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিতেন। প্রভুর মান ভাঙ্গাইবার জন্য কাহা এক অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেন।

শ্রীঅঙ্গনের আশেপাশে বড় বড় আমের গাছ ছিল। গভীর রাত্রে কাহা কোন এক আম গাছের উচ্চ ডালে উঠিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর আস্বাদিত গান ধরিতেন,—

ঐ রসময়

কিশোরী সনে বসিয়ে হেসে কথা কয় মা।

নিধুবনে একাসনে নিশীথ সময় মা॥

গান শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নিধুবন বিহারের আবেশে ঘরের বাহির হইয়া পড়িতেন। ওদিকে নিধুবনে যখন রসময় কিশোরীর সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতেছেন, তখন রঙ্গলাল বন্ধুসুন্দর কী আর কাহার সঙ্গে হাসিয়া কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন ?

প্রথমতঃ প্রভু বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে গান শুনিতেন। প্রভু তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন টের পাইয়া চতুর কেদার গান বন্ধ করিয়া দিতেন।

বন্ধুসুন্দর অস্থির হইয়া বলিতেন, "কাহা, গান বন্ধ কর্‌লি কেন ? আবার গা, কান জুড়াই। বল, পরের অন্তরা বল।"

প্রভু অন্তরা বলিয়া দিতেন,—

শ্যাম নীলকান্ত মণি, রাই কনক বরণী মা ;
হিমাচলে- যেন হেমলতার আশ্রয় মা॥

কাহা তবু চুপ করিয়া থাকিতেন। বন্ধুসুন্দর অস্থির হইয়া উঠিতেন। "কাহা, কাহা রে লক্ষ্মী আমার, গান বন্ধ করিস না—গা,—শ্যাম নীলকান্ত মণি, গেয়ে আমায় বাঁচা।"

প্রভুর অভিমান ভাঙ্গাইয়া কাহা আমগাছ হইতে নামিয়া আসিতেন। তারপর আবার গান—

সুখময় বৃন্দাবন, নব নব সম্মিলন মা ;
কাতরে কন্দর্প রতি করজোড়ে রয় মা॥
শ্যাম শত ইন্দিবর, রাই কনক পুষ্কর মা ;
নব জলধরে যেন দামিনী উদয় মা॥
শারি শুক পিক গায়, শিখিনী উল্লাসে ধায় মা ;
উজান যমুনা জল কল কল বয় মা॥
কুঞ্জে যুগল কিশোর, কেলি রসাবেশে ভোর মা ;
বন্ধু ভনে সখীগণে বলে জয় জয় মা॥

প্রভু আত্মহারা হইয়া কাহার মুখপানে তাকাইরা থাকিতেন। কাহা বন্ধুসুন্দরের ভাববিহ্বল বদনসুধা পান করিয়া উন্মাদের মত নৃত্য করিতেন আর গাহিতেন।

"ডুগু ডুগুতা"

"কাহ্না সাথী কত ম্নাতি বাহ্নিত বন্ধু।"
নাম ধ্বনি ভূতযোনি তারিত বন্ধু॥

কেদার কাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক রাত্রে তুলা-গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইতেন। কাহার হাতে করতাল থাকিত ও প্রভুর পরিধেয় বস্ত্র থাকিত। শেষ রাত্রে কুণ্ড হইতে স্নান করিয়া অঙ্গনে ফিরিতেন, সেই জন্য কাহা প্রভুর বস্ত্র আর একখানি কাপড় দিয়া জড়াইয়া কাঁধের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইতেন। প্রভুর একটি হেরিকেন ছিল। কোন কোন দিন প্রভু কাহাকে হেরিকেনটি লইতে বলিতেন।

তুলাগ্রামের মাঠের মধ্যে একটী স্থানে ত্রিকোণাকারে তিনটী বটগাছ ছিল। ঐ স্থান দিয়া যাইতে দিবাভাগেও লোকের বুক কাঁপিত। এমনি একটা ভীতিপ্রদ আবেষ্টনী সর্ব্বদাই সেখানে বিদ্যমান থাকিত।

একদিন গভীর রাত্রে কেদারকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে উপনীত হইলেন এবং স্থির ভাবে আসনস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তথায় চারিদিকে বহু ডম্বুরুর বাদ্য ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। "ডুগু ডুগুতা ডুগু ডুগুতা" এই রূপ শব্দ অনবরত চলিতে লাগিল। কিন্তু একটি জনপ্রাণীও দেখিতে পাওয়া গেল না।

কাহা ত ভয়ে জড়সর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "কাহা, ভয় পাসনা, আমার কাপড়ের খোঁট ধরিয়া

থাক।” কাহা প্রভুর আদেশমত কাপড়ের কোণা ধরিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু মাঝে মাঝে পিছনের দিকে তাকাইয়া “যা যা” এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে “ডুগু ডুগুতা” বাজনা থামিয়া গেল। তারপর কাহার কানে আসিল মধুর নূপুরের ধ্বনি। কাহা এতক্ষণ ভয়ে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। মধুর ধ্বনি শুনিয়া চক্ষু খুলিলেন। খুলিয়া যাহা দর্শন করিলেন, তাহা অপূর্ব্ব।

কাহা দেখিলেন, রাজকন্যার ন্যায় অতি সুন্দরী সুসজ্জিতা কয়েকটি নারীমূর্ত্তি প্রভুকে আরতি করিতেছে। তাহাদের নৃত্যে তাহাদের পায়ের নূপুর মধুর বাজিতেছে। আরতি করিতে করিতে তাহারা প্রভুসহ বৃক্ষ তিনটিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিল। তারপর একটি একটি করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রভু উঠিয়া আসিলেন। কুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে বিনা ঝড় বৃষ্টিতে ঐ তিনটি বট গাছই উন্মুলিত হইয়া ভূমিস্মাৎ হইয়া যায়। পল্লীর নর নারী অকস্মাৎ ঐ বৃক্ষত্রয়ের পতন শব্দে হতচকিত হইয়া পড়ে। জলে ঝড়ে বর্ষায় শীতে কত শত রজনীতে কাহা বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে মধুর লীলা খেলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক রাত্রিতেই কোনও না কোন নূতন ঘটনা ঘটিত। কে আছে যে তাহা লিপিবদ্ধ করিবে!

এই নৈশ ভ্রমণের মধ্যে আর এক রহস্য এই যে, কেহ যদি কেদার কাহার সম্মুখে একথা বলিত যে, প্রভু রাত্রে ফরিদপুরের বালক ভক্তদের সঙ্গে বেড়ান—তাহা হইলে তিনি দৃঢ়ভাবে

অস্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক রাত্রেই প্রভু তাহাকে সঙ্গী করেন। আর কেহ কোনদিন থাকে না।

আবার, ফরিদপুরের বালকভক্তদের যদি বলা যাইত, প্রভু রাত্রিতে কেদার শীলকে সঙ্গে লইয়া বেড়ান—তাহা হইলে তাহারা অবাক হইয়া ভাবিত—তাহা কেমনে সম্ভবে, বন্ধুত আমাদের লইয়াই প্রায় প্রত্যেক রাত্র অতিবাহিত করেন।

এই সব কথা শুনিয়া মনে হয়, রাত্রে বুঝি বা কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া বন্ধুহরি ভক্ত সঙ্গে বিহার করিতেন।

রাসলীলা স্মৃতি

গভীর রাত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় বৃক্ষরাজি দেখাইয়া কাহাকে বলিতেন, "কাহা দেখ, এই বৃক্ষটি শূদ্রবর্ণ, এইটি বৈশ্যবর্ণ আর এইটি ব্রাহ্মণবর্ণ। কাহা, বৃক্ষেরাও আমায় চিনে। আমিও ওদের চিনি। প্রত্যেককে চিনি। ঐ দেখ, কাহা, ঐ গাছটি কেমন কাতর হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও আমার হাতের একটু স্পর্শ পাইলে কেমন কাঁপিয়া উঠে।"

প্রভু অঙ্গুলি দিয়া বৃক্ষকে স্পর্শ করিবামাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিত, সবগুলি পাতা নড়িয়া উঠিত। কাহা নয়ন ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিতেন ও শ্রবণ ভরিয়া মধুর মধুর কথা শুনিতেন।

একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রভু বন্ধুহরি মুক্ত আকাশ তলে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া সুধামাখা চাঁদের দিকে চাহিয়া শ্রীহরিকথা গ্রন্থের রাসলীলার পদ মধুর সুরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

পৌর্ণমাসী প্রদোষ শারদাকাশ।
পূর্ণ শশী সুখে বসি সৌখ্য ভাষ॥
(সুধাকথা কয় বা) (কুমুদীর মুখ চেয়ে)

কৈরবিণী চকোরিণী চন্দ্রিকা পান।
তারা রাজি শুভ সাজি সখ্য মান॥
(মান হয় হয় না) (চিচি থুয়ে পিপি কয়)
(জলদ নেহারি রয়)

চন্দ্র দর্শনে যেরূপ সাগরের উদ্বেলতা, সেইরূপ চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া, ঐ সকল রাসলীলার পদ বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দরের রূপের সাগর ও ভাবের সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহাভাব তন্ময়তায় বন্ধুসুন্দর বলিতে থাকিলেন,—

বৃন্দাবনে বিভূষণে ধুনীতীরে হরি।
বেণুরব সুর সব মহাম্বর ভরি॥
(সব ভরে গেল রে) (প্রাবৃট ধারার মত)

"বেণুরব" শুনিয়া বন্ধুসুন্দর আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। লীলার রস-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আবার বলিতে লাগিলেন,—

অনীকিনী পদ্মিনী
সুভাষিনী সুহাসিনী
গৌরবিনী সোহাগিনী
সঙ্গিনী রঙ্গিনীয়া।
কেলিকিলা পলায়ন
কুসুমেষু ভূঃপতন
রাধাশ্যাম সম্মিলন
জলদে দামিনীয়া॥

"জলদে দামিনীয়া" দর্শন করিয়া বন্ধুসুন্দর স্বানুভাবানন্দে অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিরুপম ভাবতন্ময়তা দেখিয়া কাহা রাসের আরতির গান ধরিলেন,—

প্রভু নীরব হইয়া কাহার গান শুনিতে লাগিলেন।

আরাত্রিক মিলিতাঙ্গ শ্রীরাসমণ্ডলে।
অবশ সখীসব নেহারে বিহ্বলে॥
মনসিজ পরাজিত পতিত ভূতলে।
শারি শুক পিক ক্লান্ত ভাসে অশ্রুজলে॥
নিশীথিনী নীরব নমে কুতুহলে।
তারকা চন্দ্রমা অম্বুদে ঢলে॥
যমুনা কঞ্জনয়না বিরামে চলে।
পুষ্পসেবি বনদেবী আবাসে টলে॥
রসিতা রজঃরাণী সম্বরে কুন্তলে।
বন্ধুশিক্ষা দ্বার রক্ষা তোরণ তলে॥

কাহার গান শুনিতে শুনিতে বন্ধুসুন্দর উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাহাও উর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, প্রভুর নৃত্যের সঙ্গে স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতা দশদিগন্থ যাহা কিছু সবাই নৃত্য করিতেছে।

ঐদিন প্রভাতে শ্রীশ্রীপ্রভু কাহাকে বলিলেন, "কাহা, এবার মানুষ ত মানুষ, দেখবি, রাস্তার ইটপাটকেল পর্য্যন্ত হরিনামে নৃত্য করবে। হরিনামে প্রেমে ধরা টলমল করবে।" কাহা বলিলেন, "প্রভু, কালরাতে তা দেখেছি।"

———

সর্পাঘাত ও চন্দ্রপাত

রসময়ের লীলানাট্যের দুইটি দৃশ্য। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ লীলায় শ্রীরাধা কাঁদেন কৃষ্ণহারা হইয়া। বহিরঙ্গ লীলায় জীব কাঁদে কৃষ্ণহারা হইয়া। কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার হয়, দশম দশা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে জীবের হয়, চরম দুর্দ্দশা। কৃষ্ণ প্রাপ্তিই সুখ। অপ্রাপ্তিই দুঃখ।

দশম দশার দুঃখ, আর জীবের দুর্দ্দশার দুঃখ, দুই লইয়াই গৌর নিতাই আসিলেন নদীয়ায়। গৌর রহিলেন নীলাচলে রাধার বেদনা লইয়া—"শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।" নিতাই রহিলেন গৌড়দেশে জীবের বেদনা লইয়া "সব জীব র'ল অন্ধ, কেহ ত না পেল হরিনাম।"

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীনিতাইগৌর একাধারে একীভূত। দুই

দুঃখ মিশিয়া এক অভিনবতা প্রাপ্ত। রাধাভাবের আস্বাদন ও কলিহত জীবের উদ্ধারণ শ্রীগৌরলীলায় দুইটি প্রয়োজন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরে দুই মিলিয়া একটি অখণ্ড আস্বাদন। তাহাই নিজ শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন—"লীলাই উদ্ধারণ।"

অন্তরে ব্রজভাবের উদয় হইলেই শ্রীশ্রীপ্রভুর মাথুর বিরহে প্রাণমন আকুল হয়। তখনই বিরহিণীর আর্ত্তিভরা গীতি শুনিতে তীব্র পিপাসা দেখা দেয়। শ্রীরাধার বিরহ-কাতরতার আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুসুন্দর জীব-দুঃখ-কাতরতায় ব্যথাহত হইয়া পড়েন।

শ্রীমতীর কৃষ্ণ-বিরহ দুঃখ ও কৃষ্ণহারা কীট-জীবের ভব-বন্ধন দুঃখ, কেমন যেন একটা একতাপ্রাপ্ত হইয়া বন্ধুসুন্দরকে অভিভূত করিয়া তোলে। বিরহদুঃখ সর্পরূপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ও শিরে দংশন করিতে থাকে। মহাপ্রভুর বিরহদুঃখ লক্ষ্মী-দেবীকে যেমন দংশন করিয়াছিল সর্পরূপে—শ্রীকৃষ্ণবিরহ—(শ্রীরাধার ও জীবের) যুগপৎ দংশন করে বন্ধুসুন্দরকে কাল-সর্পরূপে।

কৃষ্ণহারা হইয়া শ্রীমতীর তাপ—কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জীবের তাপ—এই দুই তাপে গলিয়াই বন্ধুচন্দ্রের গোলোক হইতে ভূলোকে পতন। সুতরাং সর্পাঘাতেই চন্দ্রপাত। চন্দ্রপাত গ্রন্থে "ত্রিকালকে" "খল ব্যাল" অর্থাৎ খলস্বভাব সর্প বলিয়াছেন। ব্যাঘ্রাদি প্রাণী হিংস্র, কিন্তু খল নহে। কারণ তাহারা যাহাকে হিংসা করে তাহার মাংস আহার করে। সর্প খলতার মূর্ত্তি, হিংসা দ্বারা পরের ক্ষতিই করে, নিজে বিন্দুমাত্র লাভবান

হয় না। সেই খলতায় ভরা সর্পের বর্ণনা চন্দ্রপাতেই দিয়াছেন শ্রীহস্তে—

তের হস্ত তুই অক্ষি এক নাসিকা।
অকৃতি আগমাগম অকা আকা ইকা॥
(তুই তুই তুই রে) (হরিপতন কারণ)

এইবার সর্পাঘাত ও চন্দ্রপাত প্রকাশের কথা বলিব। ইহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা প্রভুর পরম স্নেহভাজন কেদার কাহা ও পরম কৃপাভাজন হরিদাস মোহন্ত।

মহালীলার রেখা চিত্র

সেদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। বন্ধুচন্দ্র প্রিয়ভক্ত কেদার কাহা ও হরিদাস মোহন্ত এই তুই অন্তরঙ্গজন সঙ্গে শ্রীকুণ্ড তীরে ঝাউগাছ তলে সমাসীন। পূর্ণচন্দ্র উদয় হয় পূর্ণিমায়। আজ মহাউদ্ধারণচন্দ্র উদিত হইতেছেন অমানিশায়। জীবের চিত্তাকাশে যেদিন ঘোর অমা. সেইদিনই তাঁর প্রয়োজন। জগজ্জীবের চিত্তাকাশের অন্ধকার যেন বাহিরে জমাট বাঁধিয়াছে। শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিও যেন স্তিমিত।

হঠাৎ মহাভাবসিন্ধুর এক নব আলোড়নে বন্ধুসুন্দরের বর-অঙ্গখানি চমকিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে কহিলেন, "হরিদাস, দশমী গাও।"

আদেশ প্রাপ্তিমাত্র হরিদাস গান ধরিলেন,—

মোরে ঘিরে বস সখীগণ, দেখে যাই তোদের চন্দ্রানন।
তোদের কমলিনী, ও সজনি, বিদায় মাগিছে এখন॥

কেন ওলো বিশাখে, পটে দেখালি তাকে,
এখন গরলে জড়িল অঙ্গ বুঝিবে বা কে।
শ্যাম-বিচ্ছেদ-বিষ, দিবানিশি, মোরে করিছে দাহন॥

সখী কেঁদনা লো আর, মোরে কাঁদাওনা আর,
তোমরা কাঁদিলে দশা বুঝে কে আমার।
এখন জনে জনে ফুল্লমনে লহ মোর আভরণ॥

শারি শুক শিখিনী, কোকিল কুরঙ্গিণী,
তারা, দেশে দেশে গায় যেন মোর দুঃখ কাহিনী।
এখন হৃষ্টচিতে ও ললিতে খুলে দাও তাদের বন্ধন॥

র'ল র'ল কুঞ্জবন, শ্যাম-প্রেম-নিকেতন,
বৃথা এ বৈভব বিনে মদনমোহন।
ত্যজি সকল খেলা, যাবার বেলা, দেহ মোরে আলিঙ্গন॥

তুঙ্গবিদ্যা ললিতা, চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী বিশাখা সুদেবী ইন্দুলেখা।
তোমরা ঘিরে ঘিরে, ফিরে ফিরে, কর হরি সংকীর্ত্তন॥

এত বলতে অমনি, ঢলে পড়িল ধনি,
দেহের ইন্দ্রিয় দশ গেল তখনি।
বন্ধু কাঁদিয়ে কয়, এমন সময়, কোথা রাধিকারঞ্জন॥

গান শুনিতে শুনিতে বন্ধুসুন্দর সত্য সত্যই কাঁদিতেছেন। দুই পদ্ম নয়নে শ্রাবণের ধারা দরবিগলিত-ধারে ঝরিতেছে। বিরহ-দুঃখ-কাতরতায় ব্যাকুল হইয়া অতি বেদনায় বিহ্বল ভাবে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। কখনও ধূলায় গড়াইতেছেন।

এমন সময় ভীষণ ভাবে ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া নিকটে আসিল এক বিষধর সর্প। কাহা ও হরিদাস ভয় পাইয়া "সাপ সাপ, প্রভু উঠুন, সরুন" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু গড়াইয়া গিয়া সাপের উপরে পড়াতে সর্পরাজ শ্রীমস্তকে দংশন করিয়া দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল। ভক্তদ্বয় হাহাকার করিয়া উঠিলেন। প্রভুও সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

হরিদাস সর্প দংশনের অনেক কিছু জানিতেন কিন্তু মস্তকে দংশন দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

কয়েক মিনিট পর শ্রীশ্রীপ্রভু নয়ন মেলিয়া কহিলেন, "কাহা রে কোথা গেলি, কীর্ত্তন বন্ধ করলি কেন? তোরা কীর্ত্তন করতে করতে আমাকে শ্রীঅঙ্গনে নিয়া যা।"

আদেশ পালিত হইল। অঙ্গনে আসিয়া বন্ধুসুন্দর ধূলায় গড়াইতে লাগিলেন। হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস, তোমার ঘরে তীব্র শেকো বিষ আছে। তাহা এখনি লইয়া আস।" হরিদাস বিদ্যুৎগতিতে ছুটিলেন। শিয়রে বসিয়া কাহা মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কাহা বলিলেন, প্রভু, হঠাৎ সাপটা কোথা হইতে আসিল? প্রভু বলিলেন, "কাহা, ও আবার আসবে কেন? ও যে চিরকালই আছে। ও তো ত্রিকালের খল ব্যাল। ও তো কীট

জীবগণের হরি বিমুখতা, হরিনাম 'ন উচ্চারণ' করিবার মূঢ়তা। জীবের কীটত্বই সর্প। তার দংশনেই ত আমার গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে আসা। ও তো আমার মাথায় দংশিয়াই আছে।"

কাহা কহিলেন, "প্রভু, সাপটি দশ বার হাত লম্বা হবে। চক্ষু দুটীতে আগুন জ্বলিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "কাহা, দশ বার নয়, ঠিক "তেরহস্ত দুই অক্ষি, এক নাসিকা।" ও জীবের "অকৃতি" মূর্ত্তিমতী। ঐ অকৃতিই হরিপতনের কারণ। ওর চরম আঘাতেই আমার ত্রয়োদশ দশা আনিবে। ঐ সব ভাবী দৃশ্য আমার চক্ষুর অগ্রে বর্ত্তমানের মত সুস্পষ্ট। আজ আমি আমার লীলার চিত্র অঙ্কন করিব।"

কথা বলিতে বলিতে হরিদাস আসিয়া কৌটা ভরা বিষ প্রভুর হাতে দিলেন। কৌটা খুলিয়া সবখানি বিষ মুখে ফেলিয়া দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন,—"বিষে বিষ গেল। বিষয় বাসনায় তাপ। কৃষ্ণ বাসনায় তাপ নির্ব্বাপণ।"

বিষ গলাধঃকরণ করিয়াই প্রভু হরিদাস ও কাহাকে বলিলেন, "তোরা কীর্ত্তন বন্ধ করিস না। এখন হ'তে ভোর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করবি। আজ আর ঘুম নাই। আমি আজ আমার সমস্ত লীলার চিত্র আঁকিব।"

খাতা, লেখনী ও মসীপাত্র লইয়া বন্ধুহরি বসিলেন। লেখা চলিতে লাগিল। হরিদাস ও কেদারের কণ্ঠে শ্রীরাধারাণীর দশম দশার বিরহের ব্যথাভরা গান চলিতে লাগিল,—

ধনি ধূলায় পড়ে অচেতন, লেগেছে দশনে দশন।
রাইয়ের দশেন্দ্রিয় দেহ ছেড়ে করিয়াছে পলায়ন॥

হেম জিনি কলেবর, আজি ধূলায় ধূসর,
কালিমা ঘিরিল সুবিমল বিম্বাধর।
ধনীর মুখশশী, হল মসী, ভালে উঠিল নয়ন ॥

ধনী নাহি নাড়ে পাশ, নাসার না বহে নিঃশ্বাস,
ফুরাল প্রেমের হাসি ও মধুর ভাষ।
আজি রাহু যেন শশধরে করিল গ্রহণ ॥

যখন চেতনা ছিল, কত কথা বলেছিল,
নয়নধারাতে এই ধরা ভিজাইল।
তার একবিন্দু অশ্রুজল গণ্ডেতে আছে এখন ॥

জানি সলিলে কমল, এ যে কমলেতে জল,
বিমল চন্দ্রিকালোকে করে ঢল ঢল।
জিনি শতদল, পরিমল, শ্রীরাধার চন্দ্রানন ॥

যেন গগনের শশী, ভূমে পড়েছে খসি,
কাঁদিছে রূপসী সব নিকটে বসি।
বলে হা রাধিকে, প্রাণাধিকে, একা করো না গমন ॥

যত ব্রজগোপিনী, মোরা তোর সঙ্গিনী,
জীয়নে মরণে হব অনুগামিনী।
রাধে তো বিরহে, এছার দেহে, কেন রয়েছে জীবন ॥

তোর সাধের বৃন্দাবন, নিধু-নিকুঞ্জকানন,
কারে দিয়ে গেলি বাঁকা মদনমোহন।
তোরে লয়ে সাথে, যমুনাতে, করি প্রাণ বিসর্জ্জন ॥

সব সহচরিগণ, রাই শোকেতে মগন,
হা রাধামাধব বলি করিছে রোদন।
জগদ্বন্ধু ভনে নাম শুনে ধনী পাইল জীবন ॥

বিরহের বেদনা, বিষের বেদনা, মিলিয়া মহাভাবসিন্ধু বন্ধুসুন্দরের মহাচেতনায় অমৃতময় চন্দ্রপাত মহাগ্রন্থ ফুটিয়া উঠিল।

নিজ মুখে নিজ নাম

"চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে"

প্রভাতে শ্রীমান তারকেশ্বর প্রভুর আদেশে খাতা হইতে অপর একখানি খাতায় নকল করিয়া তুলিলেন। ঐ লিখিত খাতা কেদারকে দিয়া প্রভু বলিলেন, "কাহা, রাত্রেই ইহা গান করিবে। এই চন্দ্রপাত—গোলোকচন্দ্রের ভূমিতে অবতরণের সকল সংবাদ।"

দুই এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কাহা বলিলেন, "কিছুই ত বুঝা যায় না।" প্রভু বলিলেন, "বুঝ না বুঝ সন্ধ্যায় খানিক মুখস্থ করিয়া আসিও।"

সন্ধ্যায় কাহা ও হরিদাস আসিলেন। প্রথম দুইটি গান গীত হইল, প্রভু মৃদঙ্গ বাজাইলেন। তৃতীয় গান গাহিবার সময় প্রভু নিজেই করতাল লইয়া মধুর স্বরে গাহিলেন,—

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন ॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

গাহিতে গাহিতে আপন রসে আপনি বিভোর হইলেন।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেদার ও হরিদাস শ্রীঅঙ্গে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার সমূহ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

মধুর চন্দ্রপাত ঝঙ্কারে শ্রীঅঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। শুনিতে শুনিতে মহাভাবানন্দের মহাসমুদ্রে আনন্দঘন-বিগ্রহ বন্ধুধন নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

"চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে।" ইহা বন্ধুসুন্দরের জীবন। একদিন শ্রীকৃষ্ণদাসকে বলিয়াছিলেন,—

"তোরা যদি ছ'মাস আমায় খেতে না দিস্ তবু আমি মরবো না। কিন্তু জেনে রাখিস—কীর্ত্তন ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারব না। কীর্ত্তন আমার জীবন।"

"কাহ্ন, সব জুড়ায়ে গেল"

একদিন অত্যন্ত গরমের দিনে প্রভু তাপে ছটফট করিতে-ছিলেন। কেদার কাহ্ন পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসিলেন। প্রভু বলিলেন, "কাহ্ন—বাতাসে আমার কিছু হবে না—তুই করতাল জোড়া লইয়া একটি কীর্ত্তন শোনা।"

কেদার তখন পাখা রাখিয়া করতাল লইলেন ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

ডাকেরে করুণ স্বরে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম কে নিবি কে নিবি বলে
ডাকিতেছে উভরায়॥

এই গান গাহিলেন প্রাণ ভরিয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে। গান শেষ হইলে প্রভু বলিলেন—"কাহ্ন, সব জুড়ায়ে গেল।"

"কাহা ঠাকুর"

একদিন সকালবেলা কেদার কাহা শ্রীঅঙ্গনে আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। শ্রীশ্রীপ্রভু দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া নাচিতেছেন, আর শ্রীমুখে "কাহা ঠাকুর, কাহা ঠাকুর" বলিতেছেন। কাহা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

হঠাৎ বাতাসে শ্রীঅঙ্গ হইতে বস্ত্র উড়িয়া পড়ে। বক্ষস্থল উন্মুক্ত হইয়া যায়। কাহা দেখিলেন, প্রভুর বক্ষোপরে এক অগ্নিময় জ্যোতি ঝলমল করিতেছে। উহার মধ্যে পদ চিহ্ন। উহা ঘিরিয়া এক অভিনব মালিকা।

কাহা কিন্তু চাহিয়াই রহিলেন। মূর্চ্ছিত হইলেন না। জগদ্বন্ধুর ঐশ্বর্য্য কেদার কাহার প্রাণের প্রীতিকে শিথিল করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীপ্রভু মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া একটি গরদের কাপড় ও চাঁদর বাহির করিয়া, কাহার হাতে দেন ও পরিতে আদেশ করেন। কাহা ত কিছুতেই অত ভাল কাপড় পরিধান করিতে রাজী হন না।

প্রভু তখন উহা পরিধানের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন এমন ভাবে গরদের কাপড়খানা খুলিয়া হাতে ধরিলেন, যেন কেদার না পরিলে তিনি নিজেই পরাইয়া দিবেন। কাহা তখন নিজ হাতে বস্ত্র লইয়া পরিলেন।

অপর উত্তরীয়খানি তখন প্রভুবন্ধু কাহার কাঁধে দিয়া দিলেন। উহা গলায় ঝুলাইয়া দিয়াই প্রভু বন্ধুসুন্দর পূর্ব্ববৎ

নাচিতে লাগিলেন। এবার শ্রীমুখে কাহা ঠাকুরের বদলে "কাহা গোঁসাই" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

তৎপর শ্রীশ্রীপ্রভু কাহাকে বসাইয়া সন্দেশ খাইতে দিলেন। বলিলেন, "এগুলি সব আমার সাক্ষাতে বসিয়া খেতে হবে।" কাহা কিছুতেই রাজী হন না, "খেতেই হবে খেতেই হবে" প্রভু বারংবার বলিতে লাগিলেন।

কাহা নিরুপায় হইয়া একখানি সন্দেশ হইতে কিছু ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন। প্রভু দেখিয়া বলিলেন, "ও ভাবে নয়, গোসাঁই বামনদের মত খা। তারা কেমন করে খায় তা জানিস্ ? কাহা বলিলেন, "প্রভু, আমি কি আর অত কিছু খবর রাখি।" প্রভু বলিলেন, "একবারে ছুইটা করিয়া সন্দেশ মুখে ভরিয়া দিতে হয়। দেও, এখনি।" "দোহাই তোমার ওরূপ পার্‌বো না" বলিয়া কাহা চেঁচাইয়া উঠেন। "না পার তো ভেঙ্গেই খাও।" কাহা সাধ্যমত খাইলেন।

প্রভু তখন কাহা গোসাঁই, কাহা গোসাঁই বলিয়া কয়েকবার হাততালি দিয়া বলিলেন, "কাহা, আজ তোমায় ঠাকুর গোসাঁই উপাধি দিলাম।"

তখন প্রভু একখানি কাগজে লিখিয়া দেন,—

"ঠাকুর গোসাঁই !

কাহা, সকালে তিনবার পান্থা ভাত দিবা।
শেশে গড়ম ভাং দিভা চারীবার।
নিত্য দশ ডাঁব শত সভরী কলা দিবা।"

কাহা প্রথমে পানের ব্যবসায় করিতেন। শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন তাহাকে লিখিয়া দিলেন,—

কাহা, তামাকের ব্যবসা করিবা, নিত্য পাঁচসিকা পাইবা।
গুরুগিরি ব্যবসা করিবা, নিত্য চৌদ্দসিকা পাইবা।
বেনেতি ব্যবসা করিবা, নিত্য ছ'টাকা পাইবা।
কাটা কাপড়ের ব্যবসা করিবা, নিত্য দশটাকা পাইবা।

কাহা তামাকের ব্যবসাই বাছিয়া নিলেন। সত্যসত্যই প্রত্যেকদিন পাঁচসিকা আয় তাহার বাঁধাই ছিল।

কাহাকে খণ্ড খণ্ড কাগজে শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক কথা লিখিয়া দিতেন। সে সকল কথার অর্থ যিনি লিখিতেন, আর যাকে লিখিতেন তাহারাই বুঝিতেন। নিম্নে দুই একটি নমুনা দেওয়া গেল।

১। "কেদাড় বাবু দীর্ঘ কুলিণ হীন্দু ধীর
মান্ত জল শুদ্ধ সংস্কৃত বাঙ্গালী সহর বাড়ী
কৃষক বীধি বীচাড় বীর গূরূ পুরৎ
মহান হিৎ কালী।"

২। "ফরীদপুর শাখ বিল্লমল্লিকা
মহাছন্দন শাল গৃহ তেহ।
নলকুটী বীল বল মান ইকা
বছথা হলঠ ক্ষেত্র মাই বর্ষ এহ॥"

এক সময় কাহা প্রভুর সঙ্গে অভিমান করিয়া শ্রীঅঙ্গনে আসা বন্ধ করেন। অনেকদিন আসেন না। প্রভু একখানি লম্বা কাগজে লিখিয়া পাঠান,—

"বর্ষ মাস যুগ বহিয়া যায়।
কাহা, আঙ্গিনা বুঝিলানা নিজ ইচ্ছায়॥"

তাহাতেও কাহা না আসিলে আবার লিখিয়া পাঠান,—

আঙ্গিনা – ধর্ম্ম আঙ্গিনা – পবিত্র
আঙ্গিনা – শুচি আঙ্গিনা – নিষ্ঠা
আঙ্গিনা ছেড়ে গেলে বাঘে ধরবে
আঙ্গিনা ছাড়া হ'স নে।

এই পত্র পাইয়া কাহা অঙ্গনে আসেন। আসিলেই প্রভু তাহাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়া পোষ্টকার্ড ও খাম আনিতে বলেন। কাহা গিয়া পোষ্টাফিসে উহা চাহিলে পোষ্টমাষ্টার তাহাকে পাগল মনে করে। শেষে প্রভুর কথা বলিলে খাম পোষ্টকার্ড দিয়া দেয়। প্রভু তুই পাঁচদিনের মধ্যে সবগুলি লিখিয়া পোষ্ট করেন। বলিলেন, "আমি যে এসেছি তা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জানায়ে রাখ্‌লাম।" পত্রগুলির উপর পৃথিবীর নানা ভাষায় ঠিকানা লিখিয়াছিলেন।

বিধানী

বালকগণের মধ্যে বিধুরঞ্জন বিশ্বাস নামক একটি বালক ছিল। তাহার বাড়ী ছিল হাটকৃষ্ণপুর। কমলপুরের শ্যামাচরণ ঘোষের বাড়ী থাকিয়া সে ঈশান স্কুলে পড়িত। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রভুর কৃপাস্পর্শ লাভ করে। তখন সে ক্লাস সেভেন্-এর ছাত্র।

বাল্যে তাহার স্বভাব ছিল অতীব নির্ম্মল। হৃদয়ে অনুরাগ ছিল, বন্ধুসুন্দরের অনেক উপদেশ সে পেয়েছে, বন্ধুসুন্দর আদর করিয়া তাহাকে বিধানী বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তাহাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "বিধানী, তোর চন্দ্রিকায় যেন পথ দেখতে পাই।" ভক্তের চন্দ্রিকায় ভগবান পথ দেখিতে চাহিতেছেন, কী মধুর আদরমাখা কথা।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধানীর বিষয়তৃষ্ণা দেখা দেয়। যোষিৎ সঙ্গে উন্মার্গগামী হয়। বন্ধুসুন্দর তাহাকে লিখিয়া দেন সতর্কবাণী—"বিধানী, তুমি গৃহী হইও না। গৃহস্থ সংশ্রবে তোমার মৃত্যু সত্য জেন। যোষিৎ মায়া মনসিজ ত্যাগ কর। হরিনাম নিষ্ঠা কর। তোমার কাকচরিত বন্ধু ইতি।"

বিষয় বাসনা যখন প্রবল ভাবে জাগে, উপদেশ তখন স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যেমন দুর্য্যোধনের কাছে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, আজ বন্ধুচন্দ্রের উপদেশ সেইরূপ বিধানীর কাছে ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। বিধুরঞ্জন দ্রুতগতিতে উৎপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুঁদিন পর প্রভু বন্ধুহরি বিধানীর সঙ্গী একটি বালক-ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিধার আর মাত্র তিনমাস আয়ু আছে। তোরা সব সময় ওর কাছে থেকে হরিনাম করিস। তবে তা পারবি না। কলিতে ঘিরে ফেলেছে। ওর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তোরা মৃত্যুর লক্ষণ বুঝতে পারবি। দেখবি, তোদের কাছে ঘিষতে চাইবে না। হরিনাম করবে না, আমার কাছেও আসবে না। তখনই বুঝবি, মরবে।"

প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। প্রভুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেরা রোগে বিধানীর দেহ পতন হইল। বালকভক্তগণ সকলেই মুহ্যমান হইল। ভক্ত-বিরহে বন্ধুসুন্দরের শান্ত সমুদ্রেও বেদনার তরঙ্গ উঠিল। আবরণে রাখিতে চাহিলেও প্রিয়-জনদের চোখে তাহা অস্পষ্ট থাকিল না।

"আমায় দেখে মনে পড়েছে"

প্রায় দুইবৎসর পর একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনের আশেপাশে পদচারণ করিতেছেন। শ্রীঅঙ্গনের আশেপাশে তখন বিস্তর জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের কিনার দিয়া প্রভু বেড়াইতেছেন, রাঙ্গা চরণে রবারের পাদুকা শোভা পাইতেছে।

হঠাৎ একটা শূকর দেখা দিল, অনেকগুলি বাচ্চা সঙ্গে। শূকরটি প্রভু বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ সন্নিধানে আসিয়া মাটিতে

পড়িয়া গড়াগড়ি করিতে লাগিল। প্রায় তিন মিনিট কাল ঐরূপ করিয়া শূকর সন্তানগণ সহ চলিয়া গেল। ভক্তগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। রহস্য জানিতে ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহ, লক্ষ্য করিয়া প্রভু বন্ধুহরি কহিলেন,—

"বিধানী মরে শূকর হয়েছে। কিন্তু জাতিস্মর হয়েছে। আমাকে দেখে মনে পড়েছে। তাই ধূলায় লুটায়ে প্রণামভক্তি জানায়ে গেল। ও শীঘ্রই আবার আসছে। ভোগান্তেই ভক্ত হয়ে আসবে।"

এমন অনুরাগী ভক্ত দেহান্তে শূকরত্ব পাইয়াছে, ইহা লইয়া ভক্তদের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিল। বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিশেষ কিছু নাই। বৈকুণ্ঠের জয় বিজয় রাক্ষস-স্বভাব রাবণ কুম্ভকর্ণ হইয়াছিল। স্বর্গের কুবেরের পুত্রদ্বয় যমলার্জ্জুনরূপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভরতের মত ঋষি হরিণত্ব লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রে এ জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

যাঁরা ভগবানের লীলার সঙ্গী, তাহাদের উর্দ্ধ অধোগতি লীলাশক্তির ইচ্ছায় ঘটে। বিধানীর যেরূপ তীব্র ভোগলালসা দেখা দিয়াছিল, তাহা চরিতার্থ করিতে মানবদেহ হইলে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর লাগিত। আবার সেই সময় নূতন কর্ম্মও হইত। আর শূকর দেহ হওয়ায় ঐ ভোগ চরিতার্থতা দুইবৎসরেই হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় নূতন কর্ম্মও হয় নাই। সুতরাং তাহাকে মানুষ না করিয়া পশু করার মধ্যেও একটা করুণার প্রকাশ আছে। শ্রীহরির সমস্ত কার্য্যই করুণা-প্রণোদিত। আমরা ক্ষুদ্রজীব তাহা না বুঝিতে পারিয়া ব্যর্থ জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকি।

"খুঁটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর"

বালক ভক্তগণকে দিয়া প্রভু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেন। "প্রকৃতি দর্শন স্পর্শনে পতন, প্রকৃতির মুখ দেখবে না" এইরূপ আদেশবাণী বালকদের প্রত্যেককে পালন করিতে হইত।

একদিন একটি বালকভক্ত ফরিদপুর সহর হইতে একাকী শ্রীঅঙ্গনের দিকে আসিতেছে। তাহার সম্মুখে পড়িল একটি রূপ-যৌবন-সম্পন্না বারবণিতা। তাহার রূপ ও বেশভূষা দুই-ই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বালক-ভক্তেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বালক কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। মনের মধ্যে বিবেকের দংশন আসিলেও চক্ষু আরও দেখিতে চাহিল। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া ভক্তবালক মন হইতে ঐ ভাবনা দূর করিয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিল।

বালককে দেখা মাত্রই বন্ধুসুন্দর ভর্ৎসনাপূর্ণ মিষ্টিভাষায় বলিতে লাগিলেন—"বাবুজী, ও বাবুজী, অমন করে ফ্যল ফ্যল করে তাকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নেই। মোহ সব ভুলায়ে দেয়। পাপ—যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ। কারো মুখের দিকে চাইবে না। মা বোনের মুখের দিকে চাইতেও নিষেধ আছে। ছিঃ তোমরা চাইবে কেন? আর কদাও অমন করো না। খুঁটি (শ্রীমন্দিরের) ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর। দৃষ্টিপুত পথ। মনঃপুত বৈরাগ্য। মনে রাখিও।"

বালকটি শ্রীমন্দিরের খুঁটি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর কদাপি অমন করিবে না। প্রভুর অন্তর্য্যামিত্ব দেখিয়া ভক্তগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত ও সতর্ক থাকিত।

ভক্তবর মথুরানাথ

মথুর মানসপদ্ম রক্ত-রবি বন্ধু।

জয়নিতাইর আগমনে টেপাখোলা হরিনামের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, এই কাহিনী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় জয়নিতাইর কৃপা-স্পর্শে ভক্তবর মথুরানাথ কর্ম্মকার শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার জন্য নানা দ্রব্য দিয়া যাইতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু মথুরানাথের সেবা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহাকে এ পর্য্যন্ত দর্শন দেন নাই বা কোন আজ্ঞা করেন নাই। মথুরানাথের প্রাণে ঐজন্য বিশেষ বেদনা আছে। আজ শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া দেখেন প্রভু অঙ্গনে কোথাও নাই। কাহারও মুখে শুনিলেন, প্রভু পার্শ্ববর্ত্তী রামকুমার মুদী মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন।

মথুরানাথ মুদী মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। প্রভু একটি ঘরের মধ্যে আছেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া মথুরানাথ বলিলেন, "প্রভু, সেবার জন্য কিছু ফল এনেছি।"

মথুরানাথের সাড়া পাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু দরজা দিয়া শ্রীবদনমণ্ডল একটু বাহির করিয়া কমণীয় কণ্ঠে কহিলেন, "মথুর এসেছ, এস"। মথুরানাথের সঙ্গে প্রভুবন্ধুর এই প্রথম বাক্যালাপ। একটি আলাপেই মনপ্রাণ চুরি। এমন মধুর সম্ভাষণ মথুর বুঝি আর জীবনে শোনে নাই। মথুরানাথ চির আঁপনজনকে চিনিয়া লইলেন একটি ডাকের মধ্যেই।

প্রভু মথুরানাথকে গৃহের মধ্যে আসিতে অনুমতি করিলেন, ভক্তবর অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "মথুর, তুমি হাত দেখতে জান ?" মথুরানাথ ধীর বিনীতভাবে বলিলেন, "না প্রভু, আমি ওসব কিছু জানি না।" প্রভু নিজের শ্রীদেহের দিকে একটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, এর ভিতরে আর কিছুই নেই।"

মথুরানাথ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্ত না ধরিয়া শ্রীচরণে নিজ হস্ত দিলেন। সুস্নিগ্ধ স্পর্শে মথুরানাথের সর্ব্বাঙ্গ মধুময় হইয়া গেল। ভক্তবর তখন করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "প্রভো, এ দীনের গৃহে একটিবার শ্রীচরণধূলি দিতে যাবেন ?" মথুরের বলা শেষ হইতে না হইতে শ্রীমুখ হইতে "হাঁ যাবো" উত্তর আসিল। মথুরানাথ শ্রীশ্রীপ্রভুকে লইয়া টেপাখোলা গ্রামে আসিলেন।

টেপাখোলায় কৃপার ধারা

টেপাখোলা গ্রামখানি ফরিদপুর সহরতলিতে, উত্তর প্রান্তে পদ্মারতটে অবস্থিত। বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও বহু সজ্জন কর্তৃক অধ্যুষিত। জয়নিতাই পদার্পণের পর হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যোগমায়া যেমন লীলাক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, জয়নিতাইও সেইরূপ বন্ধুসুন্দরের আগমনের ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুসুন্দরের শুভ আগমনে টেপাখোলা গ্রামখানি উৎসব-মুখর হইয়া উঠিল। দলে দলে নরনারী আসিয়া বন্ধুসুন্দরের

দর্শন লাভে ধন্য হইতে লাগিলেন। রাস্তার পুলের নিকটবর্ত্তী একটি মুক্তস্থানে শ্রীশ্রীপ্রভু আসন করিলেন। বঙ্কুবিহারী নাগ মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন। ইনি বাকচরে শিক্ষকতা কালে শ্রীচরণদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্ত রেবতী গুহ আসিলেন। অল্পবয়স্ক ভক্ত বালকেরাও যোগ দিলেন।

গ্রামের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া দীনুবিশ্বাস আসিয়া প্রভুর রচিত গান ধরিলেন,—

এস এস নবদ্বীপ রায়,
দীনজন ডাকছে হে তোমায়।

পঞ্চানন সরকার মহাশয় মৃদঙ্গ বাজাইলেন। বন্ধু আগমনে গান বাদ্য যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। ঐ গানের পর আবার গান হইল,—

নিতাই নিতাই বল অনিবার,
যদি তরবি ভবপারাবার।

কীর্ত্তনের তুমুল উল্লাসে গ্রামবাসী নরনারী মত্ত হইয়া উঠিল। নবগৌরের আগমনে টেপাখোলা গ্রামের নবীন শ্রী ফুটিয়া উঠিল।

কীর্ত্তন যখন তুমুল রোলে চলিতেছে, তখন প্রবল বৃষ্টির লক্ষণ দেখা গেল। সকলেই চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঝড় বৃষ্টি ভীষণভাবে আরম্ভ হইয়া চারিদিক দিয়া হইয়া গেল, কীর্ত্তন-ক্ষেত্রে এক বিন্দুও বারিপাত হইল না। কেবল ভক্তবৃন্দের অশ্রু ও ঘর্ম্মপাতে কীর্ত্তনস্থলী সিক্ত হইয়া রহিল।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীপ্রভু মথুরানাথকে বলিলেন, "মথুর, ডাক্তার আছে ?" মথুরানাথ বলিলেন, "প্রভু, আনন্দ দাস নামক একজন ডাক্তার আছেন, তবে তত ভাল নয়।" প্রভু কহিলেন, "তাকে ল'য়ে এস।"

ডাক্তার আনন্দ দাস বাতব্যাধিগ্রস্ত ও খঞ্জ। প্রভু বন্ধু-সুন্দরের দর্শন আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে প্রবল ছিল। কয়েক দিন পূর্বে তিনি মথুরানাথের নিকট নিজ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশও করিয়াছিলেন। আজ প্রভু এত নিকটে আসিয়াছেন, তবু আনন্দ দাস মহাশয়ের আসিবার সামর্থ্য হইতেছে না। তিনি গৃহে বসিয়া হা প্রভু হা প্রভু, করিতেছেন। অন্তর্য্যামী তাহার বেদনা জানিয়া ডাক্তার আনিবার ছল করিয়া তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।

প্রভু ডাকিয়াছেন শুনিয়াই ডাক্তার আনন্দ দাসের দেহে শতগুণ শক্তি বাড়িয়া গেল। অপটুদেহেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে লইয়া আসিলেন। আনন্দময়ের দর্শনে আনন্দ দাস আনন্দে অধীর হইয়া কিছু আর বলিতে পারিলেন না। কেবল নয়ন ভরিয়া মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। চোখের জল মুছিতে মুছিতে ডাক্তারের হাতের রুমালখানি একেবারে সিক্ত হইয়া গেল।

হারাণ কর্ম্মকার নামীয় একজন ফলমূলাহারী ব্যক্তি ঐ গ্রামে বাস করিতেন। তিনি সব সময় মালা হাতে করিয়া জপ করিতেন। অঙ্গে তিলক ফোটা করিতেন। সকলে তাহাকে

পরম সাধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। হারাণ আসিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য। মথুরানাথ হারাণকে দর্শন দিবার জন্য বন্ধুসুন্দরকে তিন চারবার অনুনয় করিলেন। প্রত্যেকবারই প্রভু গম্ভীর। উত্তর দিলেন,—"হবে না।"

গ্রামের লোকচক্ষে দুষ্টা-প্রকৃতি এক ভ্রষ্টা নারী প্রভুর সেবার জন্য কিছু ফল মিষ্টাদি দ্রব্য লইয়া আসিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, তাহার দ্রব্য প্রভু ছুঁইবেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার দেওয়া সামগ্রী-সকল বন্ধুসুন্দর পরম যত্নে গ্রহণ করিলেন। ভাবগ্রাহী বন্ধুহরি মানুষের অন্তরের ভাব-রাজ্যের সংবাদ জানেন। তাহা জানিয়াই তদনুরূপ ব্যবহার করেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুদ্র জীবের তাহা লইয়া বিচারের চেষ্টা বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

"বেদ বিধির অগোচর
এসব বুঝা বিষম ভারি।"

একদিন একরাত্র প্রভুবন্ধু টেপাখোলায় অবস্থান করিলেন, তৎপর প্রিয় কেদার কাহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। কাহা আসিলে স্বেচ্ছায় তাহার সঙ্গে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে চলিয়া আসিলেন। রাখিয়া গেলেন যে কৃপায় ধারা, তাহা চলিতে লাগিল অব্যাহত গতিতে।

"ও মে'টে শালগ্রাম"

একদিন মথুরানাথের ইচ্ছা হইল গৃহে একটি শালগ্রাম স্থাপন করিয়া সেবার্চ্চনা করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট গিয়া অনুমতি চাহিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন "ও মে'টে শালগ্রাম।" মথুরানাথ মনে করিলেন, প্রভু বোধহয় কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। তাই পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া বলিলেন—"না প্রভু, যে শালগ্রাম ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন, সেই শালগ্রাম।" প্রভু আবারও উত্তর করিলেন, "ও মেটে শালগ্রাম, রাখতে নেই।"

মথুরানাথ অগত্যা শালগ্রাম স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। পরে জানিতে পারিলেন, যে-লোকটি শালগ্রাম দিতে চাহিয়াছিল, সে চালাকী করিয়া মাটির ডেলা রং করিয়া শালগ্রাম বলিয়া বিক্রয় করিত। সে অনেক লোককে ঐরূপ ঠকাইয়াছে।

মথুরানাথের সহধর্ম্মিণীও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল ক্রমশঃই বর্দ্ধমান। একদিন সেবার জন্য ক্ষীরের ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া একখানা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া মথুর-গৃহিণী মথুরানাথের হাতে দিয়া প্রভুর নিকট শ্রীঅঙ্গনে পাঠাইলেন। প্রভু ক্ষীরের ছাঁচগুলি সমস্তই গ্রহণ করিলেন।

ছাঁচ গ্রহণ করিয়া কৌতুকী বন্ধুহরি পোটলা বাঁধা ন্যাকড়া-খানিতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। প্রভু নিজে ধরাইয়াছেন দেখিয়া মথুরানাথ প্রথমে উহা নিভাইতে চেষ্টা করিলেন না। শেষে মনে হইল, প্রভুর শয্যায় আগুন

লাগিয়া যাইতে পারে। এই ভয়ে ন্যাকড়া পুড়িতে যখন অল্প বাকী আছে তখন উহা নিভাইয়া দিলেন। নিভাইতে নিভাইতে তাহার মনে হইল, প্রভু যেন বলিতেছেন—"আজ তোর সমস্ত পাপ অপরাধ পোড়াইয়া আমি তোকে খাটি সোনা করিতে-ছিলাম,—তোর দোষে সামান্য একটু রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন মথুরানাথকে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

১। ধর্ম্ম বিশেষ কিছু নয়।

২। প্রভুর বারটি নাম উচ্চারণ করিবে।

হরি	ঈ	ি ই
মহাউদ্ধারণ	আ	ঊ
পুরুষ	ঊা	উ
জগদ্বন্ধু	ঈী	অ

———

ভক্ত কুঞ্জবিহারী

বঙ্কুবিহারী নাগ মহাশয়ের অনুজ কুঞ্জবিহারী নাগ। অগ্রজের মুখে, পরে মথুরানাথের মুখে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর কথা শুনিয়া কুঞ্জবিহারী আকৃষ্ট হন। যেদিন শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে প্রথম-দর্শন দেন, সেইদিনই তাহাকে একখানি মৃদঙ্গ ও একজোড়া করতাল দান করেন।

কুঞ্জবিহারীর কীর্ত্তনে যোগ্যতা ও অনুরাগ দেখিয়া কৃষ্ণদাস একখানি শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত সংকীর্ত্তন গ্রন্থ তাহাকে দেন। এই গ্রন্থ তখন সবে মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতার ভক্তবর বিপিন বাবু মহাশয় উহা ছাপাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থ ও খোল করতাল পাইয়া কুঞ্জবিহারী আনন্দে অধীর হইয়া টেপাখোলা আসেন ও সঙ্গীদের লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। দাদা বঙ্কু নাগ গান ধরিতেন, কুঞ্জবিহারী মৃদঙ্গ বাজাইতেন। সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন চলিতেই থাকিত। খোল করতালের রোলে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। কুঞ্জবিহারীর সমবয়স্ক ও অল্পবয়স্ক অনেক যুবক বালক আসিয়া কীর্ত্তনের দলে যোগ দিলেন। নিত্যগোপাল, অবিনাশ, যতীশ, রেবতী, অনাদি, যাদবচন্দ্র প্রমুখ স্কুলের ছাত্রগণ কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিলেন। বয়োবৃদ্ধগণ বালকদের এই কীর্ত্তনোদ্যমে পরমানন্দে উৎসাহদান করিলেন। মোহান্ত সম্প্রদায়, বাকচরের দল, ব্রাহ্মণকাঁদার দল, বদরপুরের দল যেমন প্রভুবন্ধুর বিশিষ্ট কীর্ত্তন সম্প্রদায়, টেপা-খোলায়ও সেইরূপ একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তনের দল জাগিয়া উঠিল।

সেবাইত হররায়

কলিকাতার চাষাধোপাপাড়ার জুয়েলার হররায়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম কৃপালাভে তিনি একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। এক সময় প্রভূত অর্থশালী ও বিলাসী ছিলেন বটে কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে প্রভুর কৃপায় ত্যাগ বৈরাগ্য ও সংযমতা অভ্যাস করতঃ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু গোয়ালচামটে শ্রীঅঙ্গন নির্ম্মাণ করিলে হররায় আসিয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবায় ব্রতী হন (১৩০৬, ফাল্গুন) কৃষ্ণদাস, নবদ্বীপ দাস, চম্পটী মহাশয় সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন। হররায় আনন্দে প্রভুর সেবা করিতেন। তাহার প্রেম-সেবায় বন্ধুহরি পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। শ্রীঅঙ্গনে হররায় প্রভুর জন্য যাহা রান্না করিতেন, তা' ছাড়া ঐ সময় অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণও গৃহ হইতে ভোগের দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া আনিতেন। প্রভু কৃপা করিয়া গ্রহণ করিতেন। প্রভুর ইঙ্গিতে সহরের বালক ভক্তগণ মাঝে মাঝে একঢালা ভোগ আনিয়া দিতেন। চাউল ডাইল তরকারী সব মিলাইয়া মালসায় করিয়া এক পাকে যাহা রান্না হইত তাহাই ছিল একঢালা ভোগ। বিশেষ আদরে প্রভু তাহা গ্রহণ করিতেন। কৃপাময়ের কৃপার সীমা নাই।

"বন্ধু মানুষ নয়"

প্রভুবন্ধুর কতিপয় অনুগত জন যখন প্রবৃত্তিমার্গে ভোগের পথে তান্ত্রিক গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিল, তখন বন্ধুহরি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে নিজ পার্শ্বে রাখিবার জন্য একটি পত্র দিয়া জানাইলেন,—

শ্রীমতি

শ্রীশ্রীবাবুগণ!

তোমরা কীর্ত্তন ভিন্ন কোনও ব্রত বা নিয়ম করিও না। চিরদিনই টহল ও নগর কীর্ত্তন সর্ব্বদাই করিও। ইতি—

প্রভু জগদ্বন্ধু

কীর্ত্তন ভিন্ন সবই মিথ্যা। —বন্ধুপ্রভু

বন্ধু মানুয নয়, অবতার, সুতরাং গুরু। তিনি পুং এবং ব্রহ্ম। —জগদ্বন্ধু।

কেহও দীক্ষা লইও না। দীক্ষা তান্ত্রিকতামাত্র॥ মহাকৈতব॥ রক্ত জলকরা অভ্যাস ছাড়িও। কারণ আয়ু ও বংশ যায়। তিতা খাইও। তৈল মর্দ্দন করিও। অতিভোজন করিও না। স্নান একবার মাত্র। নিঃসঙ্গ রহিও।

তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র, গুপ্ত নহে। ইহা সর্ব্বতঃ প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে হরিনাম প্রচার কর। হরিনাম সর্ব্বত্র করাও। ইষ্ট ও পরিণাম রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর এই ভিক্ষা। নিষ্ঠা ছড়াও। আমায় মুক্ত কর।

নিষ্ঠা ও উদারতা

কতিপয় বালকভক্ত ফরিদপুরে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরের বেদীর নিকট যাইয়া সমাজের উপাসনার বিষয় লইয়া সমালোচনা করিয়াছিল। সেই সব বালক শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট আসিতেই তিনি বলিলেন,—

"ছিঃ তোমরা সমাজে, চার্চ্চে, মসজিদে যেয়ে অমন করে নিন্দা করো না। নিন্দা মহাপাপ। নিন্দায় জীবকে ভ্রান্তিতে ফেলে। তোমরা কেন নিন্দা করবে। আর অমন করো না। নিত্যানন্দের স্বরূপ দেখে সবকে সম্মান দেবে। সমাজে, (ব্রাহ্ম সমাজে) চার্চ্চে, মসজিদে যাইও, কিন্তু সতীর পতির মত লক্ষ্য যেন স্থির থাকে।"

অন্য একদিন বালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

যেখানে সেখানে যাসনে, ওতে চিত্ত মলিন হয়। কেউ ভাব অবস্থা বুঝে কথা বলে না। তাই শান্তি হয় না। লক্ষ্য ছেড়ে ঘুরে মরে।" কোনও এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া একদিন বালকগণ তাহার (সন্ন্যাসীর) ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে বন্ধুসুন্দর বলিয়াছিলেন—"তোরা আর কদাও কোথাও যাস্‌নে। একালে, ওকালে, ত্রিকালে এই ফকীরের কাছেই থাকিস্, পরিণাম রবে।"

"নিরভিমান হ'য়ো"

বালক ভক্তগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ফরিদপুর আলিপুরে বাস করিত। সে একটু বয়স্ক ছিল। বয়স আঠার-কুড়ি হইবে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিল। ফরিদপুরে একজন বিশিষ্ট কবিরাজের কাছে সে কবিরাজী পড়িত।

সুরেন বেশ মেধাবী ছিল। কিন্তু নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে সে সজাগ ছিল। ব্যাকরণে তার বেশ ব্যুৎপত্তি আছে, এই হেতু মনের কোণে তার অহঙ্কার ছিল।

একদিন কোনও কথাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া প্রভুবন্ধুর সঙ্গে তাহার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। অল্পসময় আলোচনাতেই সুরেন বুঝিতে পারিল যে, কলাপ মুগ্ধবোধ এমন কি মাহেশ নামক ব্যাকরণার্ণবেও বন্ধুসুন্দরের গভীর প্রবেশ আছে। প্রভুর সঙ্গে অল্প আলোচনাতেই সুরেন তাহার নিজ জ্ঞানের অল্পতা অনুভব করিতে পারিল। প্রভু এত জানেন দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু সুরেনকে লিখিয়া দিলেন,—

"আত্মবধ করো
নিরভিমান হ'য়ো"

সুরেনের 'আত্ম' অর্থাৎ অহঙ্কার যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কৃপাময় নিজেই তাহা বধ করিয়া দিলেন। সুরেন সব যায়গায় মাথা নীচু করিত না। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে বলিলেন—"সবকেই প্রণাম করো।"

নববর্ষের উপদেশ

"সদাকাল আমার কথা অনুশীলন করো"

বাংলা ১৩০৭ সনের বৈশাখ মাস। বালকগণ নববর্ষে প্রাণপ্রিয়তম বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবন্ধু তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—

আমি যাহা বলি, তাহা মন দিয়া শুনো। আমি যাহা লিখি, তাহা মন দিয়া পড়ো। চিঠির মত পড়ো না, মুখস্থ করে রেখো। সদাকাল আমার কথা অনুশীলন করো। আমি যাহা বলি, তাহা নিত্য চিরকাল মনে রেখো। আমি যাহা বলি, তাহা চিন্তা করো। আমি যাহা বলি, তাহা বিচার করো। আমি যাহা বলি, তাহা নিত্য চিরকাল প্রচার করো। আমায় সদাকাল দেখে চলো।

"হরিনাম নিষ্ঠা পবিত্রতায় বুকে বল বাঁধ। তবেই তোমাদের মঙ্গল হবে। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা। আমার কাজ বহুকালব্যাপী ধরাধামে থাকবে। চিন্তা কি? তোমরাই আমার নিত্য সত্য অভিভাবক। তোমরা হরিনাম করে আমায় পালন কর। এই আমার শপথ।"

"একালে, ওকালে, ত্রিকালে, নিত্য চিরদিন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে আমার কথা বলে বেড়াবি। আমার উপদেশ, আমার রচনা, আমার কথা প্রচার করবি। আমি তো ঝুটা মাল নই যে বলতে ভয় করবি? মেটে হাঁড়িও লোকে বাজায়ে কিনে। আমায় বাজাতে ছাড়বে কেন? পৃথিবীর সকলকে বল।

মহামহা জ্যোতিষী দ্বারা আমার বিষয় গণনা করায়ে দেখে সত্য হলে যেন গ্রহণ করে, নৈলে দূরে পরিহার করে।"

আজ শ্রীমুখে এইসব তথ্যপূর্ণ বাণী শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে।

আত্মনিবেদন

"শ্রীকৃষ্ণ ত সবই জানেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করিবার আবার দরকার কি?" কোনও বালকের এই প্রশ্নে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ সব জানলেও নিজমুখে সব বলতে হয়। প্রার্থনা ও নিবেদন করতে হয়। তাঁকে না জানালে, তাঁর কাছে না গেলে তিনি কিছুই করতে পারেন না। অচলের মত পড়ে থাকেন, আর দেখেন।"

"তোমরা সরল মনে নিষ্ঠার সহিত হরিনাম কর। পবিত্রতার মধ্যে যাও। তোমাদের সরল ভজন দেখলে, আমার উদ্ধারণ ব্রত শেষ হয়। যখন যা হয়, তখনই আমায় বলে ছাপ হয়ে যেও। ত্যাগই সুখ। বৈরাগ্যই ভাগ্য।"

গোপন মাধুর্য্য

বালকগণ প্রভুর নিকটে আসিলে, অবিভাবকগণ শাসন করিতেন, এই ভয়ে অনেক সময় তাহারা আসিতেই পারিতেন না। অনেক সময় আত্মগোপন করিয়া আসিতে হইত। সেই সময় শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা চিন্তা করো না। ভয় কি? মাইর খাইও। মারিও না। যাদের মনপ্রাণ প্রভুতে সমর্পিত, তাদের অনেক সইতে হয়। আমার জন্য কত সইতে হবে।"

"আত্মগোপনেই প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ পায়। গোপনই মাধুর্য্য। যারা প্রভুকে ভালবাসে তাদের কিছুতেই ছুঁতে পারে না। কাল, কলি, প্রাক্তন দূরে সরে থাকে। মানুষের সাধ্য কি তোদের কেশাগ্র স্পর্শ করে। তোমরা সদা আত্ম-গোপন করে প্রভুর দিকে চলো। পাপপুণ্যে স্পর্শ করবে না।"

তৎপর লিখিলেন, বৈষ্ণব কবির পদ,—

যাইতে উত্তরে, বলিবি দক্ষিণে,
দাঁড়ায়ে পূরব মুখে।
গোপনের প্রেম, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি পরম সুখে॥
হেসিলি হইবি, রন্ধন করিবি,
না ছুবি ভাতের লেশ।
সাগরে নামিবি, সিনান করিবি,
না ভিজিবে মাথার কেশ॥

"ভাই, তোমরা এইরূপ কার্য্য করিয়া আত্মগোপন করিও। ইষ্ট ও পরিণাম রক্ষা পাবে। চিরজীবন ইহা পালন করিও।"

জগদ্বন্ধু

শ্রীগৌরকিশোর সাহা

গৌরকিশোর সাহা

"মহা অন্ন এনেছ"

শ্রীশ্রীপ্রভুর অঙ্গনটি গোয়ালচামট গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বদিক পূর্ব্বপাড়া ও পশ্চিমদিক পশ্চিমপাড়া। শ্রীঅঙ্গনের ঠিক পশ্চিমদিকেই বন্ধুকুণ্ড বিদ্যমান। শ্রীকুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে গোয়ালচামট পশ্চিমপাড়া আরম্ভ। ঐ পাড়ায় বাস করিতেন সরল ভক্ত শ্রীগৌরকিশোর সাহা।

গৌরকিশোরকে শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন বলিলেন, "গৌরকিশোর, নিতাই গৌর ভজন কর। কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ কর।" গৌরকিশোর বলিলেন—"প্রভু, আমি ত বাজারে চাউল ডাইলের দোকানদারী করি। কত মিথ্যা কথা বলিতে হয়। গলায় তুলসী কণ্ঠী দিতে ভয় হয়।"

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "তুমি দোকানের গদীতে বসিয়া দোকানের প্রয়োজনে যা বলিতে হয় বলিও—কিন্তু দোকান হইতে বাহির হইয়া আর মিথ্যা বলিও না, এই সংকল্প কর।" গৌরকিশোর তাহাই সংকল্প করিয়া প্রভুর হাতের দেওয়া তুলসী কণ্ঠী গলায় পরিলেন। ঐ সংকল্পের ফলে মিথ্যাচরণ ও ভাষণ গৌরকিশোরের জীবন হইতে একেবারেই চলিয়া গেল।

গৌরকিশোরের ইচ্ছা প্রভুকে সেবা দিবেন। ঘরের জননীদেরও ইচ্ছা। তাহারা পরম যত্নে ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, খৈয়ের মোয়া, তিলের তক্‌থি, চিড়ার মোয়া, ছাতুর মোয়া ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী করিল। গৌরকিশোর ভয়ে ভয়ে আনিয়া প্রভুকে দিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু পরম আদরে উহা গ্রহণ করিলেন।

গৌরকিশোরের প্রাণে সাহস বাড়িল। ঘনঘনই সেবার দ্রব্য আনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগিত অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দেই। আবার ভাবিতেন, প্রভু ব্রাহ্মণ, আমরা বৈশ্য সাহা। আমাদের হাতের অন্নব্যঞ্জন প্রভু হয়ত খাবেন না। কিন্তু প্রাণ কিছুতেই মানিতে চাহিল না।

মনে করিলেন একদিন চিনিগুড়া আতপ তণ্ডুল রান্না করিয়া লইয়া যাইব। প্রভু ত জগদ্বন্ধু—তিনি নিশ্চয়ই সাহা বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিবেন না। অনেকদিন ভাবিয়া একদিন মনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া অতি পবিত্রভাবে ও প্রাণের প্রবল আর্ত্তি লইয়া নিজ হাতে রান্না বসাইলেন। একটি নূতন হাঁড়িতে অন্ন বসাইয়া তাহাতে বেগুন কুমড়া ও আলুসিদ্ধ দিয়া গব্য ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতি সন্তর্পণে সভয়ে ভোগ লইয়া শ্রীমন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—মৃদুভাবে "প্রভু, সেবার দ্রব্য এনেছি গ্রহণ করুন" বলিতে লাগিলেন।

গৌরকিশোরের বুক কাঁপিতেছে। একবারের পর আর একবার বলিলেন। প্রভু বিদ্যুতের মত ছুটিয়া দরজা খুলিলেন। হাসিভরা মুখে ব্যস্ত-সমস্তভাবে নিজের শ্রীহস্ত বাড়াইয়া বলিলেন—"গৌরকিশোর, আজ মহা অন্ন এনেছ! আজ মহা অন্ন এনেছ !!"

যতখানি আর্ত্তি লইয়া ভক্ত সেবারদ্রব্য তৈয়ারী করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর ব্যগ্রতা লইয়া ভগবান তাহা গ্রহণ করিতে আসিলেন।

গৌরকিশোরের দুই নয়নে ধারা গলিল। ভোগের পাত্র প্রভুর গৃহমধ্যে নামাইয়া দিয়া গৌরকিশোর বাহিরে দাঁড়াইয়া নিজের উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভোগ গ্রহণ হইয়া গেল। গৌরকিশোর দেখিলেন থালায় কণিকা প্রসাদও অবশেষ নাই। থালাখানি মাথায় লইয়া কৃপার প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে গৌরকিশোর গৃহে আসিলেন। একখানি প্রভুর গানের পদ শত সহস্রবার গৌরকিশোরের প্রাণে ও রসনায় তোলপাড় করিতে লাগিল। চলিতে ফিরিতে বলিতে লাগিলেন—"এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।"

মুক্তাদাসী

গৌরকিশোরের অগ্রজা মুক্তাদাসী বাল-বিধবা। হৃদয়-খানি ভক্তিমাখা। গৌরকিশোর যে সব সেবার দ্রব্য প্রভুর ভোগ দিতেন, তাহার অধিকাংশই মুক্তাদাসীর প্রেমভক্তিমাখা নিপুণ হস্তের তৈয়ারী। তাহার বুকের বাৎসল্য স্নেহধারা একটি গোপাল খুঁজিয়া বেড়াইত। বন্ধুগোপালকে পাইয়া সে ধারা চিরতৃপ্তি লাভ করিল।

শরৎকাল। দশভুজার দশহস্তের আশিস গ্রহণ করিয়া নরনারী আজ দশহরার বিজয় উৎসবে মত্ত। ফরিদপুরের দশহরার আড়ং বিখ্যাত। দলে দলে বালকবৃদ্ধ পুরুষনারী

দশহরার মেলায় চলিয়াছে। মুক্তাদাসীও আড়ং দেখিতে যাইতেছে। যাইবার পথে প্রভুর অঙ্গনে আসিয়াছে।

রসলোলুপ বন্ধুসুন্দর মুক্তার বাৎসল্য রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মুক্তা আসিয়া বন্ধুসুন্দরের সম্মুখে উপনীত হইল। কর্ণরসায়ণ কণ্ঠ-মাধুর্য্য ছড়াইয়া বন্ধুসুন্দর মুক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কোথা যাস্ দিদি ?"

মুক্তা বলিল, "দশহরার আড়ং দেখতে যাই।" পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মত বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "আমার জন্য কি আনবি ?" বন্ধুসুন্দরের ভাব ভাষা ও ভঙ্গিতে মুক্তার ক্ষুধিত বাৎসল্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মুখে বলিল, "তুমিই বল তোমার জন্য কি আনব। সাজ বাতাসা, বিন্নিখৈ যা বল তাই আনব।"

শিশুমণি বামাছুলাল কহিলেন, "না ওসব নয়, আমার জন্য পুতুল আনবি, ঘোড়া আনবি, শোলার খাঁচা আনবি। পুতুল নিয়া খেলব, ঘোড়ায় চড়ব, আর শোলার খাঁচা শুয়ে শুয়ে দেখব।"

মুক্তা জীবনে কতবার আড়ংয়ে গিয়াছে। দেখিয়াছে কত জননী তাদের শিশুদের জন্য খেলনা কিনিয়াছে। শোলার খাঁচা কিনিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিত, তার সন্তান থাকিলে সেও ঐ সব কিনিয়া দিত। আজ বন্ধুসুন্দরের আব্দারে মুক্তার বুকে-চাপা বাৎসল্য সার্থক হইয়া উঠিল।

মুক্তা গৌরকিশোরকে সব কথা বলিয়া আড়ং হইতে খেলনা, ঘোড়া, পুতুল, শোলার খাঁচা কিনিয়া তার সঙ্গে ফেনী বাতাসা,

বিন্নিখৈ আনিয়া প্রভুর মন্দিরের দুয়ারে রাখিল। প্রভু পরম আদরে বালকের মত নাড়িয়া চাড়িয়া একটি একটি করিয়া গ্রহণ করিলেন। শোলার খাঁচাটি দোলাইয়া দোলাইয়া হাসিতে লাগিলেন। মুক্তা সেই হাসির মুক্তারাশি কুড়াইয়া বুক ভরিয়া রাখিল।

"ওরা কী করে ?"

পাড়ার মেয়েরা মাঠে মটর শাক তুলিতেছে। পরম কৌতুক-প্রিয় বন্ধুসুন্দর দূর হইতে দেখিতেছেন। মুক্তাদাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরা কী করে, দিদি ?" মুক্তা বলিল, "ওরা ত শাক তোলে।" কচি খোকাটির মত বন্ধুহরি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "শাক দিয়া কী করে ?" মুক্তা বলিল, ওমা, তাও জান না, শাক রান্না করে, ভাতের সঙ্গে খায়।"

বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "দিদি, আমায় শাক খাওয়াবি।" মুক্তার বাৎসল্য স্নেহ বিগলিত হইয়া নয়ন প্রান্তে মুক্তার মত ঝরিতে লাগিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে মুক্তা কহিল," তুমি শাক খাবে, কেন দিব না। নিশ্চয়ই দিব।" প্রভু অতীব আবদারে বলিলেন, "আজই দিবি।" মুক্তা বলিল, "না গো আজ না, কাল দিব।"

মুক্তা নয়নজলে ভাসিয়া শাক তুলিয়া রান্না করিল। ভাজি শুকতা, অন্ন ব্যঞ্জনাদিও করিল। রন্ধন শেষ করিয়া

ভাইকে কহিল, "গৌর, প্রভুকে ভোগ দিয়া আস।" গৌর-কিশোর শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া অতি সন্তর্পণে ভোগ লইয়া অঙ্গনে চলিলেন।

সেদিন ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। মুক্তা মনে করিল, এই গরমে প্রভুর আহার কালে খুবই কষ্ট হইবে। সে তখন একখানি পাখা লইয়া, তাহার গৃহস্থিত প্রভুর চিত্রপটে বাতাস করিতে লাগিল। আর নয়ন মুদ্রিত করিয়া অঙ্গনে প্রভু তাহার শাকান্ন গ্রহণ করিতেছেন, ইহা ভাবিতে লাগিল।

গৌরকিশোর ভোগ লইয়া আসিতেই প্রভু দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে ভোগ রাখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু বসিয়া পড়িলেন। গৌরকিশোর বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর, খুব গরম পড়িতেছিল। গৌরকিশোরের ইচ্ছা জাগিল, গিয়া প্রভুকে বাতাস করেন। নিকটে গেলে পাছে সেবাবাদী হন এই ভয়ে আর গেলেন না। ভোগান্তে গৌরকিশোর কহিলেন, "প্রভু, আপনার গরমে খুব কষ্ট হইতেছিল। প্রভু বলিলেন, "না, কষ্ট হয় নাই, মুক্তা দিদি মিষ্টি বাতাস দিচ্ছিল।"

———

মাদারী সাহা

মাদারী সাহা চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক। গোয়ালচামট গ্রামে অঙ্গনের নিকটেই বাড়ী। প্রভু তাহাকে ভালবাসেন। একদিন প্রভুর আঙ্গিনার উপর দিয়া সে চলিয়াছে, পশ্চিমমুখে। প্রভু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাদারী, কোথায় যাস্?" মাদারী বলিল, "যাব প্রভু পশ্চিমপাড়া, এক অন্নপ্রাশনের নিমন্তন্ন খাইতে।" "আমার জন্য সন্দেশটা আনিস্।" বলিয়া প্রভু মধুর হাসিলেন। সেই আবদার ভরা হাসিতে মাদারীর প্রাণটা ভরিয়া গেল।

মাদারী নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছে। নিমন্তন্ন বাড়ীর সন্দেশটা পাতে না নিয়া হাতে করিয়া আনিয়াছে প্রভুর জন্য। পাছে হাতের ঘাম লাগিয়া প্রভুর সেবার অযোগ্য হয়, এই ভয়ে এক খণ্ড কলাপাতায় জড়াইয়া লইয়াছে।

ফিরিতে দেখেন প্রভু বন্ধুহরি শ্রীমন্দিরের তুয়ারে বসিয়া— "কই, মাদারী সন্দেশ এনেছিস্"।

"হাঁ, এনেছি প্রভু, এই নিন্।"

প্রভু হাত পাতিয়া লইলেন। মাদারী বলিল, "প্রভু খান।" মাদারীর দিকে পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া প্রভু সন্দেশ হইতে ভাঙ্গিয়া এক ছোট টুকরা মুখে দিলেন। মুখ ফিরিয়া বাদবাকী সন্দেশ মাদারীকে ফিরাইয়া দিতে গেলেন।

"প্রভু, সবটা খান" মাদারী বলিল।

"না, তুই নে" খা নিয়ে উত্তর দিলেন প্রভু।

মাদারী হাত পাতিয়া সন্দেশ নিয়া আর একটু টুকরা ভাঙ্গিয়া মুখে দিল। মুখে দিতে দিতে বলিল, "প্রভু সবটা সন্দেশ আপনি খেলেই আনন্দ পেতাম।"

"আচ্ছা, তবে দে" বলিয়া প্রভু হাত পাতিলেন।

"প্রভু, আমি খেলাম, এখন আপনাকে দেই কী করে ?"

মাদারী সঙ্কোচ করিতেছে। প্রভু মাদারীর হাত হইতেই বাকী সন্দেশটুকু লইলেন।

মাদারী মনে মনে ভাবিল, প্রভুর খাওয়া কখনও দেখি নাই। ঐটুকু যদি সামনে খেতেন, তবে খাওয়া দেখিতাম। মাদারীর অন্তর জানিয়া, প্রভু এবার আর পিছন দিয়া দাঁড়াইলেন না। তাহার সম্মুখেই সন্দেশের অংশটুকু শ্রীমুখে ফেলিয়া দিলেন। আহারকালে শ্রীবদনের মাধুর্য্য দেখিয়া মাদারী আনন্দে বিহ্বল হইল।

সন্দেশটুকু খাইয়া প্রভু বলিলেন, "মাদারী, প্রথমটুকু অপেক্ষা শেষেরটুকু বেশী মিষ্টি লাগিল।"

মাদারী বলিলেন, "তাও কি হয় নাকি প্রভু! একই সন্দেশ এক অংশ হইতে আর এক অংশ কি বেশী মিষ্টি লাগিতে পারে ?"

"তাও পারে" বলিয়া প্রভু মাদারীর মুখের দিকে একটি অসীম স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

আহারে প্রভুর বদন-মাধুর্য্য, কথায় প্রভুর স্নেহমাধুর্য্য ও চাহনীতে প্রভুর দৃষ্টি-মাধুর্য্য। এই তিন মাধুর্য্যে মাদারী ডুবিয়া

ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদার

শ্রীকালিন্দীমোহন মুখোপাধ্যায়
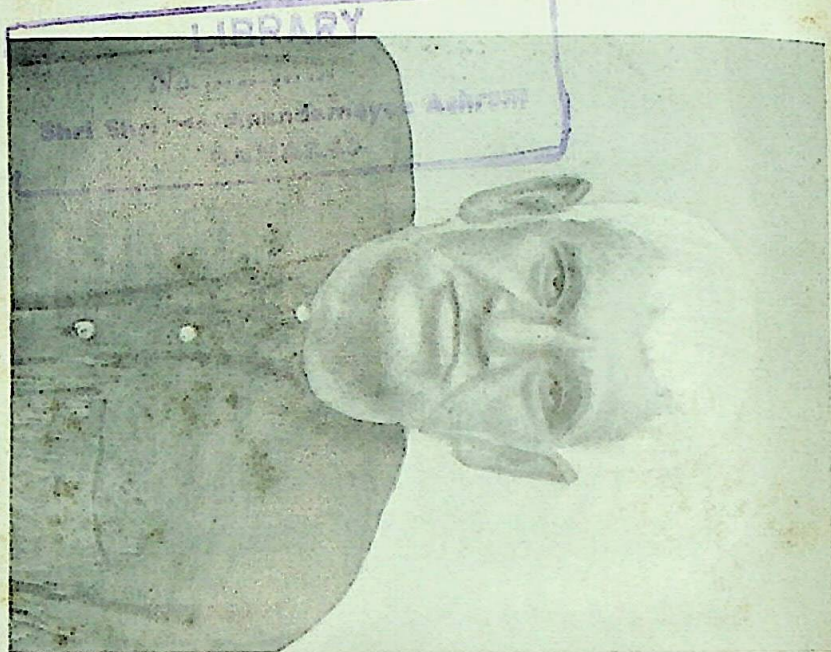
গেল। সারাজীবন ডুবিয়াই ছিল। যৌবন ছাড়াইয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াও মাদারী ঐ কথাটি বলিয়া অশ্রুগঙ্গায় স্নান করিত— "আহা কী মধুর কথা—একটা সন্দেশেরই এক টুকরা অপেক্ষা, আর এক টুকরা বেশী মিষ্টি হয় !!"

ডাঃ উষারঞ্জনের প্রতি কৃপা

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে (১৩০৭) শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা নগরীতে আসিলেন। ঢাকায় আসিয়া রমেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রামধন শাহর বাগানবাড়ীতে বাস করিলেন। পূর্ণচন্দ্র, সুধন্ব, রাধাবল্লভ, প্যারী সেন, সকলের প্রাণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঢাকা পৌঁছিয়াই প্রভু রমেশচন্দ্রকে কহিলেন, "রমেশ, আমার ব্যাধি হয়েছে।" অপর একদিন শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, তোমার কী ব্যাধি হয়েছে, ভাল করিয়া বল।"

শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন, "রমেশ, আমার ষাটসহস্র ব্যাধি হয়েছে। তুই যা, একজন ডাক্তার ডেকে আন্।" রমেশ কোন্ ডাক্তারকে আনিবেন ভাবিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "উষাবাবুকে নিয়ে আয়।"

রমেশচন্দ্র যাই যাচ্ছি করিয়া একটু দেরী করিতেছিলেন।

প্রভু অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এখনি যা, এই মুহূর্ত্তে। বিলম্ব করলে তাকে পাবি না।"

প্রভুর অত্যাগ্রহ দেখিয়া রমেশচন্দ্র তন্মুহূর্ত্তেই রওনা হইলেন। উষারঞ্জন মজুমদার ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ডিমন্‌ষ্ট্রেটার। পূর্ণচন্দ্র, সুধন্ব প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। ছাত্রেরা জগদ্বন্ধু প্রভুর কাছে গিয়া কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে—এইজন্য উষাবাবু অনেক সময় তাহাদিগকে শাসনসূচক কথা বলিতেন। উষাবাবুর কাকা ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাহার সঙ্গে ও প্রভাবে উষাবাবুও ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ডাক্তার হিসাবে উষাবাবুর সুনাম ছিল। তাঁহার বাসা ছিল আর্ম্মানিটোলায়।

রমেশচন্দ্র উষাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি আহারাদি শেষ করিয়া কোথাও যাইবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া বসিয়া আছেন। আর পাঁচ মিনিট পর গেলে তাঁহার দেখা মিলিত না। রমেশচন্দ্র প্রভুর অসুস্থতার সংবাদ জানাইতেই তিনি যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। রমেশচন্দ্র ঘোড়ার গাড়ীতে উষাবাবুকে লইয়া টিকাটুলি রামধন শাহর বাগানে উপনীত হইলেন।*

প্রভু বন্ধুহরি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া আছেন। ডাক্তারবাবু গৃহে প্রবেশ করিতেই শ্রীশ্রীপ্রভু দরজা বন্ধ করিয়া

* প্রাচীনভক্ত লোকনাথ সরকার বলেন, ডাক্তার উষাকে কৃপা করিবার সময় শ্রীশ্রীপ্রভু উয়ারীতে এক ছোট বাসায় অবস্থান করিতে ছিলেন। রামশাহর বাগানে নহে।

দিতে বলিলেন। দরজা বন্ধ করা হইল। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ডাক্তারবাবুর নিজ হস্তে লিখিত নোট হইতেই বলিব।

"আমি যাইয়া দেখি, প্রভুর দেহ অতি সুন্দর ও প্রকাণ্ড। আমার একটু ভয় হইতে লাগিল। কেমন আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। প্রণাম করিয়া প্রভুর হাত দেখিলাম।

দেখিলাম—শরীর অত্যন্ত শীতল। নাড়ীর স্পন্দন মৃদু এবং slow, অনেক সময় যেন পাওয়াই যায় না। আমি বলিলাম যে, "শুধু নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিতে পারিব না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

এই কথা বলিবামাত্রই প্রভু কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিটোল। দেহ প্রকাণ্ড এবং সুগঠিত। স্পর্শ শীতল। Heart area খুব ছোট বলিয়া বোধ হইল। Heart sound খুব অস্পষ্ট শুনা যায়। Vesicular breathing of the lungs খুব কম। যেন শ্বাস-প্রশ্বাস চলেই না। এরূপ বোধ হইল। Area of hepatic dullness খুব কমই বোধ হইল। Spleen area ঠিকই পাইলাম না। Organs of generation i.e. penis and testicles একেবারেই শিশুর মত—মাত্রও developed নয়।

Abdominal wall খুব আঁটা। Relaxity মাত্রও নাই। Tympanitic sound of the intestine মাত্রও নাই। যেন কিছুই খান নাই মনে হইল। একেবারে বায়ুশূন্য। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও

প্রভু অত্যন্ত সুস্থকায়। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ যাবৎ এমন রোগী দেখি নাই। কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই।

আমি প্রভুর দিকে অবাক হইয়া চাহিতে লাগিলাম। প্রভু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ইহা এমিবার দেহ (amoebia) কি আর দেখবেন ডাক্তারবাবু! আমার কোন ব্যাধি নেই। Liverটা প্রায় একমণ ওজনের হয়ে গিয়েছিল, প্লীহাটী খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। এখন সে সব নেই, চলে গিয়েছে।"

"এই পঞ্চভূতের সঙ্গে ধর্ম্ম মিশে পৃথিবীতে কেবল ঘুরছে। এই ধর্ম্মকে ঠিক করতে হবে এবং জীবকে সত্য আস্বাদন করাতে হবে। তবেই মঙ্গল। নতুবা মঙ্গল নেই। এই করতেই আমি এসেছি। কিন্তু কলি বাধা জন্মাচ্ছে। একটা পাহাড় আমার দাঁতের উপর ফেলে দিয়েছিল। দেখুন না দাঁতটী ভেঙ্গে গিয়েছে।"

প্রভুর কথা শুনিয়া দাঁত দেখিলাম। একটা depression দাঁতে দেখিলাম (incisor tooth) দাঁতটির shape peculiar. মনে হইল। ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রভুর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভু বলিলেন—"এখন আপনি বাহিরে যান। আমার শরীর শুকিয়ে উঠছে।" প্রভুর তেজপুঞ্জ দেহের দিকে তখন তাকান অসম্ভব। আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। প্রভু ঘরের মধ্যে রহিলেন। প্রভু ঐ সময় আমাকে বলেছিলেন, "আপনি বড় ডাক্তার Civil Surgeon—আমাকে ঔষধ দিন।"

প্রণব মন্ত্র

ডাক্তারবাবু রওনা হইয়া যাইতে প্রভু আবার তাহাকে ডাকিলেন। ডাক্তার ফিরিয়া আসিলে বন্ধুসুন্দর কহিলেন— "আপনি প্রণব মন্ত্র জপ করেন ?"

গোপ্য জপমন্ত্র প্রভু বলিয়া দিলেন, ইহাতে উষারঞ্জন আরও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, করি।"

প্রভু বলিলেন, "করেন, কিন্তু করা হয় না। উহার উচ্চারণ আপনার হয় না। এই শুনুন, এইভাবে উচ্চারণ করিতে হয়।" বলিয়া—এমন মধুর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে প্রভু প্রণব উচ্চারণ করিলেন যে, শুনিয়া মনে হইল, অব্যক্ত ব্রহ্ম তখনই সুপ্রকট হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুর উচ্চারণে উষারঞ্জনের দেহে একটা পুলক শিহরণ খেলিল।

প্রভু বলিলেন, "আপনি মন্ত্র ভাল করিয়া জপ করিলেই আমার ব্যাধি সারিয়া যাইবে।" ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ডাক্তারের ঔষধ আনিয়া দেওয়া হইল। প্রভু তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিলেন না। পরদিন বলিলেন, "সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছি।"

নবাবের স্পেশাল ট্রেণ

শ্রীশ্রীপ্রভু রামধন শাহর বাগানবাড়ীতে অবস্থানের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ঐ বাগানে প্রথম পদার্পণের এক উপভোগ্য কাহিনী ভক্তবর উষারঞ্জনের মুখে শ্রুত হইয়াছি। তাঁহার ভাষাতেই নিম্নে বর্ণিত হইল।

অনুমান ইংরেজী ১৯০০ সন হইবে। আমি (ডাঃ উষারঞ্জন) গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলে ডিমন্‌ষ্ট্রেটার পদে কাজ করি। আমি তখন staunch (গোঁড়া) ব্রাহ্ম ছিলাম। অবতারবাদ এবং মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিতে আদৌ বিশ্বাস ছিল না। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু তখন মাঝে মাঝে ঢাকা আসেন।

এই সময় ঢাকার ছলিমউল্লা সাহেব তাহার ম্যানেজার Mr. G. L. Girth. এবং উচ্চপদস্থ কতিপয় কর্ম্মচারিসহ কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইতেছেন। প্রভুবন্ধুও সেইদিনই শ্রীধাম ফরিদপুর হইতে ঢাকা যাইতেছেন। নবাব সাহেবের জন্য নারায়ণগঞ্জ ষ্টেসনে স্পেশাল ট্রেণ ছিল। প্রভুবন্ধু ষ্টীমার হইতে উঠিয়াই তদসঙ্গীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত রমেশ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া নবাব সাহেবের স্পেশাল ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর ভুবন ভুলান রূপের ছটায় সকলেই মুগ্ধ হইল। নবাব এবং তাহার লোক কেহই ঐ গাড়ীতে উঠিল না এবং প্রভুবন্ধুকে একটি কথাও বলিল না। গাড়ীর জানালা ইত্যাদি খুলিয়া দেওয়া হইল। নবাব সাহেবের আদেশে স্পেশাল ট্রেণ প্রভুকে নিয়াই নারায়ণগঞ্জ ষ্টেসন হইতে রওনা হইল।

নবাব সাহেব এবং তদ্‌সঙ্গীয় লোকজন পরের ট্রেণে গেলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকা ষ্টেসনে পৌঁছিলে ষ্টেসন প্লেটফরমের যাবতীয় লোক প্রভুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া একদিকে সরিয়া গেল। প্রভুকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাহর বাগানে নেওয়া হইল। একটি নূতন দালানে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ স্থাপনের কথা ছিল। সেই দালানেই প্রভুকে জায়গা দেওয়া হইল। সেই সময় অনেক লোক শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা দেখিল তাহারাই মজিল। জীবন ধন্য মনে করিল।

এই সময় একজন লোক প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য আসে, অন্তর্য্যামী প্রভু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রমেশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুজী, লোকটা কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা কর। রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করায় লোকটা আত্মগোপন করিয়া বলিল, শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে আসিয়াছি। এইকথা রমেশবাবু প্রভুর নিকট প্রকাশ করিলে প্রভু বলিলেন, "মিথ্যা কথা, সে যাহা দেখিতে চায় তাহাই দেখাইব।" লোকটি ভয় পাইয়া চলিয়া গেল।

"যে বস্তুর যতক্ষণ সুকৃতি"

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুর এক অভিনব ভাব দেখা গেল। ঘন ঘন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একখানা বস্ত্র আনিয়া দিতেই দশ বিশ মিনিট পর উহা ছাড়িয়া দেন। বস্ত্র ছাড়িয়া দিগম্বর হইয়া বসেন ও বস্ত্র চান। প্রিয়জনেরা তাড়াতাড়ি অন্য বস্ত্র আনিয়া দেন। আবার দশ বিশ মিনিট পর সেখানা ত্যাগ করিয়া আর একখানা চাহেন।

এইরূপ দুই তিনদিন চলিল। বস্ত্র জোগাইতে জোগাইতে ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রমেশচন্দ্র প্রভুর নিকট গিয়া বলিলেন—"আমরা সব অর্থহীন দরিদ্র। তোমার জন্য এত বস্ত্র কোথা হইতে জোটাইব। এরা ত সব ছাত্র। সামান্য জল খাবার পয়সা হইতে বাঁচাইয়া এরা তোমার যথাসাধ্য একটু সেবা করে। তুমি এত ঘন ঘন কাপড় চাহিলে ইহারা কিরূপে তোমার চাহিদা মিটাইবে?"

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "রমেশ, আমি কী করি বল্‌ত। যে বস্তুর যতক্ষণ সুকৃতি থাকে ততক্ষণই এই অঙ্গে ধৃত হইতে পারে। তদতিরিক্ত হইলে জ্বালা উপস্থিত হয়। যে বস্তুর এক ঘণ্টার সুকৃতি আছে তাহাকে আমি প্রত্যহ দশ পাঁচ মিনিট ব্যবহার করিয়া হয়ত এক সপ্তাহ ব্যবহার করি।"

প্রভুর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া সকল ভক্তগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাহারা আর কোন কথা বলিলেন না। কয়েকদিন পর ঐরূপ বস্ত্র পরিবর্ত্তন আর থাকিল না।

অনন্ত খিচুরী

একদিন ঢাকার সকল ভক্তগণ একত্রিত হইয়া প্রভুর সম্মুখে প্রভুর রচনা কীর্ত্তন উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন চলিতেছেন। প্রত্যেকটি কীর্ত্তনেই আনন্দের তুফান উঠিতেছে।

প্রভুর সেবা ও ভক্তসেবার রান্নার ভার সুধন্ব সরকারের উপর। সুধন্ব রান্না বসাইয়া মাঝে মাঝে কীর্ত্তনের মধ্যে ছুটিয়া যাইতেছেন। কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া আবার রান্নাঘরে আসিয়া উনুনে কাঠ দিয়া সব ঠিক আছে কিনা দেখিয়া যাইতেছেন।

রান্নার দ্রব্যাদি সব যথাযথ গোছান আছে। উনুনে জল চাপাইয়া ডাল বসাইয়াছেন। চাউল ধৌত করিয়া রাখিয়াছেন। তরকারী তৈয়ারী হইয়াছে। মসল্লা বাটা আছে। লবণ লঙ্কা সবই ভাগে ভাগে প্রস্তুত আছে। একটা দ্রব্যের পর আর একটা রান্না করিবেন, এইভাবে সব সাজান আছে।

এবার সুধন্ব কীর্ত্তনে যাইয়া অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়া কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছেন। পরে হঠাৎ রান্নার কথা স্মরণ হওয়ায় ছুটিয়া আসেন রান্নাঘরে। আসিয়া দেখেন, রান্নার জন্য প্রস্তুত যাবতীয় সামগ্রী কে যেন ডাইল চাপান ডেগের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে। চাউল, ডাইল, তরকারী, লবণ, চিনি, লঙ্কা, মসল্লা, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ যাহা কিছু ভোগের জন্য যোগাড় করিয়াছিলেন, সবই এক হাড়ির মধ্যে ফুটিতেছে।

সুধন্বের মনে বড় ভয় হইল। প্রভুর সেবাই বা কী করিয়া হইবে এতগুলি ভক্তের সেবাই বা কী করিয়া হইবে। লবণ, চিনি, দুধ, লঙ্কা সব একত্র হইয়া নিশ্চয়ই অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। সুধন্ব ভয়ে ভয়ে সবকথা রমেশচন্দ্রকে জানাইলেন। রমেশচন্দ্র সুধন্বকে মন্দ বলিলেন। রান্না বসাইয়া ওরূপভাবে কীর্ত্তনানন্দে যাওয়া উচিত হয় নাই। বলিলেন, যে-প্রেমানন্দে সেবানন্দ বাধে, সেই প্রেমানন্দকে ভক্তেরা আদর করেন না।

এইসব বলিয়া রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া সব বিষয় লক্ষ্য করতঃ রমেশচন্দ্র বলিলেন, "সুধন্ব, একাণ্ড প্রভু ছাড়া আর কেহ করেন নাই। যখন তিনি নিজ হাতে এই কাণ্ড করিয়াছেন, তখন সবই তাঁর ভোগে দিয়া দেও।"

সব ভোগ একখানা বড় কলার পাতায় ঢালিয়া প্রভুকে দেওয়া হইল। প্রভু নীরবে কিছু গ্রহণ করিলেন। ভোগ বাহির করিয়া সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেখেন যে, এরূপ অপূর্ব্ব অমৃতময় বস্তু জীবনে কেহ কোনদিন আস্বাদন করে নাই। প্রভুবন্ধুর এই অপূর্ব্ব খেলায় ভক্তগণ অপার আনন্দসিন্ধুতে ডুবিয়া গেলেন।

"সুধা বড় লোভী"

প্রভুর সেবার দ্রব্য ভোগের পূর্ব্বে অপর কাহারও খাইবার ইচ্ছা হইলে ঐ দ্রব্য কুত্রাপি সেবায় লাগিত না। মনের সূক্ষ্মতম কোণেও যদি ঐ ইচ্ছা জাগিত, তাহা হইলেও সেবা বাদ পড়িয়া যাইত। প্রভুর বহু লীলাখেলায় ভক্তগণ এই শিক্ষা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন।

একদিন পূর্ণচন্দ্রের মাতা সাতখানা বড় পরটা ও কিছু আলুর তরকারী অতি যত্নে তৈয়ারী করিয়াছেন, প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে। মাতা সুধন্বকুমারের হাতে উহা দিয়া রামধন শাহর বাগানবাড়ীতে পাঠাইয়া দেন।

বেলা তখন বারটা। সুধন্ব ভোগের দ্রব্য ঘরের মধ্যে নিয়া দিলেন। সুধন্ব বাহির হইলেই প্রভু দরজা দিয়া দিলেন। সুধন্বের মনে হইল, প্রভু এখনই ভোগ নিবেন। ভোগ নিলেই প্রসাদটি আমার প্রাপ্য হবে। প্রভু আর সাতখানা পরটাই খাইয়া ফেলিবেন না। এখন ত বাগানে আর কেহ নাই, রমেশবাবুর স্কুল হইতে ফিরিতে চারিটা বাজিবে। সুতরাং প্রসাদ সবটাই এখন আমার হইবে।

আড়াইটা বাজিল, তিনটা বাজিল, সাড়ে তিনটা বাজিল, চারিটাও বাজিল। সুধন্ব ঘড়ির দিকে কান দিয়া ও প্রভুর দরজার দিকে মন দিয়া নানা জল্পনা করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রভু আর ঘরের দরজা খুলিলেন না।

চারিটার পর রমেশচন্দ্র স্কুল হইতে ফিরিলে প্রভু দরজা

খুলিলেন। সুধন্ব তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া দেখিলেন, প্রসাদ ঢাকাই আছে। বাহির হইলেই প্রসাদ পাইব। রমেশচন্দ্র বড় একটা প্রসাদ লন না। সুতরাং আমিই পাইব।

প্রভুবন্ধু তখন হাততালি দিয়ে রমেশচন্দ্রকে ডাকিলেন। রমেশচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিলেই শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "ঐ পরটা সবগুলি সুধাকে খেতে বলিস। একবারে হউক, দুইবারে হউক সুধাই যেন সবটা খায়, অন্য কেহ যেন না লয়।" রমেশচন্দ্র পরটার থালা লইয়া আসিয়া সুধন্বকে উহা দেন ও প্রভুর আদেশ জানাইয়া দেন।

সুধন্ব থালার ঢাকনী খুলিয়া দেখেন পরটা সাতখানাই রহিয়াছে। অর্থাৎ এককণাও স্পর্শ করেন নাই। সে লোভ করিয়াছে বলিয়া প্রভু ভোগ গ্রহণ করেন নাই, এইকথা ভাবিতে সুধন্বের বুকখানা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল, এবং জীবনে আর কখনও ভোগের আগে প্রসাদে লোভ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অপর একদিন প্রভু রমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"রমেশ, সুধা বড় লোভী, ওকে পেট ভরে খেতে দিস্।"

প্রকৃতির পুলক

শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিয়া যেমন ভক্তগণ আনন্দ পাইতেন, সকল নরনারী আনন্দ পাইতেন,—বিশ্ব-প্রকৃতিও সেইরূপ পুলকিতা হইতেন। আমাদের স্থূলচক্ষে প্রকৃতি জড়বৎ প্রতীয়-মানা হন—বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রকৃতিও চৈতন্যময়ী এবং শ্রীহরি তাঁহার বল্লভ। শ্রীহরির ঈক্ষণেই প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী হন।

"ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নৈশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ঢাকার প্রান্তবর্ত্তী রমনার মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দেখিলেন, প্রভুর অঙ্গজ্যোতি গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষলতাগুলিকে আলোকিত করিতেছে। পিছনের দিকটা অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। প্রভু যেদিকে যান সেই দিকেই আলো হয়, আর যে দিকটা পিছনে থাকে সেইদিকটা আঁধারে ঢাকা পড়ে। রমেশচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্রের চিন্তার তরঙ্গ টের পাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, আমি যখন তোদের কাছে আসি, তখন তোদের মনে কত প্রফুল্লতা আসে। আর আমি চলে গেলে তোরা কত মলিন হয়ে যাস। বল দেখি হ'স্ কিনা। সেইরূপ আমি প্রকৃতির যেদিক অতিক্রম করে যাচ্ছি, সেই দিক কাঁদছে, আর

যে দিক দৃষ্টিপাত করছি সেই দিক হাসছে। ঐযে আলোক দেখছিস্ ওটা প্রকৃতির পুলক।"

এই ভাবে নানাকথা প্রসঙ্গে রাত্র ভ্রমণে কাটাইয়া প্রভাত-কালে বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিবার আগে কি যেন এক ভাবাবেশে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আমার কি বিভূতি নাই?" প্রভুর গম্ভীর কণ্ঠে রমেশচন্দ্রের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। ভয় চলিয়া গেল।

রমেশচন্দ্র মুরব্বিয়ানা ঢঙ্গে প্রভুকে বলিলেন—"যাও যাও এখন ঘরে যাও, আর তোমার বিভূতি দেখতে চাইনা।" বিভূতির প্রতি আগ্রহহীন প্রেমিক ভক্তের কাছে ভগবানের বিভূতির মহিমা অচল হইয়া গেল।

বিভূতির মহিমার বদলে তখন পিরীতির মাধুর্য্য ছড়াইয়া হাসির ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উদ্ধার প্রয়াসী আত্মা

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে রমেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রভু বন্ধুহরি ঢাকার রমনার মাঠে বেড়াইতে গিয়াছেন। বৃক্ষলতা শূন্য খোলা মাঠের মধ্যে তুইজনে চাঁদের সুন্দর আলোতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মাঠের মাঝখানে একটা স্থানে ঘন জমাটবাধা খানিকটা অন্ধকার স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। এই অন্ধকার কিসের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া রমেশচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। সঙ্গে প্রভু না থাকিলে হয়ত ভয় পাইতেন। রমেশচন্দ্রের মনের ভাব বুঝিয়া প্রভু বলিলেন,—

"রমেশ, ঐ অন্ধকার কিসের জানিস্? উহা আত্মার সমষ্টি। উদ্ধার প্রয়াসী হয়ে ঘুরিতেছে। দেখবি একটু পরেই সব উদ্ধার হইয়া যাইবে।

এইকথা বলিয়া করুণাময় প্রভু করুণ নয়নে ঐ অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্রমে সব অন্ধকার বিলীন হইয়া গেল।

"বনের পশুও কথা শোনে"

অপর একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে লইয়া ঢাকার মাঠে গভীর রাত্রে বেড়াইতেছেন। প্রভুর সম্মুখে একটি শৃগাল পড়িল। শৃগালটা প্রভুর দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছিল। প্রভু রমেশকে বলিলেন, "রমেশ ওকে বল, বা দিক দিয়া যাইতে।" রমেশচন্দ্র প্রভুর আদেশ জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে শৃগাল, বাম দিক দিয়া চলিয়া গেল।

তখন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশকে বলিলেন, "দেখ রমেশ, বনের পশুও আমার কথা শোনে। আর হু'ঠেঙ্গে মানুষ এত চালাক আমার কথা শোনে না। প্রভুর উপর প্রভুত্ব করিতে চায়।"

"আমার কাছে হিন্দু মুসলমান সমান"

একদিন পূর্ণচন্দ্র তাহার মাতাও পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বাগানবাড়ী আসিলেন। প্রভুর জন্য সেবার দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া আনিলেন। রমেশচন্দ্রের হাতে দিলেন।

প্রভুবন্ধু তখন পুকুরের দক্ষিণ চালার বাগানে ছিলেন। "পূর্ণ খাবার এনেছে" এই কথা রমেশচন্দ্র জানাইতেই প্রভু বালকের মত চলিয়া আসিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিয়া খাবার চাহিলেন।

পূর্ণের আনা সকল দ্রব্য প্রভু তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিলেন। ভোগ গ্রহণান্তে রমেশচন্দ্রকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণ
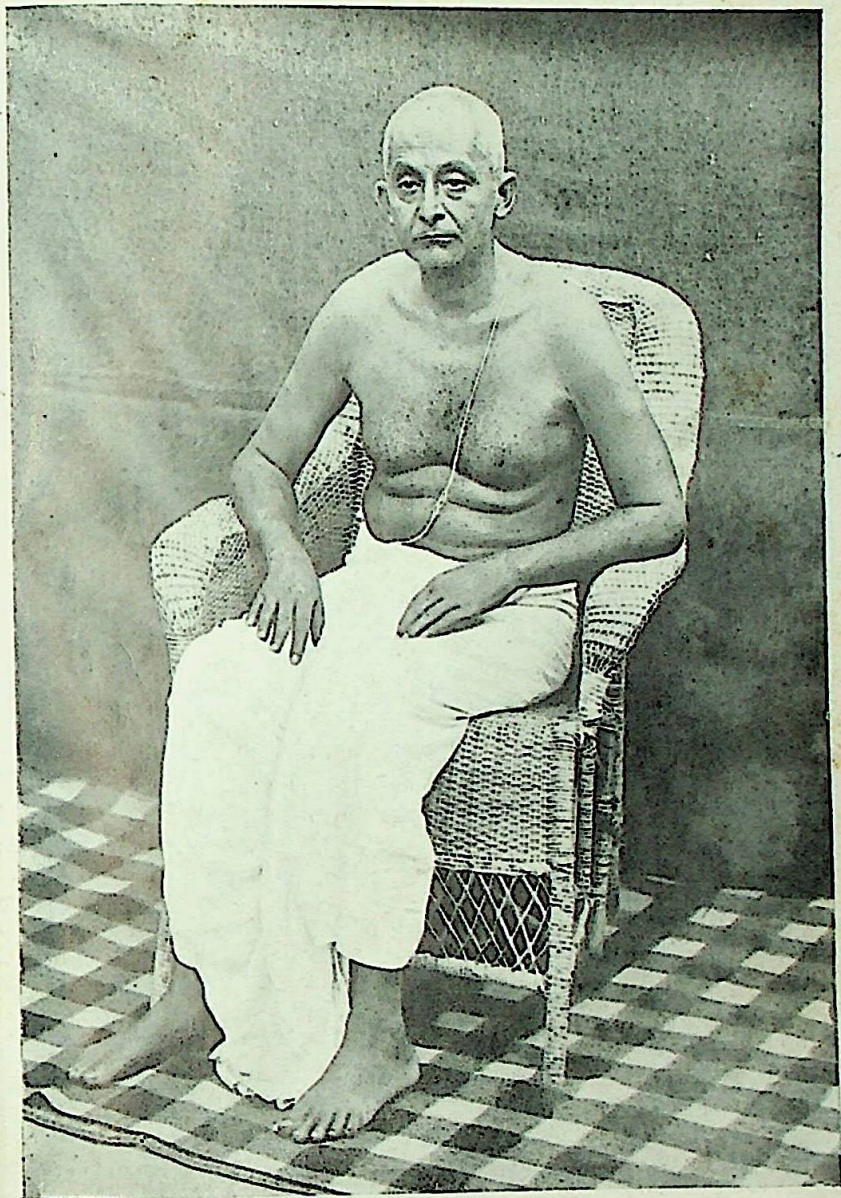
শ্রীরমেশচন্দ্র — (পরিণত বয়সে)

এইসব জিনিষ কেমন করিয়া আনিল? রমেশচন্দ্র বলিলেন, "গাড়ী করিয়া"। প্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী হিন্দুর না মুসলমানের?" রমেশচন্দ্র উত্তর দিলেন, "প্রভু, ঢাকা আবার হিন্দুর গাড়ী কোথায় পাবে?"

প্রভু রমেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলি, মুসলমানের গাড়ীতে খাবার আনিতে পূর্ণের সঙ্কোচ হইল না! "রমেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণের অন্যকথা আর মনে উঠে না।" সায় দিয়া প্রভু বলিলেন, "তা ঠিক, প্রিয়-জনের প্রতি অভিনিবেশে অন্য বিষয় আর চিত্তে ঠাঁই পায় না। আমার কাছে হিন্দু মুসলমান দুইই সমান। পূর্ণের কাছেও যে সমান হইয়াছে ইহাও ভাল, তবে লোকে দেখিলে দোষদৃষ্টি করিবে।"

অপর একদিন রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র রামচরণ শাহর বাগানে আসিয়া দেখিলেন, পুকুরের পূর্ব্বতীরের বাগানের ভিতর বেশ খানিকটা স্থান বিশেষভাবে আলোকময়। "ওটা কিসের আলো" জিজ্ঞাসা করায় একজন ভক্ত বলিলেন, "ওখানে প্রভু আছেন।" পূর্ণ সেখানে যাইয়া দেখিলেন, প্রভু কয়েকজন ভক্ত লইয়া কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন। তাঁহার অঙ্গছটায় বনানী আলোকিত হইয়াছে।

"মাতালে, পাগলে ও বালকে"

পূর্ণচন্দ্রের জননী একদিন প্রভুর সেবার জন্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়াছেন। কি যেন ভাবিয়া ভোগের দ্রব্যের কিয়দংশ পূর্ণের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রভু যদি আমাদের বাসায় আসিয়া আমাদিগকে দর্শন না দেন তবে আর প্রভুর ভোগের সামগ্রী করিয়া দিব না।"

মা বহুবার চেষ্টা করিয়াও প্রভুর দর্শন পান নাই, এইজন্য ওরূপ অভিমান করিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বাগানবাড়ী গিয়া প্রভুর সেবার দ্রব্য রমেশচন্দ্রের হাতে দিলেন। মনে করিলেন, মায়ের আবদারের কথা সুযোগমত প্রভুকে জানাইবেন।

রমেশচন্দ্র পূর্ণের দেওয়া খাবার লইয়া প্রভুর নিকটে যাইতেই প্রভু বলিলেন, "রমেশ,পূর্ণকে এখনই একখানা ঘোড়ার গাড়ী আনতে বল, আমি তাদের বাসায় যাব।" রমেশচন্দ্র আসিয়া পূর্ণকে কহিলেন, "পূর্ণ,শীঘ্র গাড়ী আন। প্রভু কি জানি কেন এখনই তোমার বাসায় যাইতে চান।"

রমেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র আনন্দে ধূলায় ঢলিয়া পড়িলেন। "অহো! কী দয়া, অহো! কী দয়া" বলিয়া গড়াগড়ি করিতে লাগিলেন। নিকটে সুধন্ব দাঁড়াইয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সুধন্বকে বলিলেন—"তুই ভাই গাড়ী আন, আমার শরীর আনন্দে অবশ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় আর চলিতে পারিব না।"

সুধন্ব গাড়ী আনিতে গেলেন। পথিমধ্যে খৃষ্টানদের গোর স্থানের নিকটে কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, "সুধা"।

সুধন্বকুমার ফিরিয়া দেখিলেন একটী ময়ুর। আরও একবার ঐরূপ ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, কিছুই নয়। কী জানি কী ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া সুধন্ব দ্রুতগতিতে ছুটিলেন। শীঘ্র ভালগাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া আসিলেন।

গাড়ীর গদী উল্টাইয়া শুদ্ধবস্ত্র পাতিয়া দেওয়া হইল। প্রভু আসিয়া বসিলেন। প্রভু যখন গাড়ীতে চলিতেন ঐরূপ গদী উল্টাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পাতিয়া বসিতেন। অন্যের বসা গদীতে কুত্রাপি বসিতেন না। রমেশচন্দ্র গাড়োয়ানের সঙ্গে বসিলেন। পূর্ণচন্দ্র ছাদের উপর উঠিলেন। সুধন্বকুমার পিছনে দাঁড়াইলেন।

গাড়ীর জানালা খোলা রহিল। পূর্ণচন্দ্র মনে করিলেন, প্রভুর যদি আপত্তি না থাকে তবে জানালা খোলাই থাকুক। রাস্তার সকলে প্রভুকে দর্শন করুক।

পথিমধ্যে একটী মাতাল প্রভুর রূপের ছটা দেখিয়া জানালার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিল ও দুই হাত প্রভুর দিকে প্রসারিত করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করতঃ "জনাব, জনাব, জনাব" বলিতে লাগিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সে অনেকক্ষণ দৌড়িল, শেষে যখন অনেক দূর পড়িয়া গেল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "জনাব—জনাব"।

লোকটি প্রভুর গাড়ীর পিছনে ছুটিতেই থাকিল। কতিপয় লোক পথে তাহাকে বাধা দিয়া আটকাইল। গাড়ী পূর্ণচন্দ্রের বাসায় পৌঁছিল। নামিবার কালে প্রভু বলিলেন—"রমেশ, আমাকে চিনবে মাতালে, পাগলে ও বালকে।"

"ও যেন হরিনাম করে"

পূর্ণচন্দ্রের জননী আনন্দে অধীর হইয়া উলুধ্বনি দিয়া বন্ধু-সুন্দরকে গৃহে গ্রহণ করিলেন। এত শীঘ্রই যে প্রভু তাহার মনের সাধ পূর্ণ করিবেন ইহা তাহার কল্পনারও অতীত। কিছুই জোগাড় নাই, একটী ভাল আসন পর্য্যন্ত পাতা নাই—কিভাবে প্রভুর যত্ন করিবেন—মাতা যেন পাগলিনীর মত হইয়া গেলেন।

মা পূর্ণকে বলিলেন, তুই আগে আমায় খবর দিলি না কেন? পূর্ণ বলিলেন—মা, প্রভু অন্তর্য্যামী—যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী আনিতে আদেশ দিলেন। প্রভুর অপার করুণার কথা ভাবিয়া পূর্ণ-জননী আনন্দে পূর্ণ হইলেন। ব্রজ-জননীদের মত পূর্ণ-জননীর বন্ধুসেবার আর্ত্তি দর্শন করিয়া রমেশচন্দ্র সুধন্বকুমার একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

প্রভুকে দর্শনের জন্য ক্রমে বাসায় লোক জমিতে লাগিল। লোকসংঘট্ট বাড়িলে প্রভুর অসুবিধা হইবে বুঝিয়া তিনি পূর্ণের জননীকে কহিলেন, "মা, আপনাদের আশা ত মিটিল, এখন প্রভুকে লইয়া যাই। বহুলোক আসিলে প্রভুর উদ্বেগ হইবে।" প্রভুর কষ্ট হইবে বুঝিয়া বাৎসল্যময়ী মা রাজী হইলেন।

প্রভু ওখানে কিছু গ্রহণ করিলেন না। পূর্ণের মা যাহা যাহা তৈয়ারী করিয়াছিলেন সব পূর্ণের হাতে দিলেন। আরও দ্রব্য তৈয়ারী বাকী ছিল, তাহাতে দেরী হইতেছিল। রমেশচন্দ্র প্রভুকে লইয়া গাড়ীতে রওনা হইলেন। পূর্ণ ও সুধন্বকে

বলিলেন, তোমরা সেবার দ্রব্য প্রস্তুত হইলে লইয়া পদব্রজে চলিয়া আসিও।"

সুধন্বও পূর্ণ প্রভুর সেবার দ্রব্য লইয়া পদব্রজে বাগানবাড়ী পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া দেখেন, প্রভু, বা রমেশচন্দ্র কেহই নাই। তাহারা কোথায় গেলেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া পূর্ণ ও সুধা সেবার দ্রব্য প্রভুর গৃহে রাখিয়া নিজেরা সিঁড়ির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রভু বুড়ীগঙ্গায় গিয়া সান্ধ্য স্নান করিলেন। অনেকক্ষণ জলে সাঁতার কাটিলেন। যতক্ষণ প্রভু স্নান করিলেন, রমেশচন্দ্র অনুগত ভৃত্যের মত তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভুকে তাগিদ দিয়া আনন্দে বাধা সৃষ্টি করিলেন না। বেশ খানিকটা রাত্র হইয়াছে, এমন সময় প্রভু রমেশচন্দ্র সহ বাগানে প্রবেশ করিলেন।

সিঁড়ির উপর পূর্ণচন্দ্রকে শায়ীত দেখিয়া প্রভু রমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশ, এ কেরে?" রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু এই ত পূর্ণ!" "ওঃ এই পূর্ণ" বলিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "বাঃ বেশত সুলক্ষণ। ওর ত সিদ্ধিলাভ হয়েছে। ওকে বলিস্, ওর পরমায়ু নাই। ও যেন হরিনাম করে। তাহা হইলে রক্ষা পাইবে।"

আমি হরিনাম করবো না

রমেশচন্দ্র সুধন্বকে বলিলেন, পূর্ণকে যেন বলিয়া দেয়—, প্রভু বলিয়াছেন তাহার মৃত্যুর ফাঁড়া আছে, হরিনাম করিলে রক্ষা পাইবে। রমেশচন্দ্রের কথানুসারে সুধন্বকুমার সেইকথা পূর্ণচন্দ্রকে জানাইয়া দিলেন।

সুধন্বের মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র কহিলেন—"সুধা, কর্ত্তাকে বলিও, আমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য হরিনাম করিব না। আমি ত আমাকে প্রভুকে দিয়া দিয়াছি। প্রভুর ইচ্ছা হইলে রক্ষা করিবেন, না হয় না করিবেন। আমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য হরিনাম করবো কেন ? নিজের ভার নিজে আমি আর নেব না। হরিনাম করবো না।

"এই মুহূর্ত্তেই যেতে হবে"

কয়েকদিন মধ্যে পূর্ণের জ্বর হইল। ভীষণ জ্বর। যন্ত্রণা অসহনীয়। মাথার যন্ত্রণায় অল্পসময় মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সারাদিন কোন পথ্য খাওয়ান গেল না। সর্ব্বাঙ্গ দারুণ জ্বরে পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে টিকাটুলি রামশাহর বাগানে রহিয়া প্রভুবন্ধু উন্মাদের মত ছট্‌ফট্ করিতেছেন। একবার উঠা, একবার বসা

একবার হা-হুতাশ, একবার শয্যায় গড়াগড়ি, বেদনাব্যঞ্জক শব্দ। কিছুক্ষণ পর শয্যায় বসিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিলেন,—

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—
ল্যাভেণ্ডর
অডিকলন
এছেন্‌স্‌
লবাং
দসাং
রবারের জুতা
দিবা

ফর্দ্দখানা রমেশচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন, এখনই এই ফর্দ্দখানা পূর্ণের হাতে দিয়া এস। রমেশচন্দ্র বলিলেন, এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, কাল সকালে যাব। প্রভু বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই যেতে হবে। আমি এই রেল লাইনের উপর বসে রইলাম। তুই ফিরে এলে আমি ঘরে যাব।"

———

"মৃত্যুর ফাঁড়া কাটিয়া গেল"

রমেশচন্দ্র ফর্দ্দ লইয়া তখনই পূর্ণের বাসায় গেলেন। সদর দরজার বাহিরে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ পূর্ণ পূর্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বাড়ীর লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ডাক শুনিতে পাইল না। পূর্ণই ডাক শুনিয়া সচেতন হইল। সে ডাকিয়া বাড়ীর অন্য লোক জাগাইল ও দরজা খুলিয়া দিতে বলিল।

দরজা খুলিয়া দিতেই রমেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন ও প্রভুর ফর্দ্দখানা পূর্ণের হাতে দিলেন। ফর্দ্দখানা হাতে নিতেই পূর্ণের মনে হইল—একটা বৈদ্যুতিক শক্তি তাহার মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হইল। প্রবল জ্বর দেখিতে দেখিতে ঘাম দিয়া ছাড়িয়া গেল ও শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইল।

সারাদিন পূর্ণচন্দ্র জ্বরে যেভাবে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা রমেশচন্দ্রকে কহিলেন। ফর্দ্দখানি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে একান্ত ভাবেই জ্বর নিরাময় হইয়া গিয়াছে, একথাও বলিলেন।

রমেশচন্দ্র এতক্ষণে বুঝিলেন, কেন বন্ধুসুন্দর সারাটা দিন এরূপ ছটফট করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্র পূর্ণের নিকট প্রভুর অবস্থার কথা, ব্যস্ততার সহিত চিঠি প্রেরণের কথা সব বলিলেন।

রমেশ বলিলেন, "পূর্ণ, দেখ প্রভুর কি অমোঘ করুণা। তিনি এখন পর্য্যন্ত রেল লাইনের উপর বসিয়া আছেন। আমি গেলে ঘরে যাবেন। এই চিঠির মধ্য দিয়া তিনি তোমার কাছে

তাঁহার অপূর্ব্ব স্পর্শ-শক্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমার সব জ্বালা নিজে নিয়া তোমাকে বাঁচাইলেন।

অশ্রুভরা চোখে পূর্ণ বলিলেন, সবই বুঝিলাম। আপনি যান, রেল লাইন হইতে প্রভুকে ঘরে লইয়া যান। আমি আগামী কল্যই এই ফর্দ্দের দ্রব্যাদি লইয়া শ্রীচরণ দর্শনে যাব।

রমেশচন্দ্র ফিরিলেন। রেল লাইনের উপর হইতে প্রভু বাগানের ঘরে গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন—"রমেশ রে, আজ পূর্ণের মৃত্যুর ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

"মুন লাইটের দেহ, বড়ও হয় ছোটও হয়"

পরদিন পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বাজারে গিয়া প্রভুর ফর্দ্দ অনুসারে কাপড় চাদর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনিলেন। জুতার দোকানে গিয়া মনে করিলেন, প্রভুর পায়ের মাপ না হইলে জুতা কিনিবেন কি উপায়ে!

মনে মনে ভাবিলেন, ৭ নং ৯ নং দুই জোড়া রবারের জুতা নিয়া যাই। যে জোড়া পায়ে লাগে রাখিব, যে জোড়া না লাগে ফেরৎ দিয়া দিব। দোকানদারকে ঐ সর্ত্তে রাজী করাইয়া দুই জোড়া জুতাই মূল্য নগদ দিয়া খরিদ করিয়া লইলেন। সকল দ্রব্য পাইয়া আনন্দে প্রভু নিজেই প্রত্যেকটি টেবিলের উপর সাজাইলেন ও পরমানন্দে উল্লাস করিতে লাগিলেন।

পূর্ণের দেওয়া কাপড়খানা প্রভু তখনই পরিধান করিলেন এবং চাদরখানা কাধের উপরে দিলেন। পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, জুতা দুই জোড়ার যে জোড়া চরণে লাগে লাগাইয়া দেখুন। যেটা না লাগে ফিরাইয়া দেন।

প্রভু বালকের মত আবদার করিয়া কহিলেন, "দুটোই থাক, দুটোই লাগ্‌বে।" পূর্ণ বলিলেন, প্রভু, ও দুই জোড়ার একটা অপেক্ষা অপরটা অনেক বড়। প্রভু বলিলেন, "তা হোক, দু'জোড়াই লাগ্‌বে।" বলিতে বলিতেই দুইজোড়া পর পর চরণে পরিধান করিলেন। দুইজোড়াই চরণে ঠিকঠিক মত লাগিয়া গেল।

জুতা পরিধান করিতে করিতে প্রভু বলিলেন, "পূর্ণ, এ মুন লাইটের দেহ কিনা, বড়ও হয় ছোটও হয়।"

রমেশচন্দ্র পূর্ণের নিকট তাহার মৃত্যু ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন। প্রভু যে তাহার রোগ যন্ত্রণা নিজে ভোগ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছেন একথাও বলিলেন। সব কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র মহা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমার মত একটি ক্ষুদ্র জীবকে রক্ষা করিতে প্রভু এত কষ্ট ভোগ করিলেন কেন! আমার না হয় মৃত্যুই হইত। তবু প্রভুর কষ্টের কথা শুনিয়া সহ্য হয় না।" বলিতে বলিতে পূর্ণের নয়নে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

বিষদানে পরীক্ষার চেষ্টা

একদিন ডাক্তার উষারঞ্জনবাবু রামশাহর বাগানবাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু একজন ব্যক্তিকে তিরস্কার করিতে-ছেন। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য ডাক্তারবাবু দাঁড়াইয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। লোকটির দেহে তিলকমালা প্রভৃতি বৈষ্ণব চিহ্ন ছিল। ইহাতেই কৌতুহল অধিক হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু রাগতভাবে বলিতেছেন—"আপনি কী চান ?"

লোকটী বলিতেছে, "আপনার দর্শন চাই"। শ্রীশ্রীপ্রভু অতি জোরে কহিতেছেন, "মিথ্যা কথা"। রমেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিলেন—"এই মিথ্যাবাদীকে বাহির করিয়া দেও ত।"

রমেশচন্দ্র প্রভুর আদেশমত অন্য কোন বিচার না করিয়া লোকটিকে বাগানবাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ডাক্তার উষারঞ্জন বাহিরে আসিয়া লোকটিকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া রহস্য বাহির করিয়া ফেলিলেন। লোকটি একটি বিশিষ্ট বাউলদলের লোক। তাহাদের দলের লোকের এই ধারণা, যে বিষ খাইয়া হজম করিতে পারে সেই সাধু। সে সেইজন্য শ্রীশ্রীপ্রভুকে বিষ দিয়া পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল।

উষাবাবু লোকটিকে বলিলেন, আপনি যে প্রভুকে বলিয়াছেন যে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, ইহা তাহা হইলে মিথ্যা কথাই। লোকটি স্বীকার করিল। উষাবাবু বলিলেন, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিতেছেন প্রভু অন্তর্য্যামী। লোকটি স্বীকার করিল। উষাবাবু বলিলেন, বিষ হজম করাটাকে সাধুর লক্ষণ

আমি মনে করি না। অন্তর্যামিত্বকে ঈশ্বর পুরুষের লক্ষণ মনে করি।

উষাবাবুর যুক্তিপূর্ণ বহু কথায় লোকটি নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় বাগানে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মন্দির সমীপে প্রণত হইল। শুনিয়াছি লোকটি ক্রমে সকল বাউলাচার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ লইয়াছিল।

বিষ খাওয়াইতে আসিয়া পুতনা যেরূপ পরাগতি লাভ করিয়াছিল, এই লোকটিও সেইরূপ বিষ দিতে আসিয়া শরণাগতি লাভ করিল।

মুসলমানের মোরব্বা

ডাক্তার উষারঞ্জনের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান রোগী তাহাকে কিছু মোরব্বা উপহার দিয়াছিল। উহা পাইয়াই ডাক্তার বাবুর উহা প্রভুকে দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি ব্রাহ্ম, মোরব্বার দাতা ও প্রস্তুতকারক মুসলমান, এই জিনিষ শ্রীশ্রীপ্রভু গ্রহণ করিবেন কিনা উষাবাবু দুই তিনদিন ভাবিলেন। কিন্তু সকল ভাবনা ছাড়াইয়া প্রভুকে দেওয়ার ইচ্ছাই বলবতী হইল।

প্রভু জগদ্বন্ধু, জগতের বন্ধু। আমি বা মুসলমান ভদ্রলোকটিও জগৎ ছাড়া নই। সুতরাং গ্রহণ করিবেন না কেন, এই সাহসে ভর করিয়া উষারঞ্জন মোরব্বার পাত্রটি রমেশচন্দ্রের হাতে দিয়া আসিলেন।

ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ দিনই ডাক্তার তারক চক্রবর্ত্তী নামক একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ প্রভুর সেবার জন্য কিছু দ্রব্য আনিয়া রমেশচন্দ্রের কাছে দিলেন। রমেশচন্দ্র উভয়ের প্রদত্ত দ্রব্যই একত্রে প্রভুর নিকট রাখিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রভু রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া তারক ডাক্তারের দ্রব্য দেখাইয়া বলিলেন, "ওতে পিয়াজের গন্ধ, উহা শীঘ্র সরাইয়া ফেল।" রমেশচন্দ্র উহা আনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ফেরত দিলেন। উষাবাবুর প্রদত্ত মোরব্বা পরম তৃপ্তির সহিত কয়েকদিন ধরিয়া গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে তারক চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পরে তিনি নিজ কার্য্যে কী ত্রুটি ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখ ভুলিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রভুর রচিত কীর্ত্তন প্রথম মুদ্রণ

মহাপ্রভুর কৃপার-আধার কুলীন গ্রামের বসুবংশ। ঐ বংশ উজ্জ্বল করেন শ্রীমান বিপিনবিহারী। বিপিনের যৌবন বয়স। শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের কৃপায় তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করেন ও কীর্ত্তনে প্রভুর রচিত পদের মহাশক্তি অনুভব করেন।

ঐ সব কীর্ত্তনাবলী অমূল্য সম্পদ। যাহাতে গৃহে গৃহে উহার প্রচার হয়, ইহাই বিপিনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তিনি প্রভুর গানগুলি সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে চম্পটী মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি

বিপিনকে আদেশ করিলেন, খুব বড় বড় টাইপে ছাপিতে হইবে যাহাতে ভাল লেখাপড়া না জানা লোকও অনায়াসে উহা দেখিয়া গান করিতে পারে।

বিপিনবিহারী প্রভুর অনেকগুলি গান সংকীর্ত্তন নাম দিয়া বড় বড় অক্ষরে ছাপাইলেন। তিনি উহা মূল্য নিয়া বিক্রয় করিতেন না। ভক্তগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। প্রভুর লেখা প্রথম ছাপা দেখিয়া সকল ভক্তই পরমানন্দিত।

তখনও শ্রীশ্রীপ্রভুর কীর্ত্তন রচনা শেষ হয় নাই। বিপিন-বিহারী তৎকালে যতগুলি কীর্ত্তন পাইয়াছিলেন, তাহাই সাজাইয়া গোছাইয়া ছাপাইয়াছিলেন। তাহার আগ্রহে ও অনুগ্রহে বহু কীর্ত্তনানুরাগী ভক্তমণ্ডলী প্রভুর রচিত কীর্ত্তন পাইয়া কীর্ত্তন করিবার সুযোগ লাভ করিল। বিপিনবিহারীর মহাদানে ভক্তমণ্ডলী চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিল।

শিশিরকুমারের উপর কৃপাবর্ষণ

শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতায় আসিয়াছেন। কুমারটুলি গঙ্গার ধারে ফটিক মজুমদারের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার প্রমুখ আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় সজ্জন এইস্থানে শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনলাভ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। প্রভুর নির্দ্দেশে শিশিরকুমার নিজে করতাল বাজাইয়া কলিকাতার পথে টহল কীর্ত্তন করিতেও সঙ্কোচ করেন নাই। টহল কীর্ত্তন করিয়া কুমারটুলী দিয়া যাবার কালে একদা

শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার মস্তকে উপর হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাহাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গৌরলীলা প্রচার ও অন্যান্য মহৎ কার্য্যের মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুর আশিস্-শক্তি বিরাজমান ছিল।

নবদ্বীপের উপর বিশেষ অনুগ্রহ

ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণকাদা থাকাকালে নবদ্বীপ দাসের মনে রীতিমত দীক্ষা গ্রহণের সাধ জাগে। শ্রীশ্রীপ্রভুকে মনের কথা জানাইলে প্রভু নীরব হন। অভিমান ভরে ফলে নবদ্বীপ প্রভুর কাছ হইতে কুমারখালী চলিয়া যান। তৎপর প্রভুর শ্রীহস্তের চিঠি পাইয়া কলিকাতা আসিয়া কুমারটুলীতে সাক্ষাৎ করেন। পুনরায় সেবায় নিযুক্ত হন। প্রভু উষায় গঙ্গায় স্নান করেন। নবদ্বীপ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করেন ও স্নানান্তে সিক্ত বসনাদি কাচিয়া আনেন। মনের বাসনা মনেই আছে। প্রভুর চিঠির ভরসাটুকু সম্বল করিয়া মুখ ফুটিয়া আর কিছু বলেন না।

স্নান করিয়া প্রভু আসিয়া একখানি খাটে বসিয়াছেন, নবদ্বীপ খাটের নীচে বসিয়া মনে মনে দীক্ষার কথা ভাবিতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন একখানি খাতা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিশিষ্ট দুইটি মন্ত্র তাহাকে অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইয়া দিলেন ও জপ করিতে বলিলেন।

নবদ্বীপ বলিলেন, প্রভু, খাতা দেখিয়া মন্ত্রজপ করিলে ত বই কিনিয়া নিলেও হয়। মন্ত্র যদি দিলেনই তবে আর একটু কৃপা

করুন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "ও কানে দিতে হবে বুঝি। তবে আয়।"

নবদ্বীপ খাটের নীচে দূরে বসিয়াছিলেন, খাটের পায়ার কাছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ঐ স্থানে নবদ্বীপ কান পাতিলেন। বন্ধুসুন্দর পূর্ব্বকথিত মন্ত্র দুটি সুস্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "হ'ল ত"? কাউকে বলিস না। যে মন্ত্রটি তোর কাছে উচ্চারণ করিলাম, ওটি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়ম করিয়া জপ করিস।

অতঃপর অপর একদিন নবদ্বীপ স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার মাথার কাছে বসিয়া বলিতেছেন, "কামবীজ পুটিত আমার দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবা।" মন্ত্রটি প্রভু উচ্চারণ করিয়া বলিলেন। তৎপর একখানি তাম্রপাত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দেখাইলেন। ঘুম ভাঙ্গিবার পরও ঐ মন্ত্র নবদ্বীপ অবশ ভাবে অনেকক্ষণ জপ করিয়াছিলেন। প্রভু প্রদত্ত শ্রীহস্তলিখিত মন্ত্রগুলি নবদ্বীপের জীবন।

"সুরুর বাড়ী নিয়ে চল"

শ্রীশ্রীপ্রভু কুমারটুলীর বাসায় আছেন। একদিন ভক্তিমতী মাতা সুরতকুমারী আসিলেন। দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি যুক্তকরে নিবেদন করিলেন—বলিলেন, "প্রভু, কৃপা করিয়া রামবাগানে আসিয়া থাকুন। এ দাসীর সাধ, শ্রীচরণ সেবায় আনুকূল্য করিবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভু রাজী হইলেন।

সুরতকুমারী শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্য একখানা দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করতঃ তুলসী টব সাজাইয়া রাখিলেন। ধূপধূনা পোড়াইয়া সুগন্ধি ছড়াইয়া বাড়ীটি প্রভুর বাসের যোগ্য করিলেন।

রামবাগানের ভক্তগণ পাল্কী লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে আনিতে গেলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু আসিয়া পাল্কীতে বসিলেন। ভক্তগণ বহন করিয়া, জয় জগদ্বন্ধু নামের রোল তুলিয়া রামবাগানে হরিসভার ঠাকুরবাড়ী লইয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু পাল্কীতে বসিয়া বলিলেন, "এ আমায় কোথায় আনল! আমায় সুরুর বাড়ী নিয়ে চল।" ভক্তগণ পুনরায় পাল্কী বহন করিয়া সুরতকুমারীর বাড়ীতে নিয়া গেলেন। ১৬ নং মানিকতলা লেনে সুরতকুমারীর নিজের বাস করিবার বাড়ী। ঐ বাড়ী কোনপ্রকারেই প্রভুর বাসের যোগ্য নয় মনে করিয়া সুরতকুমারী কিয়ৎ দূরে এক দোতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার দুয়ারে প্রভুর আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

এদিকে প্রভু তার বাড়ী গিয়া—যে ঘরে সুরত নিজে বাস করেন সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিজের বস্ত্রই আসন করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। চম্পটী ঠাকুর প্রভুকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুরত ভাড়াটিয়া বাড়ীর দুয়ারে অপেক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়াছেন। এমন সময় তিনকড়ি ডোম দৌড়াইয়া গিয়া দেবীকে সংবাদ দিলেন—"তুমি এখানে প্রভুর অপেক্ষায় আছ, আর প্রভু তোমার বাড়ীতে তোমার অপেক্ষায় আছেন।

সুরতকুমারী বলিলেন, "সে কী! প্রভুর জন্য আমি বাড়ী ভাড়া করলাম, আর তিনি আমার বাড়ী গিয়াছেন!" কথা বলিতে বলিতে দেবী জ্ঞানহারার মত হইয়া গেলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এত অনুরাগে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়াছিলেন যে, তাহার গায়ের রেশমের চাদর-খানা যে পথে পড়িয়া গিয়াছে তাহা জানিতেই পারেন নাই।

ছুটিয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন, প্রভু তাহার ঘরের ভিতরে। আর, দরজা তালাবদ্ধ। প্রভু সুরতের কাছে কাগজ ও কলম কালি চাহিলেন। দেবী দরজার ফাঁক দিয়া ঐসব প্রভুকে দিলেন। প্রভু কতকগুলি দ্রব্যের নাম লিখিয়া এক ফর্দ্দ করিয়া দিলেন ও তখনই কিনিয়া আনিতে বলিলেন।

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দেবী বাজারে গেলেন ও সকল দ্রব্য লইয়া আসিলেন। আসিবার সময় নূতন বাজার হইতে উৎকৃষ্ট সন্দেশ লইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন চম্পটী তখনও ফিরেন নাই।

দ্রব্যাদি দরজার বাহিরে রাখিয়া সুরদেবী প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু,—আপনার জন্য কিছু সন্দেশ এনেছি। যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন তাহা হইলে আপনার হাতে দেই।" প্রভুর ঘরের দরজায় কড়ায় তালা দেওয়া। কপাটে খানিকটা চাপ দিলে ফাঁক হইয়া যায়। শ্রীশ্রীপ্রভু ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণ মাত্র ঐ ফাঁক দিয়া শ্রীহস্ত পাতিলেন।

ভাগ্যবতী দেবী পরম অনুরাগে এক একটি করিয়া সন্দেশ শ্রীহস্তে দিতে লাগিলেন, আর কৃপাময় তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে সব সন্দেশ দেওয়া হইলে জল দিবার জন্য দেবী নিজের আহ্নিকের তাম্রটাটে গঙ্গাজল দিয়া দরজার নীচ দিয়া ঠেলিয়া দিলেন। আচমন শেষ হইল।

"এতেই নরক হবে না"

চম্পটী ঠাকুর আসিলেন। দরজা খুলিয়া দিলেন। ফর্দ্দের সব দ্রব্যাদি প্রভুর সমীপে সাজাইয়া দিলেন। প্রভু প্রত্যেকটি দ্রব্যে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীকরের স্পর্শ দ্বারা সব দ্রব্য গ্রহণ করতঃ বন্ধুসুন্দর হঠাৎ বলিলেন, আমি এখনই যাব। যাব। পাল্কী আন। চম্পটী ঠাকুর পাল্কী আনিতে গেলেন।

সুরতকুমারী জানিতেন, শ্রীশ্রীপ্রভু স্বেচ্ছাময়। যখন যাহা বলেন তাহার অন্যথা করিবার কাহারও সামর্থ্য থাকে না।

তিনি যখন এখন যাবেন বলিয়াছেন, তখন আর থাকিতে অনুনয় করিয়া লাভ নাই।

সুরতের মনে একটা সাধ ছিল অনেকদিন যাবত্। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মাথায় ধরিবেন। একবার মনে করেন, বলি, আবার মনে করেন, ধরি। কিন্তু কিছুই করা হয় না। চম্পটী ঠাকুর গাড়ী লইয়া আসিলেন। আহা! এখনই ত চলিয়া যাইবেন—ঐ পাদপদ্ম মাথায় ধরা আর হবে না।

প্রভু খাটের উপর বসিয়াছিলেন। সুরত হাঁটু গাড়িয়া প্রণতা হইলেন। প্রভু তখন পায়ে শ্রীপাদুকা পরিধান করিয়াছেন, রওনা হইবার জন্য। প্রাণের দেবতা সুরতের প্রাণের আর্ত্তি জানিতে পারিয়াই পাদুকা সহ পদযুগল তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন।

দেবী বলিলেন, "প্রভু, যদি কৃপা করিলেন, তাহা হইলে পাদুকা খুলিয়া রাঙা পা দুটি মাথায় দেন।" বন্ধুসুন্দর হাসিভরা মুখে কহিলেন—"এই যথেষ্ট। ইহাতেই নরক ভয় আর যম যন্ত্রণা থাক্‌বে না। শুধু মৃত্যু হবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম স্পর্শে সুরদেবীর সমস্ত শরীরে তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। যেন একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। প্রভু পাল্কীতে উঠিয়া সুরতকুমারীর ভাড়া করা বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন।

———

ডাঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
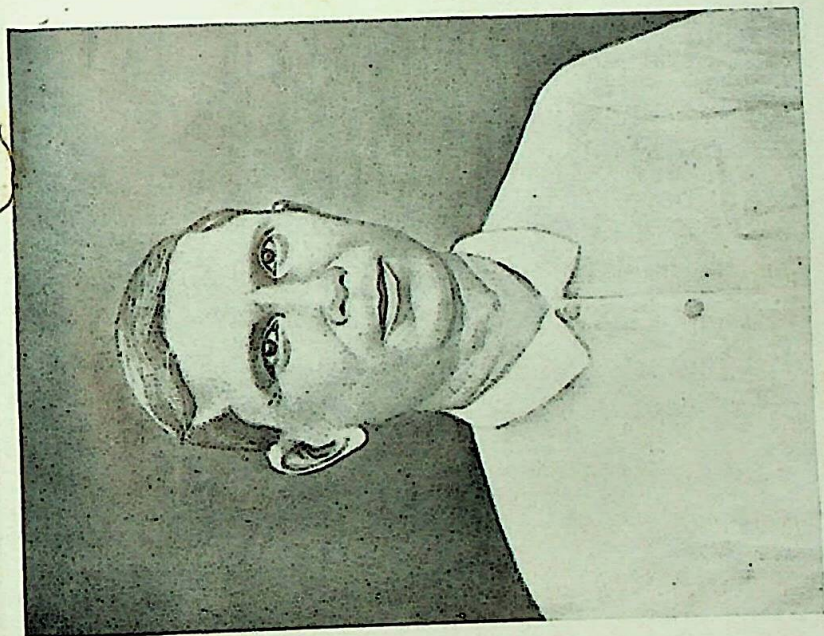
পূর্ণ সুধার পানিফল

সুরতকুমারীর ভাড়া-করা বাড়ীতে, শেঠের বাগানে শ্রীশ্রীপ্রভু আছেন। সেবক আছেন তারকনাথ। চম্পটী ঠাকুরের আনুগত্যে সেবা করেন।

ঢাকা হইতে পূর্ণচন্দ্র কলিকাতা আসিয়াছেন। কয়েকদিন পর সুধন্বও আসিয়াছেন। তুইজনে রামবাগান হরিসভায় আসিয়াছেন প্রভুর অনুসন্ধানে। কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে প্রভুর অবস্থিতি স্থান জানিয়া লইলেন।

সুধন্ব বলিলেন, "পূর্ণ, স্বপ্নে প্রভু পানিফল চেয়েছেন।" তুইজনে নূতন বাজারে গিয়া পানিফল ও আম কিনিয়া লইয়া প্রভুর দর্শনে গমন করিলেন। গিয়া দেখেন বাহিরের দরজাতে তালা বন্ধ। প্রভু আছেন দ্বিতলে একটি প্রকোষ্ঠে।

ভক্তদ্বয় যখন প্রভুর দর্শনে নিরাশ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন, তখনই প্রভু দ্বিতল হইতে নীচে নামিয়া সদর দরজায় আসিয়া, ভিতর দিয়া খিল খুলিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে তালা বন্ধ থাকায় দরজা একেবারে খুলিল না, খানিকটা ফাঁক হইয়া গেল।

দরজার ফাঁক দিয়া বন্ধুসুন্দর পূর্ণ ও সুধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সুধন্বকুমার পানিফলের খোসা ছাড়াইয়া প্রভুর হাতে দিতে লাগিলেন। প্রভু দরজার ফাঁক দিয়া ভক্তদের দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলই গ্রহণ করিলেন। সকল গ্রহণ করিয়া প্রভুবন্ধু ধীরে ধীরে নিজ দ্বিতল প্রকোষ্ঠে উঠিয়া গেলেন।

পূর্ণ ও সুধন্ব বেড়াইতে বেড়াইতে তখন রামবাগান হরিসভায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন চম্পটী মহাশয়, তারকনাথ, নবদ্বীপ দাস সবাই সেখানে আছেন। পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্ব তাহাদিগকে বলিলেন, "আমারা প্রভুর দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

সব ভক্তগণ মিলিয়া প্রভুর স্থিতি স্থানে আসিলেন। গেটের তালা খুলিতেই পানিফল ও আমের খোসা দেখিয়া চম্পটী মহাশয় বলিলেন—"তোমরাই বুঝি এসে এই সব দ্রব্য প্রভুকে খাওয়াইয়া গিয়াছ।" ভক্তদ্বয় মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিলেন।

তারকনাথ বলিলেন, "চম্পটী মহাশয়, অন্য কোথা হইতে কেউ খেয়েও ত ফেলে যেতে পারে!" চম্পটী বলিলেন, "নারে এযে প্রভুর খাওয়া দেখলেই বোঝা যায়।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ তুলিয়া নিলেন। তার নিকট চাহিয়া নবদ্বীপ দাস নিলেন, পূর্ণ ও সুধন্বকুমারও নিলেন। তারকের মনে একটু সংশয় থাকিলেও চম্পটীর হাত হইতে নিলেন।

চম্পটী মহাশয় তখন তারককে বলিলেন—ঢাকার ভক্ত এই পূর্ণ ঘোষ ও সুধন্ব সরকারকে নিয়া যাও, প্রভুর কাছে। তারকচন্দ্র তাহাদিগকে লইয়া প্রভুর কাছে আসিয়া দরজা খুলিলেন। প্রভু তখন, "কেরে পূর্ণ এসেছিস, সুধা এসেছিস, ভাল আছিস তো রে," এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে তাহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে তার কোন লক্ষণ প্রভুর কথার মধ্যে পাওয়া গেল না।

রঙ্গনটবরের রঙ্গের খেলায় তখন তারকনাথের সংশয়

বাড়িল। প্রভুর কথা তারকের মুখে শুনিয়া চম্পটী ও নবদ্বীপ দাসেরও সংশয় হইল—তবে এ পানিফল ও আম কে খাওয়াইল ?

রঙ্গীয়ার রঙ্গের খেলা দেখিয়া পূর্ণ ও সুধা বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বসিয়া গম্ভীর ভাবে রহিলেন। শেষে গঙ্গার তীরে গিয়া দুইজনে প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইলেন।

সুধন্বকুমার রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে চলিয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র অপর একদিন চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গে বিপিনবিহারীর বাসায় গেলেন। বিপিনবিহারীর অনুজ পুলিন বিহারী খুব বিলাসী বাবু ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় ও আলাপে পুলিনবিহারী বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। এতদিন তাহার যেন ধারণা ছিল, প্রভুর ভক্ত সবই নেংটীপরা বৈরাগী। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে আলাপে জানিলেন যে, অধিকাংশ ভক্তই গৃহাশ্রমী। পূর্ণচন্দ্রের প্রভুর প্রতি অনুরাগের প্রগাঢ়তায় পুলিনবিহারী প্রভুর মাধুর্য্য নিবিড়তর ভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি প্রভুর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন।

বন্ধুসুন্দরের নিজজন

শ্রীমান্ সুধন্বকুমার যখন পুরী রওনা হইতেছেন, শ্রীবন্ধুসুন্দর তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "পুরীতে গিয়া চরণ দাস বাবাজীর দর্শন করিস।" চরণ দাস বাবাজী কে, সুধন্ব জানিতেন না। মনে করিলেন, তিনি যেই হউন গিয়ে খোঁজ লইব।

পুরীতে গিয়া সুধন্বকুমার তাহার এক বন্ধুর বাসায় উঠিয়াছেন। বন্ধুটী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার হিন্দুধর্ম্মে তেমন শ্রদ্ধা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট। সুধন্বকুমার রথযাত্রার পরে পোঁছিয়াছিলেন। গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শন ও উল্টারথে দড়ি টানিবার ভাগ্য তাহার হইয়াছে। রথে আনন্দে ডুবিয়াছেন। স্বপ্নের কথা মনে নাই।

ব্রাহ্ম-বন্ধুর সঙ্গে পথ চলিতেছেন। হঠাৎ বন্ধুটী বলিলেন, ঐ যে মঠ দেখ্‌ছেন ওখানে এক সাধু থাকেন। তিনি নাকি শ্বাসে শ্বাসে নাম করেন। সুধন্ব তাহার নামটী জানিতে চাইলে ব্রাহ্ম-বন্ধু বলিলেন, "চরণ দাস বাবাজী।" চম্‌কে উঠিয়ে সুধন্ব বলিলেন, চলুন দর্শন করিয়া আসি। ব্রাহ্ম-বন্ধু রাজী হইলেন না। সুধন্ব তাহাকে বিদায় দিয়া একাকী মঠে ঢুকিলেন।

দূর হইতে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া সুধন্ব যেই প্রণাম করিয়াছেন, অমনি বাবাজী মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া সুধন্বের গলায় জড়িয়া ধরিলেন। মধুর স্বরে কানের কাছে কহিলেন, "প্রভু কেমন আছেন বাবা!"

সুধন্ব মনে করিলেন, বাবাজী মহাশয় বোধ হয় জগন্নাথ দেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি উত্তর করিলেন,

"প্রভু জগন্নাথ রথের উপরে আছেন, ফিরা রথ প্রায় অর্দ্ধেক পথে আসিয়া গিয়াছে।" বাবাজী মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না গো, জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা জিজ্ঞাসা করছি," সুধন্ব বলিলেন, "তাই তো বল্‌ছি, তিনি ফিরারথে মন্দিরে ফিরছেন।"

বাবাজী মহাশয় যেন উদ্বিগ্ন হইয়া আর একটু উচ্চতর সুরে কহিলেন, "ওগো ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা জিজ্ঞাসা করছি, কথা একবারে বুঝ না কেন?"

বাবাজী মহাশয়ের মুখে তাহার প্রাণের দেবতার নাম শুনিয়া সুধন্বের অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "প্রভু ভাল আছেন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আরতি দর্শন করে যাইও।" তাহার নিজের ভক্তদের বলিলেন, "ইনি প্রভুর ভক্ত, ইহাকে যত্ন ও সম্মান করিও।"

সন্ধ্যারতির সময় সুধন্ব দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন, বাবাজী মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার হাতের আঙ্গুলের মধ্যে নিজের আঙ্গুল ঢুকাইয়া দৃঢ়ভাবে বক্ষের সহিত জড়াইয়া ধরিলেন, ইহাতে সুধন্বকুমার ভাবাবিষ্টের মত হইয়া গেলেন। তিনি তখন বাবাজী মহাশয়ের চারিদিকে একটা কীর্ত্তনের রোল শুনিতে পাইলেন। বস্তুতঃ তখন কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুধন্ব প্রকৃতিস্থ হইলে বাবাজী মহাশয় তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে আবার প্রভুর কথা কহিলেন। তাহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া সুধন্ব বুঝিলেন, এই মহাপুরুষ বন্ধুসুন্দরের অতি নিজজন।

"আমি ষোল আনাই চাই"

বন্ধুসুন্দর কলিকাতা চাবাধোপাপাড়া এক ভক্তগৃহে আছেন। পূর্ণচন্দ্র কয়েকটি আম লইয়া গিয়াছেন। প্রভু ভিতরের ঘরে ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

হঠাৎ প্রভু বাহির হইয়া কহিলেন, "পূর্ণ, তোমাকে এক ঘণ্টা থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া নিজ শ্রীহস্তে একটি আম গ্রহণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পর একখানা কাগজ লিখিয়া লইয়া আসিলেন।

নিত্য সেবা নিয়ম সেবা প্যাখ দিবা
ডজন নোট মানিঅর্ডার সদা
পেপার ফরিৎপুর আঙ্গিনা চালাইবা
রাজভয় কালভয় যমভয় সদা

কাগজখানা পূর্ণের হাতে দিয়া প্রভু নিজ শ্রীহস্তে আর একটি আম লইয়া গেলেন। এইরূপে পর পর পনর ষোল খানা কাগজ লিখিয়া দিয়া পনর ষোলটা আম নিয়া গেলেন। শেষে বলিলেন "পূর্ণ এখন যাও।"

অপর একদিন পূর্ণ আসিলে, শ্রীশ্রীপ্রভু ফর্দ্দ লিখিয়া দিলেন —"কাপড় চাদর জুতা, পাঁচশত টাকা।"

পূর্ণ বলিলেন, "কাপড় চাদর ও জুতা দিব। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাইব" শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন, "পূর্ণ, আমি যা চাই তা একালে দিও, আমি যা চাই তা দ্বিকালে দিও, আমি যা চাই

তা ত্রিকালে দিও, আমি যা চাই তাহা চৌকালে দিও। না দিতে পারলেও দুঃখ করিওনা। আমি ত ষোল আনাই চাইব। তোমরা যা পার তাই দিও।"

চম্পটীর ভিক্ষার ঝুলি

প্রেমের পাগল চম্পটী ঠাকুর পথে পথে নাম করিয়া বেড়ান। কাঁধে ঝুলি। হাতে করতাল। মুখে হরি হরিবোল।

চম্পটীর কঠোর বৈরাগ্য দেখিলে দাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। ঘরে সুন্দরী ভার্য্যা, রত্নসমা কন্যা, গৃহে বিপুল ঐশ্বর্য্য, বংশ মর্য্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সব তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে বন্ধু-প্রেমের প্রখর স্রোতে।

হঠাৎ চম্পটীকে ডাকিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "অতুল দুই শত টাকা চাই।" চম্পটী ভাবিলেন, এত টাকা এখন কোথায় গেলে পাব। প্রভুকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা ত চাই। কার কাছে যাব? সুরুর কাছে, না গৌরীবাবুর কাছে? প্রভু বলিলেন, "গৌরীর কাছেই যাও।"

গৌরীশঙ্কর দে খ্যাতনামা অঙ্কের অধ্যাপক। চম্পটী মহাশয় তাহার ছাত্র ছিলেন। তিনি চম্পটী মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। চম্পটীও মাঝে মাঝে প্রভুর সেবার জন্য তাহার নিকট হইতে অর্থাদি আনিতেন। এই সকল অর্থ দ্বারা অধিকাংশ সময়ই শ্রীশ্রীপ্রভু খোল করতাল কিনিয়া বিতরণ করিতেন।

গৌরীবাবুর নিকট হইতে কিছুদিন পূর্ব্বেই চম্পটী কিছু টাকা নিয়াছেন। আজ টাকা নাও দিতে পারেন। তাই চম্পটী মহাশয় প্রভুকে বলিলেন, "এই ত সেদিন গৌরী বাবুর নিকট হইতে টাকা আনিলাম, আজ আবার টাকার জন্য গেলে তিনি চটে উঠবেন।" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, যদি চটে উঠে তা'হলে বলবে, "সামান্য কারণে সমুদ্র কখনও উদ্বেলিত হয় না।" চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "যদি বলে টাকা নাই।" প্রভু বলিলেন, "বলিস—দোতালায় তার স্ত্রীর হাত বাক্সে তুই শ টাকা আছে।"

এইবার চম্পটী ঠাকুর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ঝুলাইয়া করতাল বাজাইয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ছুটিলেন।

চম্পটী ঠাকুর গৌরীবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া দেখেন, তিনি তখনও কলেজ হইতে ফিরেন নাই। বাসার সম্মুখে একটি ঘাসের মাঠ ও ফুলবাগান ছিল। চম্পটী ঠাকুর করতাল বাজাইয়া বাজাইয়া মাঠের উপর নাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একটু পরেই গৌরীবাবু বাসায় ফিরিলেন। হাতে গালে চক মাখা, জামায় বোতাম লাগান নাই অঙ্ক-শাস্ত্রের ঋষি দার্শনিকের মত ঢুলিতে ঢুলিতে বাসায় প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় চম্পটীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভিতরে গেলেন।

চম্পটী গৌরীবাবুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এতভাল ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়া এইরূপ বৈরাগীর মত করতাল বাজাইয়া বেড়ায়, ইহা তাহার পরম দুঃখ। তবুও প্রীতির টান নষ্ট হয়

নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অতুল, আজ আবার কী মনে করিয়া? চম্পটী সভয়ে বলিলেন, "দুই শত টাকা প্রভুর প্রয়োজন।"

গৌরীবাবু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "টাকা গাছের ফল আর কি? ঝাকি দিলেই পড়বে! এই ত সেদিন টাকা নিয়ে গেলে। তোমার প্রভু ট্রভু আমি বুঝি না। আমি টাকা দিব না।"

চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন, সামান্য কারণে সমুদ্র কখনও উদ্বেলিত হয় না।" এই কথা কয়টি যেন মন্ত্রের মত কাজ করিল। গৌরীবাবুর ক্রোধের মূর্ত্তি মূহূর্ত্তে শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন ধীর শান্ত ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন, "টাকা আমার নাই।"

চম্পটী মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন—দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আপনার স্ত্রীর হাত বাক্সে দুইশ টাকা আছে।" গৌরীবাবু বাললেন, "সে টাকা আমার নয়।" চম্পটী বলিলেন, "সে টাকা আপনার কি না, তাহা জানি না। প্রভু বলিয়াছেন টাকা আছে, এই মাত্র জানি।"

গৌরীবাবু ভিতরবাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া একশত টাকার দুইখানা নোট দিয়া বলিলেন, "এই নাও, তোমার প্রভুকে বলিও আর যেন শীগ্‌গীর টাকা চেয়ে না পাঠান।" চম্পটী মহাশয় নীরবে নোট দুখানি তুলিয়া ঝুলির মধ্যে রাখিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন।

প্রভুর নিকটে আসিয়া ঝুলি হইতে টাকা বাহির করিয়া প্রভুর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নেও তোমার দু'শ টাকা। গৌরীবাবু বলেছেন, শীগ্‌গীর আর তার কাছে যেন টাকা চাওয়া না হয়।"

প্রভু টাকার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কই, দুইশত টাকা কোথায়? এ যে একশত টাকার একখানা নোট।" চম্পটী তুলিয়া ভাজ খুলিয়া দেখিলেন একখানাই বটে। অথচ গৌরীবাবু যখন টাকা দিয়াছিলেন তখন তিনি দুইখানা নোটই ভাল করিয়া দেখিয়া নিয়াছিলেন। চম্পটী, তখন কি হইল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রভু বলিলেন, "আবার গৌরীর বাড়ী পর্য্যন্ত যাও।"

চম্পটী পুনরায় করতাল বাজাইয়া নাম করিতে করিতে গৌরীবাবুর বাড়ীতে পেঁছিলেন। পৌঁছিয়া দেখেন, গৌরী-বাবু বাড়ীর সম্মুখে পায়চারী করিতেছেন। চম্পটীকে দেখিয়াই বলিলেন, "বোরেগী হয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে?" টাকা ঝুলিতে রাখতে একখানা পড়ে গেল, সেদিকে লক্ষ্য নাই। ভাগ্যিস্ আমিই পেয়েছিলুম।" ইত্যাদি মৃদু তিরস্কার করিয়া চম্পটীর বহির্ব্বাসের আচলে নিজেই ভাল করিয়া নোটখানা বাঁধিয়া দিলেন।

চম্পটী মহাশয় প্রভুর নিকট সব কথার বর্ণনা দিয়া টাকা প্রভুকে দিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "অতুল, খোল করতাল কিনিয়া রামবাগানে উৎসব কর।"

"তোর অশ্রদ্ধার দান প্রভু নেন নাই"

অপর একদিন চম্পটী, প্রভুর প্রয়োজনে টাকা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। দুই টাকা পাঁচ টাকা করিয়া অনেক স্থানে কুড়াইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশেষে নিজ ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের বাসায় গিয়া তার কাছে টাকা ভিক্ষা চাহিলেন।

মামা বৈরাগী হইয়াছেন বলিয়া সুরেশের মন বিরূপ ছিল। তিনি কঠোর ভাষায় বলিলেন—আপনার প্রভু নাকি ভগবান। ভগবানের আবার টাকা ভিক্ষায় দরকার কি? টাকা আমি দেবো না।"

চম্পটী বলিলেন, "দে রে কিছু দে, প্রভুর সেবায়—তোর মঙ্গল হবে,"—বারংবার চাহিতে চাহিতে সুরেশ একটা টাকা মাত্র চম্পটীকে দিলেন।

টাকাটী ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া চম্পটী হরি-হরিবোল বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করতঃ চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর কাছে গিয়া সবগুলি টাকা দিলেন। শ্রীপ্রভু টাকাগুলি একটী থালায় ঢালিলেন। নিজ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে একটী নেকড়া জড়াইয়া টাকাগুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া একটা টাকা ধরিয়া তুলিলেন।

টাকাটা হাতে দিয়া বলিলেন, "অতুল এই টাকাটা সুরেশকে দিও।" চম্পটী টাকাটা লইয়া তখনই ছুটিলেন। জানালা দিয়া ভাগিনেয় সুরেশের গায়ে টাকাটা ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'নে, তোর টাকা। তোর অশ্রদ্ধার দান প্রভু নেন নাই।"

কেউ তো তোমাকে চিনল না

একদিন মধ্যাহ্ন বেলা শ্রীশ্রীপ্রভু আসিয়া রামবাগান হরি-সভা গৃহে বসিয়াছেন। এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে চম্পটী ঠাকুর আসিয়া প্রভুর পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন।

শ্রীচরণতলে কাঁধের ঝুলিটি ও হাতের করতাল রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"এই ন্যাও তোমার ঝোলা, এই ন্যাও তোমার করতাল। আমা দ্বারা আর কিছুই হবে না। আমি আর এত ছুটাছুটি করতে পারবো না।"

"কী আশ্চর্য্য ! যারা কথাটি পর্য্যন্ত বলতে সাহস করতো না—তারা কিনা গায়ে থুথু দেয়। বন্ধুবান্ধবেরা পাগল বলে, উপহাস করে। আমিও কয়েকদিন ধরে ভাবছি—সত্য সত্যই জীবনে হল কি ?

তুমিই বা করছো কি ? হরিনামে বিশ্বাস-ভক্তি কারো দেখছি না। তুমি এত বড় প্রভু, তুমিই বা করলে কী ? কেউ তো তোমাকে চিনল না !"

"প্রলয়কাল কীর্ত্তন সত্য"

চম্পটী ঠাকুরের নৈরাশ্যময় ভাবোচ্ছ্বাস শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু কিছু সময় নীরব রহিলেন। তারপর ধীর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"অতুল, সময়! সময়!! সময়!!! দেখছিস না, এমন যে দুর্দ্দমনীয় ইংরাজ, তারাও দিন দিন কেমন শীর্ণ বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটি গাছ যখন বাড়ে, তখন কি তোরা বুঝতে পারিস প্রতিদিন কতটুকু করে বাড়ছে? শেষে অনেকদিন পরে দেখিস, কত বড় হয়েছে। আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ইচ্ছা উদ্দেশ্য তোরা কতটুকু বুঝবি?

অমন পাগলামী করতে নাই! শান্তভাবে হরিনাম করতে থাক। এটি প্রলয়কাল, কীর্ত্তন সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেউ হরিনাম করুক না করুক তাতে তোর কি আসে যায়! অবিচারে যেখানে সেখানে হরিনাম করে বেড়াবি।"

"রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ শ্রাদ্ধের সময়। শেষরাত্রে যাতে সকলে হরিনাম শুনতে পায় তা করবি। হরিনাম শুনলেই জীবের কল্যাণ হবে। সবাই হরিনামের ভিখারী সেজে বসে আছে। দেখবি শীঘ্রই স্থান-বিশেষে হরিনামের একটি বিশেষ শক্তির প্রকাশ হবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখে এইপ্রকার ভরসার কথা শুনিয়া চম্পটী ঠাকুর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় প্রভু, কোথায়

প্রভু, কোথায় বিশেষ শক্তির প্রকাশ হবে?" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "তোদের এই কলকাতায়।" কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখবি, শিশিরের দ্বারা এবার হরিনাম প্রচারের অনেক সহায়তা হবে।"

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু একখানি কাগজে কয়েকটি বাণী লিখিয়া উহা শিশিরকুমারের হাতে দিয়া আসিবার জন্য চম্পটীকে আদেশ করিলেন। চম্পটী ঠাকুর পত্র দিয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে আর হরিসভা গৃহে দেখিতে পাইলেন না। প্রভু যে চাটাইয়ের আসনখানিতে বসিয়াছিলেন, উহা প্রভুর জন্যই স্বতন্ত্র থাকিত। চম্পটী ঠাকুর ঐ চাটাই উঠাইয়া রাখিবার জন্য তুলিতেই দেখিলেন, একটী ছোট খাতা পড়িয়া আছে। উহা খুলিতেই দেখিলেন, শ্রীহস্তে লেখা আছে—

ভক্তের লিষ্ট—

লর্ড কার্জ্জন, শিশির ঘোষ, দ্বারিক মিত্র, যতীন ঠাকুর।

নামগুলি বড় বড় অক্ষরে লেখা। চম্পটী ঠাকুর ইহার ভাবার্থ তখন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সূক্ষ্ম জগতে কোনও একটা কার্য্যের আয়োজন চলিতেছে ইহা অনুভব করিলেন মাত্র।

এই কথাবার্ত্তার পর চম্পটীর জীবনে আবার নূতন উদ্যম আসিল। পূর্ণ উৎসাহে হরিনাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্যাম ডাক্তারের কথা

শ্রীশ্রীপ্রভু রামবাগানে আছেন। একদিন কোন এক বিদেশাগত ভক্ত শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, অনেকক্ষণেও মূর্চ্ছা ভাঙ্গে না, চম্পটী মহাশয় কিছু চিন্তিত হইয়া প্রভুকে বলেন, "তবে কি ডাক্তার ডাকবো।" শ্রীশ্রীপ্রভু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল মনে হয় ডাক।"

শ্যামবাজারের মোড়ে থাকেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্যাম ডাক্তার। তাহাকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রোগীর দিকে একবার তাকান। অতঃপর ঔষধের বাক্স খুলিয়া চক্ষু বুজিয়া একদাগ ঔষধ দেন। রোগী তাহাতেই ভাল হইয়া যায়।

চম্পটী মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, "ডাক্তারবাবু চক্ষু বুজিয়া ঔষধ দিল কেন?" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "ওযে ভক্ত। ও শেষরাত্রে ছাদের উপর বসিয়া কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে।"

চম্পটী মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ, ডাক্তারের বাহিরে ভক্তের লক্ষণ তেমন কিছু দেখা যায় না, এইরূপ ভক্তের সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহে চম্পটী মহাশয় পরদিন ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলেন, "আর এলেন না কেন?" চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "রোগী ভাল হইয়া গিয়াছে তাই। আচ্ছা, আপনি চক্ষু বুজিয়া ঔষধ দিলেন কেন?"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, স্বয়ং প্রভু যাহার সামনে দাঁড়াইয়া, তাহাকে আর কি ঔষধ দিব! নেহাৎ ডাকিয়াছেন

তাই দিলাম। চক্ষু বুজিয়া দিলাম, যাহাতে আমার কর্ত্তৃত্ব না থাকে। ডাক্তার বাবুর উত্তরে চম্পটী মহাশয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা শ্যামবাবু, আপনি কি শেষ রাত্রে ছাদের উপর বসিয়া কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদেন?" ডাক্তার গম্ভীর হইয়া উত্তর করেন, "কিরূপে জানিলেন?"

চম্পটি মহাশয়, বলিলেন, "প্রভু নিজে বলিয়াছেন।" তাহার এই গোপন-ভজনের কথা শ্রীশ্রীপ্রভু জানেন শুনিয়া ডাক্তারের শরীরে একটা কম্পন দেখা গেল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, পকেট হইতে তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া তিনি চক্ষু চাপিলেন।

এই সব ভক্তের লক্ষণ দর্শন করিয়া চম্পটী ঠাকুর হরি হরি বলিয়া উচ্চৈস্বরে আনন্দ-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

আট দফা ফর্দ্দ

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটী ঠাকুরকে কহিলেন, "অতুল, তুমি ঠাকুরবাড়ী যাও।" অতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ঠাকুর-বাড়ী? পাথরিয়াঘাটার, না জোড়াশাঁকোর।" "জোড়া-শাঁকোর" এই বলিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু একটি নীল পেন্সিল দ্বারা একখণ্ড কাগজে লিখিলেন,—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
নিম্নলিখিত বস্তু প্রয়োজন

১। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ
২। পিতলের সিংহাসন
৩। পঞ্চপাত্র
৪। পঞ্চপ্রদীপ
৫। একপ্রদীপ
৬। জলশঙ্খ
৭। বাদ্যশঙ্খ
৮। ধূনচি, ধূপধূনা

ইত্যাদি

প্রভু জগদ্বন্ধু
রামবাগান

ফর্দ্দ লিখিয়া চম্পটীর হাতে দিয়া বলিলেন—"এই ন্যাও, যাও, দেবেন্দ্রের হাতে দিও। দ্বিপেন্দ্রকে বলিও, সে যেন ইহা পাইয়া নিজেই ডিগ্রী কিংবা ডিস্‌মিস্ না করে।"

প্রভুর কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ আট দফা বস্তু তাহার প্রয়োজন, কিন্তু উহা দ্বিপেন্দ্র কিনিয়া দিলে হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য, যিনি মূর্ত্তি পূজা মানেন না, তাহার নিকটেই শ্রীমূর্ত্তি ও মূর্ত্তি-পূজার দ্রব্যাদি চাই।

চম্পটী ঠাকুর জোড়াশাঁকো উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে যাইয়া কাগজখানা দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিলেন—"এই কাগজখানা এখনই দেবেনবাবুর নিকট দিবেন।"

দ্বিপেন ঠাকুর কাগজখানা পড়িয়া বলিলেন, "কি চম্পটী মহাশয়, আপনাদের প্রভুর বাজার করে দিতে হবে নাকি ?"

চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন, এ ফর্দ্দখানা যেন দেবেন্দ্রের হাতে পড়ে। দ্বিপু যেন এটা পেয়ে ডিগ্রী কিংবা ডিস্‌মিস্ না করে।"

দ্বিপেন্দ্র ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া কাগজখানা দেবেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চম্পটী মহাশয়কে পর দিবস বেলা ৯ টায় আসিতে বলিলেন।

চম্পটী মহাশয় পরদিন যথাসময়ে পৌঁছিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন। চম্পটী মহাশয় ঐ প্রশ্ন লইয়া প্রভুর নিকট গিয়া তাহার উত্তর জানিয়া লইলেন। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন ব্যাপী প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচিত হইল।

আলোচনাটি চলিল বাস্তবে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রভু বন্ধুসুন্দরের মধ্যে—কিন্তু মাঝে থাকিলেন চম্পটী ও দ্বিপেন ঠাকুর।

শ্রীশ্রীপ্রভু যে দেবেন্দ্রনাথের কাছে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ ও সেবার দ্রব্যাদি চাহিয়াছেন—তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব ও সেবার প্রয়োজনীয়তা না বুঝিয়া লইয়া উহা কিনিয়া দিবেন না। আর ঐ তত্ত্ব তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া তাহার নিকট সেবার দ্রব্য আদায় করাই প্রভুর অভিপ্রায়। বলাবাহুল্য, আলোচনান্তে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিপেন্দ্রনাথকে দিয়া প্রভুর বাজার করাইয়া দিয়াছিলেন।

কয়েকদিন যাবত্ যে ধর্ম্মালোচনা চলে, তাহার সার মর্ম্ম চম্পটী ঠাকুর পরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। "আদি ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার—মহর্ষি সম্বাদ" এই শিরোনাম দিয়া চম্পটী মহাশয় উহা ছাপা করেন ১৩০৭ সনের ১৮ই মাঘ সাধারণ সমাজ প্রেসে।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত "জগদ্গুরু মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ ছাপা গ্রন্থের কয়েক স্থানে চম্পটী মহাশয় স্বহস্তে কিছু কিছু লেখা যোগ বিয়োগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সংশোধিত গ্রন্থ হইতেই নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

——·——

আদি ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার

মহর্ষি সম্বাদ

প্রথম দিন

* ব্রাহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে পরমাত্মা ধ্যান করিতেছেন।

† বৈষ্ণব। দশম স্কন্ধোক্ত ব্রজলীলা ভিন্ন সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বাসুদেব সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় দিন

ব্রাহ্ম। বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু ?

বৈষ্ণব। না, ভিন্ন। নামভেদে বস্তুভেদ। বাসুদেব পরমাত্মা ধ্যান করিতেছেন একথা সত্য। কৃষ্ণ সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ব্রাহ্ম। কৃষ্ণ ও বাসুদেবে ভিন্নতা কত ?

বৈষ্ণব। বেদ ও বাইবেলে ব্যবধান যত।

ব্রাহ্ম। তবে বাসুদেব কে আর কৃষ্ণই বা কে ?

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রেরিত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

† শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু প্রেরিত অতুলচন্দ্র চম্পটী

বৈষ্ণব। বাসুদেবের পদবী প্রথমে হ'ক। কৃষ্ণের কথা পরে হবে।

মঞ্জু ... মীন অবতার
|
কম্বু (ধ্যেয়) ... কূর্ম্ম
|
বিষ্ণু " ... রামচন্দ্র
|
জিষ্ণু " ... বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ নহেন)
|
বিধু " .... নারায়ণ
|
বিরাট " ... পালনকর্ত্তা
|
তুরীয় " ... অস্ত্ররূপী
|
ব্রহ্ম " ... মন্ত্ররূপী
|
পরমাত্মা ... স্রষ্টা

সংকর্ষণ = লক্ষ্মণ = বলরাম = নিত্যানন্দ

উল্লিখিত তালিকা বুঝিলে বাসুদেব ও পরমাত্মার পদবী পর্য্যায় (Relative Position) দর্পণের মত পরিষ্কার হবে।

আপনারা অবতার মানেন ?

ব্রাহ্ম। হাঁ। জগতে সময় সময় মহাপুরুষগণ আসিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া যান।

বৈষ্ণব। তা হলেই হ'ল। প্রথম অবতার মীন।

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
কেশব ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

মঞ্জু মীন অবতার হয়। মঞ্জু বিষ্ণু-লক্ষণাক্রান্ত দেবতা। মঞ্জুর ধ্যেয় বস্তু কম্বু, কুর্ম্মাবতার। কম্বুর ধ্যেয় বস্তু বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র অবতার। বিষ্ণুর ধ্যেয় বস্তু জিষ্ণু, বাসুদেব, বসুদেব সুত। ইনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন। জিষ্ণুর ধ্যেয় বস্তু বিধু, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। বিধুর ধ্যেয় বস্তু বিরাট, পালনকর্ত্তা। যাহার শীর্ষদেশ উচ্চ নভঃস্থলে। পাদদেশ সপ্ত পাতালের নিম্নদেশে এবং নাভিদেশ এই মর্ত্ত্যলোকে। সৃষ্টির এই বিরাট মূর্ত্তি। বিরাটের ধ্যেয় বস্তু তুরীয়। অস্ত্ররূপী, সংহার কর্ত্তা। তুরীয়ের ধ্যেয় বস্তু ব্রহ্ম, মন্ত্ররূপী ওঁ ক্লীং হ্রীং প্রভৃতি প্রণবযুক্ত শব্দ। ব্রহ্মের ধ্যেয় বস্তু পরমাত্মা স্রষ্টা। পরমাত্মার অপর নাম পরব্রহ্ম। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত মতভেদ নাই।

বাসুদেব ও পরমাত্মার পর্য্যায় ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পরমাত্মা বাসুদেবের ধ্যেয় বস্তু। এই পরমাত্মাই প্রাকৃত রাজ্যের শেষ সীমা। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং স্রষ্টা হইলেও সৃষ্ট মাত্র।—মহাপ্রলয়ে লয় হয়। পরমাত্মা এক নহে, বহু। অর্থাৎ এই যেমন একটা সৃষ্টি-সংসার, তেমনি কৃষ্ণের অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসার আছে। যেমন এই সৃষ্টি-সংসারে একটি বিরাট, একটি তুরীয়, একটি ব্রহ্ম ও একটি পরমাত্মা আছে, তেমনি এই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারে অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আছে। ইহাদের প্রত্যেকের পর্ব্বতভেদ, সমুদ্রশোষণ, প্রলয় বা সৃষ্টি রচনাদিবৎ ইন্দ্রজাল বা ঐশ্বর্যাদি শক্তি আছে বটে কিন্তু পাপ-গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের আদৌ নাই। পাপ গ্রহণ ও

ভূভার হরণের জন্য—শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধারণ অবতার। শ্রীমতী (প্রকৃতি নহেন) উদ্ধারণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণ = গৌর = অযোনিসম্ভব।

অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারের অধীশ্বর, ও অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু—"কৃষ্ণ নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ।" একথা পরে পরিষ্কার হইবে।

ব্রাহ্ম। আপনি যাহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, আমরা তাহাকেই পরমাত্মা বলি।

বৈষ্ণব। তা কেমনে সম্ভবে ? পরমাত্মা সম্বন্ধে ধারণা কি ?

ব্রাহ্ম। পরমাত্মা ব্যাপ্তিরূপে বিশ্বের সর্ব্ববস্তুতে জল বায়ু আকাশ ক্ষিতি তেজ অণু অপমাণুরত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান।

বৈষ্ণব। কৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু। এটা মায়িক সৃষ্টি। মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কৃষ্ণ "একলেশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।"

ব্রাহ্ম। তবে কি কৃষ্ণ সংসারে নাই ?

বৈষ্ণব। আছেন। মায়িক সৃষ্টিতে কৃষ্ণ কেবল নাম রূপে আছেন।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

তৃতীয় দিন

ব্রাহ্ম। পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু কৃষ্ণ নামে যদি কোন ঈশ্বর থাকে, তাহাকে না দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিব না।

বৈষ্ণব—বড় ভাল কথা। প্রকৃত Practical Point. কিন্তু কৃষ্ণকে ত দেখান যায় না। কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত জগতে কেমন করিয়া আনা যাইতে পারে? দেখান যায় না বটে, কিন্তু দেখা যায়।

ব্রাহ্ম। কি উপায়ে?

বৈষ্ণব। যখন নামরূপে কৃষ্ণের স্থিতি ও নাম সংকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি, তখন এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রেমের সহিত তালে তালে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিলে মহাপ্রভুর কৃপা যাহার উপর হয়, সেই ভক্ত দেখে। দেবেনের ন্যায় ভক্ত দেখে যে, মহাপ্রভু সপার্ষদে কীর্ত্তনের মাঝে বিরাজ করিতেছেন। অতএব জগতে একমাত্র মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম সংকীর্ত্তন সত্য। কেশব (সেন) হরিনামে কিছু সার আছে বুঝিয়াই হরি সংকীর্ত্তন ধরিয়াছে।

ব্রাহ্ম। সামান্য মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি কেমন করিয়া হয়?

বৈষ্ণব। মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও মায়ার অতীত বস্তু। সুতরাং অপ্রাকৃত। "প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত" অযোনিসম্ভব।

ব্রাহ্ম। অযোনিসম্ভব কিরূপে সম্ভব?

বৈষ্ণব। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি হ'তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। যেমন অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না। এ কথায় যাহার বিশ্বাস না হবে, সে জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করাইয়া দেখিবে মহাপ্রভু অযোনিসম্ভব কিনা? চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার জ্যোতিষ জানে।

"আমি বেমালুম এই কথাতেই আমি মালুম।"

ব্রাহ্ম। কর্ত্তা বলেছেন, তিনি বাতির আলোতে ব্রহ্মদর্শন করেন।

বৈষ্ণব। বটে, তা হতে পারে। ব্রহ্ম সৃষ্টবস্তু, অস্তিত্ব আছে। দেখা যায় ও দেখান যায়। যাহা দেখা যায় ও যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই পৌত্তলিকতা। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা।

চতুর্থ দিন

ব্রাহ্ম। তিনি God's voice শুনিতে পান?

বৈষ্ণব। সেটা তার মায়া। God's voice শোনা তুচ্ছ কথা। বলিস্ Godএর লক্ষণ আমাতে আছে।

পঞ্চম দিন

ব্রাহ্ম। কৃষ্ণের রাসলীলা কি ভাল?

বৈষ্ণব। কৃষ্ণের আবার ভাল অ-ভাল কি? রাসলীলা কলুষিত (sensualised) নহে। কামগন্ধহীন প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণের ব্রজবধূ-বিহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনই মনুষ্যের হৃদ্‌রোগ কাম নষ্ট হইবার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়।

এ সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকের উত্তরই শ্রেষ্ঠ মীমাংসা।

ব্রাহ্ম। মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক কিসে?

বৈষ্ণব। সে কেবল ভক্তের ভক্তি ও বিশ্বাসে বিগ্রহসেবার আবশ্যকতা। "সেবা বিনা সাধ্যবস্তু কভু নাহি পায়।"

ব্রাহ্ম। হরিনাম কীর্ত্তন কি পৌত্তলিকতা নহে?

বৈষ্ণব। না কখনই নহে। হরি দ্বি-অক্ষর নাম মাত্র। হরিনামের কোন আকার নাই। হরিনামের কোন অস্তিত্ব নাই। হরিনাম চক্ষে দেখা যায় না। হরিনাম কাহাকেও দেখান যায় না। হরিনাম চক্ষে দেখা যায় না ও হরিনামের কোন অস্তিত্ব নাই বলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন পৌত্তলিকতা নহে।

ব্রাহ্ম। চম্পটী মহাশয়, এই নিন, কর্ত্তা আপনাকে বকশিস্ করেছেন। ১০০৲ টাকার একখানা নোট।

বৈষ্ণব। টাকা দিয়া কি হবে। প্রভুর বাজার করে দিন।

দেবেন্দ্রনাথ তখন দ্বিপেন ঠাকুরকে দিয়া প্রভুর ফর্দ্দ মত আট দফা দ্রব্য আনাইয়া দিলেন। যাহারা বিগ্রহ মানেন না, তাহাদের নিকট হইতে বিগ্রহও সেবার দ্রব্য পাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের জয় হইল, এইজন্য চম্পটী ঠাকুর হরি হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিলেন। উপরোক্ত আলোচনাটি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে সহস্র কপি ছাপাইয়া বিতরণ করিলেন। ঐ মুদ্রিত কাগজে ১৩০৭ সন ১৮ই মাঘ তারিখ ছিল।

জগন্নাথ মন্দিরে বন্ধুহরি

লীলাময়ের লীলা নিত্য অভিনব সৃষ্টি।
সেই জানে জানায় যারে করি কৃপাদৃষ্টি॥

—ধ্যানমঙ্গল

শ্রীশ্রীপ্রভু বহুতীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও নীলাচল ধামে গমন করেন নাই। ভক্তবর রমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ওখানে গেলে এ দেহ গলে যাবে।"

জগন্নাথদেবের স্বরূপটি মূলতঃ দ্বারকেশ্বর, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়। রোহিণী দেবীর মুখে নিজের কথা শুনিতে শুনিতে দ্বারকার রাজেন্দ্র ব্রজভাবে ভাবিত হইয়া বিগলিত হস্ত পদ হইয়াছেন। তাহাতে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের ভূমিকায় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের রাজত্ব বসিয়াছে। পুনরায় সেই স্বরূপে অখণ্ডভাবে একীভূত হইয়াছেন রাধাভাব কান্তিচোরা সোনার গোরা। মহামিলনে মহামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সুপ্রকট। অচল-তনু শ্রীজগন্নাথ, সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন সচল-তনু শ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দর। ভাব বিহ্বল গৌরহরি "জজ-গগ" বলিয়া এই মাধুর্য্যঘন স্বরূপকেই ডাকিয়াছেন।

তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। বন্ধুসুন্দর স্নান করিতেছেন কলিকাতা গঙ্গারঘাটে, একাকী। তীরে স্তব পাঠ করিতেছেন "নহবৎবুড়া" নামে পরিচিত এক বৃদ্ধ হরিভক্ত। বৃদ্ধ আপন মনে আবৃত্তি করিতেছেন,—

"জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে"

অক্ষরগুলি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই বন্ধুসুন্দর গম্ভীরালীলার ভাবে আবিষ্ট হইলেন। মনে হইল নীলসমুদ্রে স্নানকরিতেছি।

এখনি জগন্নাথ স্বামী দর্শনে নয়ন জুড়াইতে ছুটিতে হইবে। গোরারসে বিবশ হইয়া ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন বন্ধুসুন্দর।

যেখানে স্নান করিতেছিলেন, সেখান হইতে অল্প দূরেই জগন্নাথ দেবের একটি মন্দির বিদ্যমান। সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন বন্ধুসুন্দর দ্রুত গতিতে ছুটিয়া। স্তবপাঠকারী বৃদ্ধভক্ত বন্ধুহরির অনুসরণ করিলেন। দেখিলেন সে গমন নটন লীলা—

ঠমকে ঠমকে যায়
মৃগ আঁখি ঠারে চায়

তখন জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হইতেছিল। ঐ দিন কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বহু নরনারী ও সাধু-সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। দিব্য লাবণ্যময় বন্ধুসুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিলেই উপস্থিত সকলে দুইভাগ হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বন্ধুসুন্দর দ্বারে দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে জগন্নাথ দেবের মুখশশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নয়নপদ্ম বহিয়া সুরধুনী-ধারা অঙ্গের বসন সিক্ত করিতে লাগিল। বস্ত্রে ঢাকা অঙ্গের আড়াল দিয়া দিব্যপুলক ও ঘনঘন স্পন্দন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

মন্দিরের মোহন্ত আরতি দর্শন করিতেছিলেন। বন্ধুসুন্দরের রূপ মধুরিমা ও সাত্ত্বিক ভাবসম্পদ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। "ওরে এই তো প্রভু জগদ্বন্ধু এসেছেন, ওরে এই তো প্রভু জগদ্বন্ধু এসেছেন" বলিতে বলিতে পদারবিন্দে লুণ্ঠিত হইলেন মোহন্ত মহারাজ।

আরতি শেষে মন্দির বন্ধ হইয়া গেল। মোহন্তজী বন্ধু-সুন্দরকে বসিবার জন্য আসনপ্রদান করিলেন। বহু নরনারী সাধুসজ্জন ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই নয়ন বিস্ফারিত। মধুর স্বরে প্রভু কহিলেন, "আমার জন্য একটু পৃথক্ স্থানে কিছু খড় বিছায়ে দেন।"

মোহন্তের আদেশে কতিপয় সেবক বিশেষ যত্নের সহিত একটি স্বতন্ত্র স্থানে পরদা দিয়া ঘিরিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া পরিষ্কার খড় দ্বারা শয্যা সাজাইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু স্বীয় ভাববিহ্বল স্বর্ণতনু সেখানে এলাইয়া দিয়া স্বানুভাবানন্দে রহিলেন। মোহন্ত ধূপ গুগ্‌গুল ও পুষ্পচন্দন প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যে নবগৌরাঙ্গ, তাহা তখন তত্রস্থ অনেকের প্রাণেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় কলিকাতার বহুনরনারী শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন-লালসায় রাস্তা গলির দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু বন্ধুসুন্দর এমন সংগোপনে গাড়ী ও পাল্কীর ভিতর যাতায়াত করিতেন যে, বিশেষ কৃপাপাত্র ভাগ্যবান ছাড়া সহজে তাঁহাকে কেহ ধরিতে পারিত না। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে সে দেব অঙ্গ দর্শন বা স্পর্শন করে কার সাধ্য! দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেন।

আজ প্রেমের দেবতাকে পাইয়া দর্শন-পিপাসু বহু নরনারী তথায় ছুটিয়া আসিল ও কৃপাময়ের কৃপা-কটাক্ষে কৃতার্থ হইল। জগন্নাথ মন্দিরের সেবকবৃন্দ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেন। সে সকল তিনি গ্রহণ করিলেন না। জগন্নাথের রাজভোগের মহাপ্রসাদ এক রঞ্চ মাত্র গ্রহণ করিলেন।

স্তব-পাঠকারী নহবৎ বুড়া প্রভুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুর কুঠুরীর পর্দ্দার বাহিরে অনেকক্ষণ বসিয়া সেই লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে বলিলেন, "রামবাগানে আমার দুঃখী ডোম ভক্তেরা আছে, তুমি তাদের খবর দাও।"

বৃদ্ধ খবর দিতে চলিলেন। রামবাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রামদাসজী হরিসভা হইতে বাহির হইয়া সিঁথি অভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বৃদ্ধভক্ত তাহাকে প্রভুর সংবাদ জানাইলেন।

"আঁখমে লাগ গিয়া"

প্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া রামদাসজা যাহা করিলেন ও যাহা ঘটিল, তাহা তাঁহার নিজ মুখের ভাষাতেই বলিব।*

"একদিন নহবৎ বুড়া আমায় বলল, প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে আছেন। আমি (রামদাসজী) কথাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না। কিন্তু সে দেখে এসেছে, তাই দেখতে গেলাম। গিয়া দেখি যে, মন্দিরে ঢুকতে ডান পাশের যে গাছ আছে সেইখানে আবরণ দিয়ে প্রভু ভিতরে বসে আছেন।

আমি যাবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটি ছোকরা পর্দ্দাটি তুলে প্রভুর

---

* শ্রীনিতাইসুন্দর মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৬৪

অঙ্গের দিকে চেয়েছিল। অঙ্গের জ্যোতিতে তার চোখ ঝলসে গেছে। তাই আমি গিয়ে দেখি সে কাঁদ্‌ছে আর বলছে—

"আঁখমে লাগ গিয়া।"

আমি "তুমি তুমি" সম্বোধনে প্রভুর সঙ্গে কথা বলছি। উপস্থিত জমায়েত সাধুরা চটে গেল। "গুরুজীকা তোম অপমান কিয়া, ভাগ যাও," বলে আমায় বাহির করে দিয়ে তবে ছাড়ল।

তাই বলি যে, স্বরূপটি (শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের রূপলীলামাধুর্য্য) এমন ছিল যে, সব ভুল করে দিত। আজ কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার যুগে যদি সেই স্বরূপটিকে শুধু একবার কলিকাতা ঘুরিয়ে আনা যেত, তবে সব ঝগড়া থেমে যেত। সব চুপ হয়ে যেত।"

অমাবস্যায় চাঁদের আলো

শ্রীশ্রীপ্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর আসিয়া শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণদাসকে পুনরায় কলিকাতা পাঠাইলেন। সেবাইত হররায়কেও বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়া কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। একাই শ্রীঅঙ্গনে থাকিলেন।

একদিন অমাবস্যা তিথিতে সন্ধ্যা বেলায় ভক্তবর গৌর-কিশোর একটি কচি শশা হাতে লইয়া শ্রীঅঙ্গনে আসিলেন। প্রভুকে দেবার আগেই তিনি গৌরকিশোরের হস্ত হইতে শশাটি টান দিয়া নিলেন এবং তাহার সম্মুখেই খাইতে আরম্ভ করিলেন।

গৌরকিশোর এই মধুর দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন "গৌরকিশোর, আজ তুমি আমাকে অন্নভোগ আনিয়া দিবে।" যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময় গোয়ালচামটগ্রাম ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। বাঘ শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ে লোকে রাত্রে বাহির হইত না, ভূত প্রেতের ভয়ও যথেষ্ট ছিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু রাত্রে ভোগ আনিতে বলিলে, গৌরকিশোর মনে মনে ভাবিলেন, অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম পথে ভোগ লইয়া কিরূপে আসিব। চিন্তা করিতেই প্রভু বলিলেন, ওরে, আজ অমাবস্যা নয়, পূর্ণিমা। সরল বিশ্বাসী ভক্ত প্রভুর কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

কত রাজভোগ উপেক্ষা করিয়া যিনি চলিয়া যান, তিনি নিজ মুখে এই কাঙ্গালের কাছে ভোগ চাহিয়াছেন ভাবিতে গৌর কিশোরের প্রাণ আনন্দে বিভোর হইল। বাড়ীতে আসিয়া সহধর্ম্মিণীকে ভোগ রান্না করিতে বলিলেন। গৌরকিশোরের পত্নী ও দিদি মুক্তাদাসী পরম নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জন ভাজি রান্না করিয়া প্রভুর ভোগ সাজাইয়া দিলেন।

গৌরকিশোর ভোগের থালা ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইয়া হাতে তুলিয়া শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ঘন অন্ধকার। আকাশের ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দু বর্ষণ হইতেছে, ঝড়ের মত বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছে, রাত্রিও কম

হয় নাই। রাস্তায় জনপ্রাণী নাই। গৌরকিশোর "জয় জগদ্বন্ধু" বলিয়া একাকী চলিতেছেন।

দরবেশের পুল হইতে দেখিতে পাইলেন, শ্রীঅঙ্গনে একটি থালার মত পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে। গৌরকিশোর বুঝিলেন, প্রভু যে বলিয়াছিলেন আজ পূর্ণিমা, তাই পূর্ণিমার মত পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, প্রভুর এই খেলা।

চন্দ্রের আলোকে গৌরকিশোর কুণ্ড তীরস্থ ঝাউগাছের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এমন সময় কর্ণে প্রবেশ করিল সুধামাখা কণ্ঠের ডাক—

"গৌরকিশোর, এসেছিস্, আয়"

গৌরকিশোর আসিয়া দেখিলেন, ঝাউগাছের তলায় ভোগ লইবার মত আসন করিয়া প্রভু বসিয়া আছেন। তখনই সম্মুখে ভোগ রাখিলেন। প্রভু ভোগ গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় একটা বাঘ আসিয়া কুণ্ডের জল খাইতে লাগিল, ইহাতে চক্ চক্ শব্দ হইতেছে। গৌরকিশোর বলিলেন, "প্রভু, একটা শিয়াল জল খাইতেছে।" প্রভু বলিলেন, "নারে, বাঘে জল খাইতেছে।" গৌরকিশোর তখন ভীত হইয়া বলিলেন, প্রভু, এখন বাড়ী যাব কি প্রকারে? প্রভু বলিলেন, "যা, আমার নাম ক'রে।"

———

রজনী নাগ

"জ্ঞানদীয়া রজনী জ্ঞানশশী বন্ধু"

—স্মরণ মঙ্গল

ব্রাহ্মণকাঁদার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন একজন ঘোড়সওয়ার যুবক। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ মূর্ত্তি। হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্য হইতে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। যুবকটির নাম রজনী নাগ। বাড়ী তাহার জ্ঞানদীয়া গ্রামে। চাকুরী করেন কেষ্টপুর জমিদার ষ্টেটে। প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় প্রয়োজনে কবিরপুর যাইতেছেন ঘোড়ায় চড়িয়া।

"রজনী! রজনী!!" ডাক শুনিয়া যুবক ঘোড়া হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া কিছু না দেখিয়া মনের ভ্রান্তি মনে করিয়া আবার ঘোড়ায় উঠিতে উদ্যত হইলেন। আবার মধুর কণ্ঠের ডাক—"রজনী"!

এবার ডাকের সঙ্গে কর্ণ যেন দিক ঠিক করিয়া দিল। রজনীর স্থির দৃষ্টি পতিত হইল পার্শ্বস্থ কলাবাগানের একটা কলাগাছের তলদেশে।

সেইখানে বসিয়া আছেন অনিন্দ্য-রূপমাধুর্য্য বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। নয়নে নয়ন পড়িতে প্রভুবন্ধু নিজ শ্রীহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি ঈষৎ হেলাইয়া রজনীকে নিজের কাছে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। রজনী মন্ত্রমুগ্ধের মত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রজনীর বাড়ী জ্ঞানদীয়া গ্রাম। ঐ গ্রাম বন্ধুসুন্দরের

বাল্যলীলা ভূমি গোবিন্দপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী। অতি বাল্যে রজনী বন্ধুসুন্দরকে দেখিয়াছেন। তারপর আরও দুই একদিন এখানে ওখানে দর্শন মিলিয়াছে। প্রভুর কথাও শুনিয়াছেন, লোকমুখে, নানাস্থানে। কিন্তু চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। তিনিই যে একমাত্র আপনজন, ইহা জানিয়া তাঁহাকে আত্মনিবেদন করেন নাই। করা সম্ভবও নহে, তিনি নিজে না ডাকা পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে চিনিতে, জানিতে বা আপন করিয়া লইতে পারে না।

আজ ভগবান নিজেই ডাকিয়াছেন চিহ্নিত ভক্তকে। ভক্ত নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতেই বন্ধুসুন্দর তাঁহার আপাদমস্তকে কারুণ্যমাখা নয়ন বুলাইয়া লইলেন। রজনী নিজ অজ্ঞাতসারে প্রাণের ঠাকুরকে আত্মনিবেদন করিয়া দিলেন।

প্রভু। রজনী, ঘোড়ায় চড় কেন ?

রজনী। ঘোড়ায় চড়িলে দোষ কি প্রভু ?

প্রভু। পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তোমার জন্য খুব শঙ্কা হয়। কোনও দিন পাছে হাত পা ভেঙ্গে যাবে। ঘোড়ায় চড়ে রাজ-রাজরা, ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য সেনাপতিরা। তোমার সাজে ঘোড়ায় চড়া ?

রজনীর মনে পড়িল, কয়েকদিন পূর্ব্বে এক গ্রহাচার্য্য তাহার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিল, উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতনের ফাঁড়ার কথা। আজ প্রভু ত সেইকথা কহিলেন। তবে প্রভুর কথা গ্রহাচার্য্যের মত নয়। বড় দরদ দেওয়া কথা। কথার মধ্যে প্রভুর হৃদয়ের গভীর স্নেহ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অনুভব

করিয়া রজনী কহিলেন—প্রভু, আপনি যখন নিষেধ করিলেন, আমি আর ঘোড়ায় চড়িব না।

প্রভু। কেবল ঘোড়ায় চড়া বন্ধ নয় রজনী, অহঙ্কার অভিমানের অশ্বপৃষ্ঠ হইতেও তোমাকে নামতে হবে। বড়ই সুদুর্লভ এই মানব জন্ম। এই সাধের জন্ম পেয়ে কি ব্যর্থ অভিমান অহঙ্কার লইয়া থাকতে আছে? রজনী, তুমি নিতাই-গৌরের শরণ লও। শ্রীরাধামাধব ভজন কর।

প্রভুর কথাগুলি যেন বশীকরণ মন্ত্র। মন্ত্রশক্তিতে ব্যাকুল রজনী কহিলেন, প্রভু, কিরূপে ভজন করিতে হয়, এই জীবাধমকে আপনি উপদেশ করুন।

প্রভু। আগামী মাঘ মাসের পহেলা তারিখ শ্রীঅঙ্গনে যেয়ো, তোমায় সব বলব।

রজনী। মাসের প্রথম দিন কি কোন শুভকার্য্য আরম্ভ করা ভাল?

প্রভু। হরিভজন কার্য্যে মাসারম্ভেই শুভদ।

পঞ্চ ক্ষেম

রজনী উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে ভজন সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় একটি খাতায় লিখিয়া দেন। লিখিত বহু বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চ ক্ষেম লিখিত ছিল।

পঞ্চ ক্ষেম—

হরিকথা

হরিনাম

হরিগ্রন্থ

হরিভক্তি

হরিপ্রেম

বন্ধুসুন্দরের আদেশ উপদেশ ও স্নেহ-পরশেতে রজনী নাগের মোহ-রজনী কাটিয়া গেল। ভজন-রাজ্যে নব জন্মলাভ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন।

তৎপর প্রায়শঃ প্রভুর দর্শনে আসিতেন। একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন—রজনী, তুমি মৎস্য খাইও না।

রজনী বলিলেন, কেন প্রভু, উহা খাইলে কি দোষ?

প্রভু। আমিষ খাইলে আয়ুক্ষয় হয়।

সেইদিন হইতেই রজনী আমিষ আহার চিরত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে অনেকেই উহাতে বিরুদ্ধতা করিল, কিন্তু রজনী নিজ নিষ্ঠায় অচল রহিলেন।

রজনী তখন দিবাভাগে কাচারীর চাকুরী করিতেন। সন্ধ্যায়

শ্রীঅঙ্গনে আসিতেন। সারারাত ভজন করিতেন। প্রভাতে টহল দিতে দিতে গৃহে ফিরিতেন।

রজনীর টহল কীর্ত্তনে প্রভু পরম সুখী ছিলেন। রজনীর কণ্ঠস্বর মধুর নয়। দশজনের মধ্যে গান করিবার সামর্থ্য তার ছিল না। একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক ভক্ত সমক্ষে তাহাকে বলিলেন, "রজনী একটি গান গাও।"

রজনী। প্রভু, লোকের সমক্ষে গান গাইবার শক্তি তো আপনি আমাকে দেন নাই। যাহা দেন নাই, তাহা এখন চাহিলে পাবেন কেমনে?

প্রভু। তোমার টহল কীর্ত্তন শুনিয়া আমি সুখ পাই। তুমি গাও, গাহিলেই পারিবে।

রজনী। না প্রভু, আমি গাহিতে পারিব না। তা ছাড়া টহলের একটি গান "জাগ জাগ নগরবাসী" ছাড়া আমার আর কোন গান মুখস্থ নাই।

প্রভু। কেন? "এস প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর" তোমার ভাল মুখস্থ আছে। গাও।"

প্রভুর আজ্ঞায় রজনী গাহিলেন, প্রভু মৃদঙ্গ লইয়া বাজাইলেন। কতিপয় ভক্ত পিছনে গাহিলেন,—

এস প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
এস এস সংকীর্ত্তনেশ্বর॥
এস নদীয়ার পূর্ণ শশধর।
এস লয়ে সব সহচর॥
এস সীতানাথ নিতাই গুণধর।

"যোগমায়া বরকন্যা, বৃক্ষরূপে শতধন্যা,
রূপসী চালিতা বন্ধুপ্রেয়সী পরা।"

—শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী

এস গৌরীদাস গদাধর ॥
এস শ্রীনাথ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
এস এস স্বরূপ দামোদর ॥
এস বন্ধুর সর্ব্বস্ব বিশ্বম্ভর।
এসে জুড়াও তাপিত অন্তর ॥

আনন্দ যাহা হইল তাহা অবর্ণনীয়। রজনীর প্রতি প্রভুর কৃপাশক্তি দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

শ্রীউমাশংকর সরকার

চালিতা বৃক্ষ

"উনি সাক্ষাৎ যোগমায়া"

শ্রীভগবান যখন লীলায় আসেন, তখন লীলার পারিষদগণ বৃক্ষলতা, পর্ব্বত, নদীরূপেও সঙ্গী হইয়া আসেন। সকল লীলাতেই এইসব দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীত্রিকালগ্রন্থে প্রভুবন্ধু লিখিয়াছেন, "মহামহ শশমৃগগণের বৃক্ষ ও লতারূপ ধারণ।" কোন্ বৃক্ষলতায় কি তত্ত্ব তাহা রহস্যময় ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে দরজার দুয়ারে একটি চালিতা গাছ আছেন। বিল্ব তুলসী নিম্ব বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ যুগযুগান্তর ধরিয়া পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া সকলের পূজাস্পদ হইয়া আছে। কিন্তু চালিতাগাছকে কেহ কোন-দিন আদর যত্ন করে নাই। পতিতপাবন প্রভু যেমন পতিত

বুনা ডোমকে কোলে তুলিয়া মোহন্ত পদবী দিয়াছেন, বুঝি বা সেইরূপ উপেক্ষিত চালিতা বৃক্ষকে আদর করিয়া শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন।

ঐ বৃক্ষটির সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব-সংবাদ একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভক্তবর উপানন্দ কেদার কাহা একদিন এই বৃক্ষটিকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া ছেদন করিতে যাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন একটু দূরে বসিয়াছিলেন। কাহাকে চালিতা বৃক্ষ ছেদনে উদ্যত দেখিয়া দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—"কাহা রে, ওকে কাটিস না, উনি সাক্ষাৎ যোগমায়া, আমাকে আঁচলের তলে রক্ষা করছেন।" লজ্জিত হইয়া কেদার কুঠারী রাখিয়া দিলেন।

অপর একসময় কোন কথা প্রসঙ্গে দিদি দিগম্বরীকে বলিয়াছিলেন "চালিতা গাছ আমার বউ।" যোগমায়া চিচ্ছক্তি। শক্তি সর্ব্বদাই শক্তিমানের সেবিকা। শাস্ত্রসম্মত কথাই।

ব্রজলীলায় তমাল বৃক্ষের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া তমাল শ্রীরাধার অতি প্রিয় ছিল। বিরহিণী বলিয়াছিলেন— শ্যাম-বিরহে মরিয়া গেলে আমার দেহকে—

"বাঁধিয়ে তাহায়, তমাল শাখায়,
নিতি নিতি সবে দেখ।"

তমাল কালো কৃষ্ণ কালো বলিয়া তমালেই কালোর স্পর্শ পাবেন, এই আশায়ই অমন কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু ত্রিকাল গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ চালিতা গাছের পাতার রং।" চালিতা বৃক্ষ যখন শ্যামল নবপত্রে

পরিশোভিত হয় তখন তদ্দর্শনে রাধাভাব-ভূষিত বন্ধুসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। বিহ্বল হইয়া এক দৃষ্টে ঐ শ্যামল শোভা দর্শন করিতে থাকেন। হয় তো বা এইজন্যই ঐ বৃক্ষের উপর এত আদরভরা দৃষ্টি। এক চালিতা বৃক্ষের মধ্যে কত রহস্য কে ইয়ত্তা করিবে।

চালিতা বৃক্ষে সহস্র সহস্র ফল ধরে। কেহ কোনদিন ফল ছিঁড়ে না। একদিন ভক্তবর গৌরাঙ্গ দাস একটা আকসি লইয়া একটি চালিতা ফল পারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় প্রভু শ্রীমন্দির হইতে উঠিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আগমন দেখিয়া গৌরাঙ্গদাস চালিতা না পারিয়া চলিয়া গেলেন, আকসি গাছের সঙ্গে ঝুলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন শ্রীহস্তে একটি ঢিল ছুড়িয়া গাছ হইতে আকসিখানা খুলিয়া দিলেন। ঐ সময় হইতে কেহই ফল ছিঁড়ে না।

ফল ছিঁড়ে না বলিয়া কোন সময় কাহারও গায়েও পড়ে না। কখনও বা অগণিত ফল ভূতলে পতিত হয়। কেহ কেহ একটি ফলের জন্য বহুদিনেও ধর্ণা দিয়াও পায় না।

ফলের আস্বাদন অন্য চালিতা অপেক্ষা অধিকতর মিষ্টি। শুনিয়াছি, অনেকের অনেক ব্যাধি সারিয়াছে ঐ ফল খাইয়া। অনেকের অনেক মনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে, বৃক্ষের কাছে মানত করিয়া। মাসের মধ্যে দশ বিশদল পল্লীবাসী নরনারী আসেন, কেহ ছেলেমেয়ের চুল ফেলে, কেহ অন্নপ্রাশন দেয়, কেহ সিন্দুর পরায়, কেহ নববস্ত্র পরায়, কেহ-নব বরবধূ প্রদক্ষিণ করায়। বন্ধুভক্তগণ পরিক্রমণ করেন, দণ্ডবৎ করেন, কেহ বা

আলিঙ্গন চুম্বনও করিয়া থাকেন। উনি বৃক্ষ নহেন, বন্ধুসুন্দরের প্রিয়মণ্ডলীর দশজনের একজন, ভজন-শীলেরা এরূপ অনুভব করেন।

শিয়ালের সঙ্গে শিয়ালের পিরীত

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীঅঙ্গনে নিজ মন্দিরে আছেন। দ্বার রুদ্ধ। বাহিরে কেদার কাহা বসিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া বন্ধুসুন্দরকে শুনাইতেছেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। "আমি প্রভুর দর্শন চাই, কখন তাঁর দেখা মিলিবে" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন কেদারকে। "তা তো বলতে পারি না। তিনি কখন বাহিরে আসবেন, তিনিই জানেন" কেদার উত্তর দিলেন।

"আচ্ছা বসি" বলিয়া ভদ্রলোক বসিলেন। কিছু সময় পরে ঐরূপ সুষ্ঠুবেশধারী আর একটি ভদ্রলোক আসিলেন। তাহারা কিছু সময় কি যেন কথাবর্ত্তা বলিলেন, তারপর দুইজনেই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া যাওয়ার দুই মিনিট পরেই প্রভু বাহির হইলেন। বলিলেন, "কাহা, দেখলি তো, শেয়ালের সঙ্গে শেয়ালের পিরীত। এক শেয়াল এল, অমনি আর এক শেয়াল উঠে গেল। এই তো আমি বের হলাম। ওকি আমায় দর্শন করতে এসেছিল? মোটেই না। এসেছিল অন্য এক মতলবে। তাই দেখা দিলাম না।"

গান লেখা শেষ

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীমন্দিরে আছেন। কয়েকটি বালক প্রভুর গান লিখিতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু রচনা করিয়া বলিতেছেন, বালকেরা লিখিতেছেন। এইরূপে প্রভু অনেক গান লিখিয়াছেন। অনেক গান নিজ শ্রীহস্তেই লিখিয়াছেন। অনেক গান নির্জ্জনে লিখিয়াছেন—অনেক গান দশজনের সম্মুখেই রচনা করিয়া লিখিয়াছেন। অনেক গান নিজের ইচ্ছা মত ভাবের আবেশ মত লিখিয়াছেন। আরও অনেক গান ভক্তজনের আব্দার অনুসারেও লিখিয়াছেন। এইভাবে প্রায় তিনশত গান লিখিয়াছেন।

সেদিন গান বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বালকদিগকে বলিলেন, "লেখা বন্ধ কর। গান লিখা শেষ হইল। আর লেখা হবে না। তোমরা যাও।"

কথা বলিতে বলিতে ঐকথা একখানা কাগজেও লিখিয়া দিলেন" তোমরা গৃহে যাও, গান লিখা আর হবে না।" তার পর আর কোন কথা বলিলেন না। বালকগণ কিছুই বুঝিলেন না। তাহারা চলিয়া গেলেন।

তাহারা মনে করিয়াছিলেন সেদিনকার মত আর লেখা হইবে না। ভবিষ্যতে হইবে। কিন্তু ঐ যে গান লেখা শেষ হইল, উহার পর আর নূতন গান লিখেন নাই।

গানগুলি শ্রীশ্রীপ্রভুর অন্তরের আস্বাদনের অভিব্যক্তি। বাহিরের দিকের ঐ অভিব্যক্তি বন্ধ হইয়া উহা তৎপর হইতে অন্তর-মুখেই চলিতে লাগিল। তাহারই পরিণতি মহামৌনলীলা ও মহাগম্ভীরা লীলা, কোন কোন ভক্ত এইরূপ মনে করেন।

"নিতাইশক্তি বদলানে মহা অপরাধ"

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু একজন বালকভক্তকে ফরিদপুর সহরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, তুমি এখনি যাইয়া তাকে বল, "আপনি জগদ্বন্ধুর স্বরূপ বুঝেন না।"

পথে চলিতে চলিতে বালক প্রভুর কথাটি ঠিক ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না।—যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজের মনগড়া ভাবে বলিল, "আপনি জগদ্বন্ধুকে জানেন না।"

ভদ্রলোক বালকের কথা শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "আমি জানি না, তুমি জান ? বাওণকান্দায় চক্রবর্ত্তি বাড়ীর ছেলে জগদ্বন্ধু তাকে আমি জানি না ! ছেলেমানুষ তুমি ছেলে মানুষের মত থাক। জেঠাম করছো কেন ?"

এইভাবে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সিত হইয়া বালক দুঃখিত মনে মলিন মুখে প্রভুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন "কি বাবুজী, কি বললে ? মুখ ভারী কেন ? মারে নি ত।"—বালকটি সকল কথা যথাযথ খুলিয়া বলিল।

একটু নীরব থাকিয়া প্রভু কহিলেন, "আমি যখন যা বলে দেই তা বদল করো না।—আমার কথা, আমার ভাব, আমার ভাষা সব ঠিক রেখে বললে তোমাদের কদাও বিপদ হবে না। শব্দে সংকর্ষণ শক্তি। নিতাইশক্তি বদলানে মহা অপরাধ। তুমি অপরাধ করেছ, গোময় খেয়ে মালিন্য দূর কর।"

বালক শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ মত পূর্ব্বাভ্যাসানুরূপ মটর পরিমাণ গোময় ভক্ষণ করিল। তখন শ্রীশ্রীপ্রভু আবার

বলিলেন, "তুমি এখনই আবার য়াও, আমি যা বলে দেই সেই ক'টি কথা ভিন্ন আর কিছু বলবে না। আমার কথা মুখস্থ কর।"

বালকটি ভয়ে ভয়ে বলিল, "এবার গেলে মারবে" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "মারবেই ত, এখনই যাও।" প্রভুর আদেশ অবহেলা করিবার উপায় নাই, বালক তাহা জানিত। সে প্রভুর বাক্যে নির্ভর করিয়া আবার চলিল।

বালক এবার কথা কয়টি ঠিক ঠিক মুখস্থ করিয়া গিয়াছিল। বালককে আবার দেখিয়া সেই ভদ্রলোক কহিলেন, "কিহে সংবাদ কি?" এইবার বালক প্রভুর কথা কয়টি যথাযথ কহিল। "প্রভু বলিয়াছেন, আপনি জগদ্বন্ধুর স্বরূপ বুঝেন না।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি একটু যেন চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক। জগতকে বুঝবার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি শক্তি-শালী পুরুষ সন্দেহ নাই। তুমি যেয়ে তাঁকে বল, তিনি না বুঝালে তাঁকে কেমন করে বুঝব।"

ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া বালকটির মনে খুব আনন্দ হইল। প্রভুর বাক্যে যে সংকর্ষণ শক্তি আছে তাহা প্রাণেপ্রাণে অনুভব করিল। এইসব বিষয় শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক কিছু বলিবেন ভাবিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর নিকট যাওয়ার পর তিনি ঐ বিষয় আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অন্য কার্য্যের ভার দিয়া তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় এইরূপ কাহাকেও কোন কাজ দিয়া পাঠাইলে, সে কাজ করিয়া ফিরিয়া আসার পর সেই আদিষ্টকার্য্য সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না।

"রচনা ভাঙ্গতে নেই"

একদিন কতিপয় বালকভক্ত শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত গান—

"রে রে মাধাই আবার বল হরিবল।
হরিনামে পাপতনু হবে রে শীতল ॥"

এই গানটি গাহিতেছিল—মূলগায়ক বালকটি "রে রে মাধাই" স্থলে রে রে ভাই বলিতেছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু পশ্চাদ্দিক্ হইতে গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বাবুজী রচনাকারীর রচনা ভাঙ্গতে নেই। তাহাতে ভাবনষ্ট ও অপরাধ হয়। রে রে ভাই আর বল না, রে রে মাধাই বলো।"

বালকটি নিজ অন্যায় বুঝিয়া অপ্রতিভ হইল এবং প্রভুপদে ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু বালকটিকে সব সময় বলিতেন, "তোমরা মনদিয়া দিনরাত পড়ো। একান্ত ইচ্ছার সহিত কীর্ত্তন করো।" একদিন বালকগণ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কীর্ত্তন করিয়া অঙ্গনে গিয়াছে। প্রভু বলিলেন, "বাবুজী, ভাল করে কীর্ত্তন না করলে পাপ হয়। উচ্চ কীর্ত্তনে পাপ নষ্ট করে। কীর্ত্তন না করাও পাপ।" এই বলিয়া একখানি কাগজে লিখিয়া দিলেন,—

"টইল কীর্ত্তন, পদ কীর্ত্তন ইচ্ছায় করিবা।"

শাক্ ভিক্ষা

শ্রীশ্রীপ্রভু যেমন প্রিয়ভক্তদিগকে তত্ত্বোপদেশ, নীতি উপদেশ, ভজন সাধনের কথা বলিতেন, সেইরূপ কখনও কখনও প্রিয়ভক্তদের সঙ্গে ঘরোয়া বিষয়ের খুটিনাটি আলোচনাও করিতেন ও প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ বিষয় লইয়া রস-রসিকতা করিতেন। ইহাতে গ্রামবাসী সকল ভক্তগণ খুবই আনন্দ লাভ করিতেন। তাহারা প্রভুকে নিজজন মনে করিয়া প্রভুর কাছে সংসারের সকল ভাল মন্দের কথা জানাইতেন। প্রভুও আগ্রহের সহিত শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সর্ব্বতো-ভাবে তাহাদের ঘরের ছেলে হইয়া যাইতেন। অত বড় বিরাট প্রভুর বালকত্ব সকলেরই পরম উপভোগ্য বস্তু হইত।

গোয়ালচামটের অভয় শীলকে প্রভু খুব স্নেহ করিতেন। অভয় দিনকয়েক পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহ করিতে যাইবার দিন প্রভুর মন্দিরের দুয়ারে প্রণাম করিয়া গিয়াছে।

একদিন প্রভু অভয়কে নিকটে পাইয়া ডাকিয়া বসাইলেন। অভয় প্রণত হইয়া বসিলে প্রভু বলিলেন, "অভয়, বিয়ে করলি, তা তোর বউ ত দেখালি না।" অভয় মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আপনি দেখলেই ত পারেন।"

প্রভু বলিলেন, "দেখি নাই বুঝি, দেখেছি রে দেখেছি।" অভয় বলিল, "তা আপনার অদেখা কি আছে।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তোর বউর ভক্তি আছে, তাকে আঙ্গিনায় পাঠায়ে দিস ত।"

"তা দেব প্রভু" বলিয়া অভয় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে, অভয়ের নূতন বউ আসিয়া প্রভুর

নিকটে প্রণাম করিল। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রান্না করতে পার?" বউ ঘাড় নাড়িল। প্রভু বলিলেন, "আমার মটর শাক খেতে ইচ্ছে করে, তুমি রেঁধে এনে আমাকে দিও।" সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িয়া অভয়ের স্ত্রী প্রভুর কাছে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

প্রভুর শাক চাওয়া লইয়া স্বামী স্ত্রী ঘরে বসিয়া আলোচনা করিল। তাহারা ভাবিল, আমরা দরিদ্র তাই কাঙ্গালের ঠাকুর আমাদের কাছে দধি দুগ্ধ, সন্দেশ, মিষ্টি, লুচি তরকারী এসব মূল্যবান দ্রব্য না চাহিয়া শুধু শাক চাহিয়াছেন। কী করুণা প্রভুর!

স্বামী স্ত্রী সাধ্যমত দ্রব্যাদি জোগাড় করিয়া প্রভুর জন্য রান্না করিল। দুইজনে বহিয়া নিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রভু পরমাদরে তাহাদের অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেন ও "মটর শাক কি সুন্দর, কত সুন্দর রেঁধেছ" বলিতে লাগিলেন। প্রভুর ভোগ গ্রহণে তাহারা যে আনন্দ পাইল, এরূপ আনন্দ জীবনে আর কখনও পায় নাই। ভুক্তাবশেষ লইয়া অভয়-গৃহিণী নিকটবর্ত্তী বালক বালিকাদের বিতরণ করিয়া দিয়া যাহা অবশেষ থাকিল মাথায় তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল।

অভয়ের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। জাতীয় ব্যবসায় করিয়া অভয় সংসার চালাইতে সক্ষম হইত না, কষ্টে সৃষ্টে চলিত। কিন্তু জীবনে কোনদিন নিজ অভাবের কথা শ্রীশ্রীপ্রভুকে বলে নাই।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু অভয়কে কতগুলি জিনিষের ফর্দ্দ দিয়া

কুড়ি টাকা দিলেন। দশ টাকার মধ্যেই সব জিনিষ ক্রয় করা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীপ্রভু দ্রব্যগুলির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন্ জিনিষের কত দাম তাহা একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পরিশেষে অভয় চরণ নিজেই কোন্ জিনিষের কত দাম তাহা সব বিশেষ করিয়া প্রভুকে জানাইয়া বলিলেন যে, দশ টাকায় সব হইয়াছে, আর দশ টাকা হাতে আছে। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "অভয়, ওটাকা তোর কাছেই থাকুক।"

অভয় প্রভুর টাকা নিতে অস্বীকার করিয়া টাকা শ্রীমন্দিরের মধ্যে রাখিয়া দিল। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, অভয়, উহা হইতে পাঁচ টাকা লইয়া তোর পছন্দ মত একটি তুলার কম্বল আমার জন্য লইয়া আয়। অভয় বাজারে যাইয়া বাঘের চামড়ার মত ডোরা ডোরা রং বিশিষ্ট এক কম্বল কিনিয়া আনিল। কম্বল দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "বেশত, অভয় খুব সুন্দর কম্বল, তুই গায়ে দে দেখি।" অভয় বলিল, "প্রভু আপনি গায়ে দিন।" প্রভু বলিলেন, "না, তোকে বেশ মানায়, তুই গায়ে দে।"

প্রভু পুনঃ পুনঃ বলায় অভয় গায়ে দিতে বাধ্য হইল। প্রভু বলিলেন, "অভয়, এ কম্বল তোকে বেশ মানাচ্ছে, এটা তুই নে।" অভয় অতি সঙ্কোচে বলিল, "না প্রভু, আপনার কম্বল আমায় কেন দেবেন।" প্রভু বলিলেন, "আচ্ছা যা, তোর বউকে দেখায়ে আয়, কেমন মানাচ্ছে।" রসের ঠাকুর কম্বলখানা অভয়কেই দিয়া দিলেন।

"আমি প্রভু জগদ্বন্ধু ক্ষণে জন্মিয়াছি"

প্রভু নিয়ম করিলেন, একাদশীর দিন সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন হইবে। কিছুদিন এই নিয়ম চলিল। কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে স্বয়ং নৃত্য করিতেন। একটী গণ্ডী দিয়া তাহার মধ্যে নাচিতেন। হয়তো বা নাচিতে নাচিতে রাসের নৃত্যের কথা মনে পড়িত।

"নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া"

নৃত্য করিতে করিতে অন্যের অঙ্গ স্পর্শ না হয়, হয়তো বা সেইজন্য ঐ গণ্ডী দিতেন। রাত্রের কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইত। বিশেষ অনুগত কতিপয় প্রিয়ভক্তসঙ্গেই ঐ আনন্দ করিতেন।

এই ভক্তগণ মধ্যে ছিলেন ফরিদপুর সেচ অফিসের কর্ম্মচারী প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পকালেই তিনি প্রভুর প্রিয়জন হইয়া উঠিয়াছেন। ঘন ঘন অঙ্গনে আসিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু একখণ্ড কাগজে নিজ হস্তে নিজ পরিচয় লিখিলেন। উহা কোন ভক্তের মাধ্যমে প্রসন্নবাবুর অফিসে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করিলেন, ঐ পরিচয় সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য। তাহাতে লেখা ছিল—

"আমি প্রভু জগদ্বন্ধু ক্ষণে জন্মিয়াছি
আমার জন্মস্থানে পাঁচটি তুঙ্গ আছে
আমার ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আছে
বিশ্বাস না হইলে বাজারে যাচাইয়ে লও॥"

প্রসন্নকুমার এই লেখার অবিকল নকল করাইয়া ফরিদপুর বারলাইব্রেরী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অফিস, মিউনিসিপ্যাল অফিস, পোষ্ট অফিস, থানা, জেলখানা, আদালত ও স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে টাঙাইয়া দেওয়াইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর ঠিকুজী বিচার*
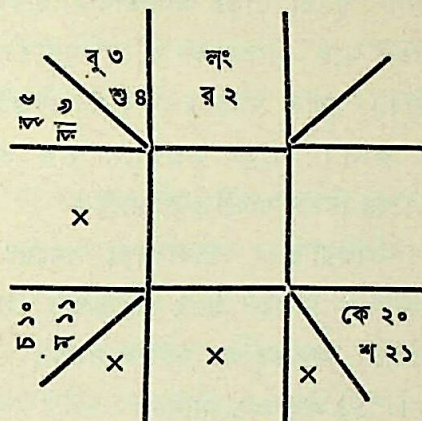
শকাব্দা ১৭৯৩, বাংলা ১২৭৮ সাল, খৃষ্টীয় ১৮৭১-২৯শে এপ্রিল শেষরাত্রে ৪টা ৩০ মিনিটের পরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুর শুভাবির্ভাব।

নিজ জন্মক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছেন,—

১। জন্ম মাহেন্দ্রক্ষণ

২। ক্ষণে জন্মিয়াছি

৩। পুষ্পবন্ত যোগে জন্ম

৪। পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থ

৫। শনির গর্ব্ব খর্ব্ব

১। মাহেন্দ্রক্ষণ—১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা যায়, ঐদিন রাত্রে মাহেন্দ্রক্ষণের স্থিতিকাল বাঃ সঃ রাত্র

---

* এই ঠিকুজী বিচারের জন্য আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রাচীন ভক্ত ফরিদপুর কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুত লোকনাথ সরকার দাদাজীবনের নিকট ঋণী।

৪টা হইতে ৫টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত। অর্থাৎ পরাহের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। সুতরাং প্রভুর আবির্ভাব মাহেন্দ্রক্ষণে।

কেবল তাহাই নহে, মাহেন্দ্রক্ষণ ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মিলনক্ষণে প্রভুর আবির্ভাব। প্রতি রাত্রের শেষ চারিদণ্ডই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বা অরুণোদয় কাল। প্রভুর জন্মকালে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও শুভ মহেন্দ্রযোগের মিলন সংঘটিত হইয়াছে।

২। ক্ষণে জন্মিয়াছি। সাধারণতঃ সময়ের অতি সূক্ষ্ম অংশকে ক্ষণ বলে। ত্রিকাল গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন— অর্দ্ধক্ষণে এক পল। অতএব ক্ষণ দুইপল সময়। এক মিনিটের কিছু কম সময়। ২½ পল = ১ মিনিট।

৩। পুষ্পবন্ত যোগ। শ্রীশ্রীপ্রভু হরিনামের তত্ত্ব বুঝাইতে পুষ্পবন্ত শব্দের অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হরি শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবন্তৌ শব্দে চন্দ্র সূর্য্য বুঝায়, সেইরূপ গুরু গৌরাঙ্গ গোপী রাধাশ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম।"

পুষ্পবন্ত শব্দের অর্থ অমরকোষে পাওয়া যায় "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর নিশাকরৌ।"

"পুষ্পবন্ত যোগ" কথাটি চন্দ্র সূর্য্যের সংঘটিত যোগ বুঝায়। প্রভু বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব সময়ে এই যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। এ যোগ অতি বিরল।

১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার কিঞ্চিদধিক দুইদণ্ড রাত্র থাকিতে একই সময়ে সূর্য্য মেষ রাশিতে এবং চন্দ্র মঘা নক্ষত্র যুক্ত হইয়া সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন। এই উভয় গ্রহ একই

সময় রাশি পরিবর্ত্তন করিয়া সূর্য্য হইতে চন্দ্র পঞ্চমে অবস্থিতি করায় যে যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই পুষ্পবন্ত যোগ।

দুইটি গ্রহের রাশি পরিবর্ত্তন অতি অল্প সময় মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষণ। এই ক্ষণটি মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্যেই ঘটিয়াছে।

ইহাতে মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম, ক্ষণে জন্ম ও পুষ্পবন্ত যোগে জন্ম, এই বাক্যত্রয়ের সত্যতা সম্মিলিত ভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপ্রভুর আবির্ভাব সময় মীনলগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব চক্রবালে মেষলগ্ন মাত্র দেখা দিয়াছে। ইহাতে প্রভুর জন্ম-লগ্নকে সন্ধিলগ্ন করিয়াছে। ইহাও একটি বিশিষ্ট ক্ষণ।

ঐদিন অশ্লেষা নক্ষত্র ছিল দং ৫৭।৩৩, প্রভুর জন্মক্ষণ অশ্লেষা ও মঘানক্ষত্রের ঠিক সন্ধিস্থলে। ইহাও একটি বিশিষ্ট ক্ষণ।

ঐরূপ যোগাযোগ-সম্পন্ন লগ্ন অতি অসাধারণ লগ্ন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে চন্দ্র ও সূর্য্য পঞ্চমে অর্থাৎ ১২০°তে অবস্থান করায় Triune from করিয়াছে। ইহা একটি Good aspect. লগ্নের এই সব যোগাযোগ জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় দেহ সূচনা করিতেছে।

মেষরাশির প্রথম অংশই প্রভুর জন্মলগ্ন।

রবি রাহু ও কেতু এই তিনটি গ্রহ তুঙ্গে আছেন। শনি ও বৃহস্পতি তুঙ্গতুল্য। এই জন্যই পঞ্চগ্রহ তুঙ্গস্থ বলিয়াছেন। শনি ও বৃহস্পতি তুঙ্গতুল্য কেন বলা যাইতেছে ?

দশমাধিপতি শনি নবমে, নবমাধিপতি বৃহস্পতি গৃহে থাকিয়া

বৃহস্পতির সহিত পূর্ণদৃষ্টি বিনিময় করায় প্রবল রাজযোগ হইয়াছে। ইহাই সৌরীগুরু পূর্ণদৃষ্টি রাজযোগ নামে অভিহিত। এই যোগ হইলে শনি ও বৃহস্পতি তুঙ্গতুল্য বলশালী হয়।

শনি কর্ম্মস্থলের অধিপতি হইয়া ধর্ম্মস্থলে অবস্থিত হওয়ায়ও রাজযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বৃহস্পতি ও শনির সংঘটিত এই রাজযোগ—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রাজত্বই সূচনা করে। এইজন্য শনি অনিষ্টকারী না হইয়া ইষ্টকারী হইয়াছেন। এই হেতুই শনির গর্ব্ব খর্ব্ব বলিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত বিচারে দেখা গেল শ্রীশ্রীপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীমুখের বাণী প্রত্যেকটিই সত্য এবং অভ্রান্ত।

আত্ম পরিচয়

রমেশচন্দ্র, সুধন্বকুমার ব্রজেন্দ্র লোকনাথ প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই প্রভাতে প্রভাতী টহল কীর্ত্তন করিতেন। সাধারণতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরচিত "জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে" এই গানই প্রভাতে গাওয়া হইত।

মাঝে মাঝে "ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে। যেজন জগদ্বন্ধু ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে" এই পদ গাহিয়াও প্রভাতী টহল হইত।

ঢাকা স্বামীবাগের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ত্রিপুলিঙ্গ স্বামিজী মহারাজ ঐ সময় ঢাকায় ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একদিন প্রভুকে দর্শন করিতে বাগানের দরজায়

শ্রীকরাঙ্কিত

আত্মপরিচয়

॥ হরি ॥

১॥ নামঃ— জগদ্গুরু ॥

২॥ জন্মঃ— ব্রহ্মেক্ষণ ॥

৩॥ মুর্শীদাবাদ নগরে ॥

৪॥ জাতিঃ সৎপুরুষ ॥
মহাপ্রভুরেণ।

৫॥ হরিমহারাজেন।
ইতি

উপস্থিত হন। আদেশ না থাকায় বাগানের মালী দরজা খুলিতে অসম্মত হয়। স্বামিজী অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যান।

তারপর প্রভু ঢাকা হইতে ফরিদপুর চলিয়া গেলে একদিন প্রভাতী টহলে ভজ জগদ্বন্ধু গান শুনিয়া ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "জগদ্বন্ধু কে? তার নাম কীর্ত্তন করা হয় কেন?" ভক্তগণ বলিলেন, জগদ্বন্ধু ভগবানের অবতার।

স্বামিজী যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি যোগমার্গের ভজন করিতেন। ভক্তিমার্গ বা অবতারবাদ মানিতেন না। তিনি অবতারের কথা শুনিয়া নানাপ্রকার বিদ্রূপ বাক্য কহিলেন। রমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের জগদ্বন্ধুর পরিচয় কি?" রমেশচন্দ্র কি পরিচয় দিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। স্বামিজী সদুত্তর না পাইয়া বলিলেন,—

"লোভী গুরু লালচি চেলা ঠেল নরকমে ঠেলাম ঠেলা।"

রমেশচন্দ্র অন্তরে খুব ক্ষুণ্ণ হইলেন। সারাদিন কেবল মনে মনে ভাবিলেন, প্রভুর পরিচয় কি বলিতে পারিলাম না। প্রভু ত আমাদের কোনদিন নিজের পরিচয় দেন নাই, মনে অভিমান হইল এতদিনও প্রভু নিজের পরিচয় দেন নাই কেন, মনে করিলেন আজই প্রভুকে পত্র দিব তাঁহার পরিচয় কি জানিবার জন্য। চিঠিতে প্রভুকে কি কি লিখিবেন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে ডাকে প্রভুর চিঠি আসিল খামে। খামের চিঠি খুলিয়া রমেশচন্দ্র অবাক হইয়া পাঠ করিলেন, প্রভু আত্ম-পরিচয় শ্রীহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

আত্মপরিচয়

হরি

১। নাম—জগদ্বন্ধু

২। জন্ম—মাহেন্দ্রক্ষণ

৩। মুর্শীধাভাধ্‌রাঝ্‌

৪। চারিহস্ত পুরুষ

মহাউদ্ধারণ

৫। হরি মহাবতারণ

ইতি

রমেশচন্দ্রের প্রাণে আনন্দ ধরে না। প্রভু নিজ হস্তে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। রমেশচন্দ্র সেইদিনই প্রভুর লেখার লিথুপ্রিণ্ট করিলেন, অনেক কপি হইল। সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ত্রিপুলিন স্বামিজীকেও একখানা পাঠাইয়া দিলেন।

কুঞ্জবিহারীর নির্য্যাণ

টেপাখোলার বঙ্কুবিহারীর অনুজ কুঞ্জবিহারীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কুঞ্জবিহারী ১৩১৭ সনের ধূলটের সময় টেপাখোলাবাসী অনেক ভক্ত সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপধাম দর্শনে যান। ধূলটের পর সঙ্গীরা সকলে দেশে ফিরিয়া আসে, কুঞ্জবিহারী কলিকাতা যান কোন চাকুরীর অনুসন্ধানে।

সেই সময় কলিকাতায় প্লেগের বীজ সংক্রামিত হইয়া

মহামারী সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা যাইবার কয়েকদিন পরেই কুঞ্জবিহারী ঐ কালব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। ব্যাধির লক্ষণ অনুভব করিয়াই তিনি বাড়ীতে রওনা হইলেন। প্রভুর স্মরণ করিতে করিতে ট্রেণে উঠিলেন।

সেই সময় শিয়ালদহ, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ ও অন্যান্য জংসন ষ্টেসনে যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিয়া ট্রেণে উঠিতে দেওয়া হইত। প্লেগের বীজ বাহিরে সংক্রামিত হইবার ভয়ে সরকারী ভাবে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। একমাত্র প্রভুর অনুগ্রহেই কুঞ্জবিহারীকে কেহ পথে আটকাইল না। পথে কোথাও তাহার রোগ ধরা পড়িলে তাহাকে আর বাড়ীতে পৌঁছিতে হইত না। প্রভুর কৃপায় সে বাড়ী পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে কুঞ্জ অসীম দুঃখের মধ্যেও কৃপাপ্রসাদ অনুভবে সুখ বোধ করিলেন।

দাদা বঙ্কুনাগ কুঞ্জের চিকিৎসার জন্য হরিশ্চন্দ্র বাবু নামক একজন খৃষ্টান-বিশিষ্ট ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। আরও বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখিল, ফল কিছুই হইল না। বাংলা ১৩০৭ সনের ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তি দিন কুঞ্জবিহারীর শেষ সময় উপস্থিত হইল। শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কুঞ্জ দাদা বঙ্কুবিহারীকে ডাকিলেন। তাহার গলা ধরিয়া মাথা বুকের কাছে আনিয়া অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"দাদা, আপনি আমাকে ছেলেবেলা হইতে কষ্ট করিয়া পালন করিয়াছেন। জীবনে আপনার ঋণ কিঞ্চিৎ মাত্রও শোধ করিতে পারিলাম না। একটি কথা বলিয়া যাই, যদি ইহাতে ঋণের কিছু শোধ হয়।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুঞ্জবিহারী কিছুক্ষণ

নীরব হইলেন। তারপর তাহার মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। ভাষা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তারপর আবার বলিলেন,—

"দাদা, প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর স্বয়ং ভগবান ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। যে যাহাই বলুক, আপনি তাঁহার প্রতি অনুমাত্র অবিশ্বাস আনিবেন না।"

এই কথা কয়টি বলার পর কুঞ্জবিহারীর নয়ন মুদ্রিত হইয়া গেল। কণ্ঠ হইতে "জয় জগদ্বন্ধু" "জয় জগদ্বন্ধু" তুই বার উচ্চারিত হইল। কুঞ্জ ব্রজ-কুঞ্জের কুঞ্জবিহারীর পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিলেন। কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাধা হইল।

মহামারী দমনে হরিনামের শক্তি

কলিকাতা মহানগরী প্লেগের আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। দলে দলে লোক ভয়ে ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। তৎকালের গভর্ণর লর্ড কার্জ্জন রাজকর্ম্মচারী ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, যাহাতে কলিকাতার লোক বাহিরে যাইয়া রোগের বীজ দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া না ফেলে। কলিকাতার চতুর্দ্দিকে পুলিশ পাহারা বসিয়া গেল। কলিকাতা হইতে জনপ্রাণীর বাহিরে যাইবার উপায় নাই। যাহাদের রোগ হইতেছে তাহারা মরিতেছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা আতঙ্কে আধমরা হইয়া পড়িয়া আছে।

এই দুর্দ্দমনীয় মহামারী নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিডন স্কোয়ারে এক জনসভার আয়োজন হইল। চম্পটী ঠাকুরের মনে পড়িল, সেই নোটখাতার ভক্তের লিষ্টের কথা। তিনি খাতাখানি লইয়া শিশিরকুমারের নিকট গেলেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়কে লইয়া লর্ড কার্জ্জনের কাছে গিয়া সভা যাহাতে বিরাট ভাবে হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিডন স্কোয়ারে বিরাট সভা বসিল। সভায় বিভিন্ন বক্তা, বিভিন্ন ভাবে মহামারী নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বক্তৃতা করিলেন। সর্ব্বশেষে চম্পটী ঠাকুর এক হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তুমুলভাবে হরিনামের রোল তুলিয়া দিতে পারিলে ঐ রোগের বীজ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। চম্পটী ঠাকুর শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া তাহার বক্তব্য স্থাপন করিলেন।

কলিযুগে হরিনামই যুগধর্ম্ম। হরের্ণামৈব কেবলম্, ইহাই শাস্ত্রের বাণী ও মহাপ্রভুর হার্দ্দ। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন,—

হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এ'ল প্রায়।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)

শ্রীশ্রীপ্রভু ত্রিকাল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণনাম ব্যাধি বিনাশন।" অতএব এই ব্যাধি বিনাশ করিতে হইলে কৃষ্ণনাম হরিনাম খোল করতালে কীর্ত্তন করিতে হইবে। হরিনামের রোলে

বাতাস নির্ম্মল হইয়া যাইবে। রোগের মূলীভূত কারণ যে জীবের পাপ অপরাধ তাহাও নির্ম্মূল হইবে।

চম্পটী ঠাকুরের বক্তব্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সেই সভাতেই স্থির হইল, কলিকাতার প্রতি পল্লীতে সকাল সন্ধ্যায় নগরকীর্ত্তন করিতে হইবে। আর, একটি দিন নির্দ্ধারিত হইল, সেইদিন সকল পল্লীর কীর্ত্তনের দল নগরকীর্ত্তন করিয়া গড়ের মাঠে একত্রিত হইবে ও সমস্ত সহর ভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তন হইবে। বিভিন্ন পল্লীর লোকদের উপর এই কীর্ত্তনের ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ধনৈশ্বর্য্যে গর্ব্বিত সহরের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক মনে করিতেন যে, হরিনাম সংকীর্ত্তন ছোট-লোকের ধর্ম্ম। মহাপ্রভুর দেওয়া মহাউদ্ধারণ মন্ত্রকে অনেকেই উপেক্ষার চোখে দেখিতেন। আজ সকলেই প্রাণের দায়ে হরি-নাম কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধ হইলে কী হইবে ? হরিনাম কীর্ত্তন করিবার অভ্যাস ত অনেকেরই নাই।

রামবাগানের ডোমভক্তগণের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তনের জন্য আবাহন হইতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বত্র গমন করিয়া উচ্চ রোলে কীর্ত্তন করিতে লাগিল ও সকলকে কীর্ত্তন করা অভ্যাস করাইতে লাগিল। প্রাণের দায়ে আপ্রাণ চেষ্টায় সকলেই ক্রমে সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় পল্লীতে পল্লীতে অলিতে গলিতে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ধূপধূনা জ্বালাইয়া ফুল-চন্দন দিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে কীর্ত্তনের অভিনন্দন হইতে লাগিল।

চম্পটী ঠাকুর সিংহবিক্রমে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে কৃপাশিস লইয়া অমিত উদ্যমে তিনি হরিকীর্ত্তন উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। নগরকীর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট দিনে সবদিক হইতে যাহাতে সকলে আসিয়া গড়ের মাঠে মিলিত হয়, তাহার জন্য পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

সেইদিন কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করা অসাধ্য। চতুর্দ্দিক হইতে কীর্ত্তনের দল নিশান উড়াইয়া শঙ্খ কাঁশর, খোল করতাল বাজাইয়া হরিনামের মহারোল তুলিয়া গড়ের মাঠে আসিয়া মিলিত হইল। কীর্ত্তন রোলে আকাশ মুখরিত। মৃদঙ্গের ঘন গর্জ্জনে ধরণী কম্পিত। সহস্র সহস্র কণ্ঠের হরিনামের ধ্বনিতে দশদিক পরিব্যাপ্ত।

বড়লাট সাহেব লর্ড কার্জ্জন, বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণ, দ্বারিকা নাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ জ্ঞানীপণ্ডিত ভক্তসজ্জন কীর্ত্তন-বাহিনীকে সুশৃঙ্খলিত করিতে লাগিলেন। প্রেমের পাগল চম্পটী ঠাকুর সকল দলেই বিদ্যুৎবেগে নাচিয়া বেড়াইয়া প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। গড়ের মাঠে সর্ব্বদল মিলনে সমবেতভাবে কীর্ত্তন হইল। তাহাতে গগনভেদী ধ্বনি উঠিল।

তৎপরে একসঙ্গে সহরের বড় বড় রাস্তা ভ্রমণ করিতে কীর্ত্তনের দল যাত্রা করিল। সর্ব্বাগ্রে রামবাগানের দল। আশা, ছোটা, নিশান আগে যাইতেছে। হরিদাস মৃদঙ্গ লইয়া সুমধুর নৃত্য সহকারে চলিতেছে, উচ্চস্বরে রোল তুলিয়াছে। তিনকড়ি ডোম কণ্ঠ খুলিয়া গাহিতেছে।

"হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিবে, যেন সহস্র হস্ত

দূর হইতে শ্রবণ করা যায়।" প্রভুবন্ধুর এইবাণী স্মরণ করিয়া তাহারা উচ্চ রোলে নাম ধরিয়াছে। কীর্ত্তনবাহিনী যখন বড়-বাজারে পোঁছিল, তখন মাড়োয়ারী মহিলারা রাস্তার দুইদিকের দালান হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনানন্দে সকলেই ভাসিয়া চলিতে লাগিলেন।

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন সকলেই হরিনাম ধ্বনি করিয়া নাচিল, জ্ঞানী মানী পণ্ডিত মূর্খ একত্র হইল। রাস্তায় নৃত্য করিল। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। রাত্র অধিক হইলে কীর্ত্তনের দলসকল ভাগ হইয়া যে যার পল্লীর দিকে চলিয়া গেল। হরিনামের অমৃত বর্ষণে মৃতপ্রায় কলিকাতা নগরী পুনর্জীবিত হইল। দেখিতে দেখিতে দুষ্ট প্লেগের বীজ-সমূহ নির্ম্মূল হইল। সহর শান্ত হইয়া গেল, হরিনামের অপূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। চম্পটী ঠাকুর আজ মহানগরীতে প্রভুর সেই বিশেষ শক্তির বিকাশ দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া হরিহরি বোল বলিয়া মত্তহস্তীরমত সহরময় ছুটিতে লাগিলেন।

রামবাগান হরিসভায় বিশিষ্ট কতিপয় ভক্তসমক্ষে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছিলেন, "এখন আমি ঘরে ঘরে সেধে বেড়াচ্ছি, কেউত হরিনাম করল না। দেখবি এমন একদিন আসবে, সেদিন ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, সাধু অসাধু সকলেই নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। তখন দায় ঠেকে সকলে হরিনাম করবে।"

এই মহাবাণীর অরুণাভাস ক্রমশঃ বিকাশিত হইতে লাগিল।

শুধু তোমাকেই চাই

বৈশাখ মাসের প্রথমদিন (১৩০৮) নববর্ষে ভক্তগণ শ্রীশ্রীপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইবার জন্য দলে দলে কীর্ত্তন লইয়া শ্রীঅঙ্গনে আসিলেন। মন্দির ঘিরিয়া তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীমন্দিরের ভিতর হইতে নানাবিধ দ্রব্য কীর্ত্তনের মধ্যে ফেলিতে লাগিলেন।

সন্দেশ রসগোল্লা, বাতাসা, কদমা তিলা, বস্ত্র গামছা, আংটি, ঘড়ি, টাকা পয়সা, আধুলী, সিকি সবই ফেলিতে লাগিলেন। সকলে যে যার মত কুড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ লুট প্রভু প্রায়ই দিতেন। আনন্দের আতিশয্যেই দিতেন। কীর্ত্তনের রোল শুনিলেই আশে পাশের লোকেরা লুটের লোভে ছুটিয়া আসিত।

কোন কোনদিন লুট দিতে বিলম্ব হইলে ছেলেমেয়েরা বলিতে থাকিত, "পিরভু নুট পিরভু নুট" সেইদিনকার লুটে শ্রীঅঙ্গের বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত দিয়া দিতেন।

সেইদিন কীর্ত্তন শেষ হইলে ভক্তগণ লুট লইয়া যে যার মত চলিয়া গেল। ফরিদপুর সহরের বালকভক্তদের কতিপয় শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে বসিয়াই রহিল। প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তোরা কি কিছু লুট পেয়েছিস্ ?"

দেবেন অক্ষয় সুরেশ নকুল ও উপেন প্রভৃতি বালকগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে দেবেন কহিলেন, "আমরা তোমার

কাছে বাতাসা মিষ্টি, কাপড়, হীরা মাণিক, নিতে আসি নাই। তুমি আমাদিগকে ওসব প্রলোভন দিয়া ভুলাইও না। ওসব যারা চায় তাদের দেও গিয়া। আমরা আর কিছু চাই না। "শুধু তোমাকেই চাই।"

হাসির ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হাঁ ভাই, আউ ছিঃ তোমরা ওসব নিবে কেন? তোমরা হরিনাম করবে ও পবিত্র প্রেমধনে ধনী হবে।"

ভক্তসঙ্গে কলহ-কৌতুক

ঢাকা হইতে তারকেশ্বর বণিক নামক একটি যুবক বিএ. পরীক্ষা দিয়া শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

তাহার ভাবভক্তি ও ত্যাগ বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহাকে গোপীকৃষ্ণ দাস বলিয়া ডাকিতেন।

সহর হইতে বালকভক্তগণ আসিলে, প্রভু তাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ আলোচনা করিতেন। আবার, গোপীকৃষ্ণ দাসের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাহার কাছে সহরের বালকদের অনিষ্ঠা অনাচারের কথা কহিতেন। প্রভুর কথার ভঙ্গিতে তারকেশ্বরের মনে হইত যে, তিনিই প্রভুর অধিকতর অন্তরঙ্গ ও প্রিয়জন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল,

যাহাতে সকলেই মনে করিত যে, তাহাকে যেমন প্রভু ভাল-বাসেন, তেমনটি আর কাহাকেও বাসেন না।

তারকেশ্বর অনেকসময় বালকদিগকে শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিতে বা শ্রীমন্দির স্পর্শ করিতে বাধা দিতেন। বলিতেন, তোমরা পবিত্র নও, আচার নাই নিষ্ঠা নাই। প্রভুও তারককে একাকী পাইলে বলিতেন—"তুই অঙ্গনের সেবাইত, অঙ্গন পবিত্র রাখবি। সহুরে বাবুদের নিষ্ঠা পবিত্রতা নাই, ওরা ভোগ বিলাসী, ওদের যখন তখন আঙ্গিনায় ঢুকিতে দিস্ কেন?"

প্রভুর এইসব কথা শুনিয়া তারকেশ্বর আরও দৃঢ়ভাবে বালকদের বাধা দিত। বালকগণ তারকের সঙ্গে ঝগড়া করিতেন। প্রভু ঘরে বসিয়া শুনিয়া হাসিতেন। অনেক ঝগড়া করিয়া বালকগণ প্রভুর অঙ্গনে ও মন্দিরে ঢুকিয়াই পড়িতেন।

পুনরায় প্রভু তারকেশ্বরকে কার্য্যান্তরে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া, বালকদিগকে কহিতেন, "তোরা হ'লি আমার আপন জন, তোরা শ্রীঅঙ্গনে আসিতে অন্যের অনুমতির অপেক্ষ করবি কেন। তারক দুদিনের বরেগী, ওর কথা তোরা শুনবি কেন?"

এইরূপভাবে তারকেশ্বরের সঙ্গে বালকভক্তদের কলহ বাঁধাইয়া দিয়া রঙ্গরাজ বন্ধুহরি আমোদ করিতেন। পরে দ্বন্দ্ব গুরুতর হইয়া উঠিলে শেষে নিজেই মধ্যস্থ সাজিয়া বিচারক হইয়া বিবাদের আপোষ করিতেন। ইহাতে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

চৌকী-চোর

"চৌরাগ্রগণ্যং শিরসা নমামি"

ঢাকায় রমেশচন্দ্র টিকাটুলীর বাগান ছাড়িয়া মৌলভী বাজারে অবস্থান করিতেছেন। রামচন্দ্র ঘোষের একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া রমেশচন্দ্র সেখানে মেস করিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রের বাসা নয়াবাজারে। সুধন্ব থাকেন গ্রেটবেঙ্গল মেসে।

প্রভু পত্র দিয়াছেন রমেশচন্দ্রকে, "শীঘ্রই ঢাকা আসিব, তোমাদের সঙ্গে রহিব।" রমেশচন্দ্র সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঐ মৌলভী বাজার মেস বাড়ীরই একটি দোতালার ঘর ভাল করিয়া ধুইয়া পবিত্র ভাবে রাখিয়া দিলেন। বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপকে সঙ্গে করিয়া ঢাকা আসিলেন। গোপীকৃষ্ণকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রামচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর দোতালার কোঠায় প্রভু থাকিলেন। ভোগের রান্নাঘর থাকিল তিন তালায়। তিন তালার ছাদেও প্রভু বসিতেন ও বেড়াইতেন। মেসে কালীমোহন ও তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুর্গামোহন থাকিতেন। তাহারা উভয়ে রমেশচন্দ্রের অনুগত। শ্রীশ্রীপ্রভু কালীমোহনের নূতন নাম করিলেন কালিন্দীমোহন। দুর্গামোহনকে ডাকিলেন অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহনের বয়স ছিল খুবই কম।

পূর্ণচন্দ্র বাজার হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্য একখানা নূতন কাপড় ও একখানা বসিবার জলচৌকী কিনিয়া আনিয়াছেন। কাপড় ও চৌকী দুইটি বস্তুই ধৌত করিয়া তিনতালার ছাদে

শুকাইতে দিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু আর উহা তাঁহাকে দিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজ হাতে কাপড় নিয়া পরিধান করিয়াছেন ও জলচৌকি নিয়া উপবেশন করিয়াছেন। উহা নিবার সময় বালক অনঙ্গমোহন মাত্র দেখিয়াছিল, অপর কেহ দেখে নাই।

পূর্ণচন্দ্র এটা ওটা কাজকর্ম্ম সারিয়া-ছাদে গিয়া দেখেন, কাপড় নাই জলচৌকীও উধাও। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি এদিক ওদিক খুব খুঁজিতে লাগিলেন। সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। অবশেষে অনঙ্গমোহন বলিল, পূর্ণদাদা, কাপড় ও জলচৌকী প্রভু নিজ হাতে নিয়েছেন, আমি নিতে দেখেছি।

এইকথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র অন্তরে বিপুল আনন্দ চাপা রাখিয়া, বাহিরে রাগতঃ ভাবে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—এ বাড়ীতে এত চোরের আড্ডা হলে ত থাকাই মুস্কিল হবে। এই ত কাপড়খানা ও চৌকীখানা রোদে দিয়ে গেলাম, এর মধ্যে চোরে নিয়ে গেল! এ কী হল! এত চোর নিয়ে কিকরে এ বাড়ী থাকব।

ভক্তের মধুর গালি শুনিয়া প্রভুবন্ধু গৃহমধ্যে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"জয়চন্দ্র বাঁচ্‌বে রে"

জয়চন্দ্র গুহ নামক একটি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র সুধন্বের প্রিয়জন। এক মেসে পাশাপাশি থাকেন। হঠাৎ জয়চন্দ্র কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বিখ্যাত প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ চিকিৎসকগণ জয়চন্দ্র সম্বন্ধে নিরাশা হইয়াছেন। জয়চন্দ্র এখন মৃত্যুশয্যায় কেবল দিন গণিতেছেন।

একদিন পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্বকুমারকে কাছে পাইয়া জয়চন্দ্র বলিলেন, "ভাই, আমি ত মরণের দিন গণিতেছি। তোমাদের প্রভু ত ভগবান। তিনি ত ইচ্ছা করিলেই আমায় রক্ষা করিতে পারেন। ভাই, তোমরা আমার হয়ে প্রভুকে আমার কথা বলিও। আমি চিকিৎসকদের ভরসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রভুকেই আত্মসমর্পণ করিলাম।"

সুধন্বকুমার রমেশচন্দ্রের নিকট আসিয়া জয়চন্দ্রের কথা বলিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া প্রভুর কাছে গিয়া জয়চন্দ্রের কথা নিবেদন করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "বড় কঠিন ব্যাধি, কঠিন চিকিৎসা করিতে হইবে।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন,—প্রভু, ঢাকার বড় বড় চিকিৎসক দ্বারা বিস্তর চিকিৎসা করান হইয়াছে, আর কী কঠিন চিকিৎসা করিতে হইবে? শ্রীশ্রীপ্রভু সুগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"হরিনাম করিতে বলিও।"

সন্ধ্যায় রমেশ সুধন্ব ও পূর্ণকে লইয়া জয়চন্দ্রের নিকট গমন

করিলেন। গিয়া বলিলেন, "জয়চন্দ্র, প্রভু তোমাকে হরিনাম করিতে বলিয়াছেন।" জয়চন্দ্র চক্ষের জল ছাড়িয়া কহিলেন, "ভাই, তাহলে আমি আর বাঁচব না। মৃত্যুকালেই ত লোকে হরিনাম করে, প্রভু আমার মৃত্যু জানিতে পারিয়াই হরিনাম করিতে বলেছেন।" এইরূপ বলিয়া হা হুতাস করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন যে, মৃত্যুকালেই যে হরিনাম করে তা নয়, হরিনাম করিলে মৃত্যুর ভয় হইতে রক্ষাও পাওয়া যায়। প্রভু গানে লিখিয়াছেন, "হরিবলে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে" তুমি হরিনাম দ্বারা নিয়তির হস্ত হতে অব্যাহতি পাবে।"

জয়চন্দ্র কোন কথাই বুঝিতে চায় না। মরণভয়ে সে সর্ব্বদা শঙ্কিত। একটি যুবক মরণের মুখোমুখি, অথচ মরিতে সে কিছুতেই চায় না—কাতর ভাবে বাঁচতে চায়—ইহা দেখিয়া রমেশচন্দ্রের প্রাণটা গলিয়া গেল। জয়চন্দ্র কিসে বাঁচিবে, ইহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইল।

সারাদিন কাটিল। প্রভুর নিকট ওবিষয় আর সাড়া পাওয়া গেল না। রমেশচন্দ্রের অন্তর কাঁদিতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় যেমন অনুগতজনদের সঙ্গে লইয়া বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে যান—আজও তেমন গিয়াছেন। স্নান করিতে করিতে রমেশচন্দ্র, সুধন্বকুমার, পূর্ণচন্দ্র কালিন্দীমোহন প্রভৃতি সকলকে বলিলেন, "এস ভাই, আমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, প্রভু যদি জয়চন্দ্রকে না বাঁচান, তাহলে আমরা আর প্রভুর নাম করব না।" রমেশচন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়া সকলে একযোগে

গঙ্গায় দাঁড়াইয়া বলিল, "প্রভু, তুমি যদি জয়চন্দ্রকে না বাঁচাও তাহা হইলে আমরা আর তোমার নাম করব না।"

স্নান করিয়া মেসে আসিবামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "ওরে জয়চন্দ্র বাঁচবে রে বাঁচবে। আয়ু আর ছিলনা, তোদের প্রবল আগ্রহ বাঁচাইল।" সুধন্যকুমার ছুটিয়া গিয়া জয়চন্দ্রকে সংবাদ দিল। "ভাই, প্রভু বলেছেন, তুমি বাঁচবে।" জয়চন্দ্রের শুষ্কমুখে হাসি ফুটিল। তারপর "জয় জগদ্বন্ধু জয় জগদ্বন্ধু" বলিতে বলিতে চার পাঁচদিন মধ্যে জয়চন্দ্র আশ্চর্য্য ভাবে নীরোগ হইয়া গেল।

লোভে সেবা বাদ

কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্র লোভের উদয় হইলে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহা গ্রহণ করিতেন না। যার আগ্রহ হইয়াছে তাহাকেই উহা দিতেন। ভক্তগণ উহা জানিতেন ও বহুদিন দেখিয়াছেন। তবু কখনও অজ্ঞাতসারে কখনও বা জ্ঞাতসারেও ভুল করিয়া ফেলিতেন।

জয়চন্দ্র সুস্থ হইবার কয়েকদিন পর পূর্ণচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন। ঠিক সেই সময় জয়চন্দ্রের অপর একজন বন্ধু দুইটি সুন্দর ফজলি আম লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আম দুইটিকে জয়চন্দ্রের কাছে দিতেই---পূর্ণচন্দ্র ছোট আমটি হাতে ধরিয়া বলিলেন, ভাই চাকু আন, আম খাওয়া যাক।"

জয়চন্দ্র বলিলেন—"ভাই এ আম প্রভুর জন্য এনেছি

—চল এখন যাই প্রভুকে দিই গিয়ে।" পূর্ণ লজ্জিত হইয়া আম জয়চন্দ্রের হাতে ফেরত দিলেন। উভয়ে আম লইয়া মৌলভীবাজার মেসে আসিলেন। সুস্থ হইবার পর জয়চন্দ্র এই প্রথম বাহির হইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। জয়চন্দ্র রমেশচন্দ্রের হস্তে আম দুটি দিয়া বলিলেন—"প্রভুকে দিবেন, যাতে খান তাই কর্‌বেন।"

রমেশচন্দ্র তখনই প্রভুর ঘরে গিয়া প্রথমে বড় আমটি তৈয়ারী করিয়া প্রভুকে দিলেন। প্রভু সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলেন পরে ছোট আমটি বানাইয়ে দিতেই প্রভু বলিলেন—"উহা পূর্ণকে খাইতে বলিস।" রমেশচন্দ্র আম লইয়া পূর্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন "পূর্ণ এই আম প্রভু তোমাকে খাইতে বলিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অন্যদিন প্রভু একসঙ্গে চার পাঁচটী আম গ্রহণ করেন, আজ একটা নিয়াই এরূপ বলিলেন কেন, বুঝিলাম না।" পূর্ণচন্দ্র তখন ঐ আমের বৃত্তান্ত সকলই খুলিয়া বলিলেন। রমেশচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন, "ভাই, বাঁচলাম, আমি ভেবেছিলাম আমারই লোভ হইয়াছিল কিনা। মনের সূক্ষ্মতম স্তরের ক্ষীণতম স্পন্দনও প্রভুর অগোচর থাকে না। আমাদের মনের যে খবর আমরা নিজেরা জানি না, তাহাও প্রভু জানেন।"

সেই আম তখন অগত্যা সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল।

ভক্তের দুঃখ দূর

উপরোক্ত আমের ঘটনায় পূর্ণচন্দ্রের মন বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। যদিও ঐ আম প্রভুর সেবার্থ ইহা জানিয়া তিনি লোভ করেন নাই, তথাপি তাহার খাইবার ইচ্ছায় প্রভুর সেবা বাদ হইল, এজন্য মনের মধ্যে চরম উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রভুকে চিড়ার মিষ্টান্ন করিয়া দিবার জন্য পূর্ণচন্দ্র দুগ্ধ আনিয়া ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া রাখিয়াছেন। চিড়া চিনি ও ঘৃত আনিয়াছেন। চিড়াটা ধুইয়া বাছিয়া ছাদের উপর রৌদ্রে দিয়াছেন। সেবার অন্যকোন কার্য্যে কিছু সময় মনোনিবেশ করায় চিড়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তারপর ফিরিয়া গিয়া দেখেন চিড়া নাই।

কোথায় গেল চিড়া ভাবিয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে দেখা গেল, প্রভু নিজে চিড়া আনিয়া খাইবার প্রয়াস করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রও ছুটিয়া গিয়া গৃহ হইতে ঘনদুগ্ধ ও চিনি ঘৃত আনিয়া প্রভুর চিড়ার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। প্রভুও পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে উহা গ্রহণ করিলেন। প্রভুর মধুর হাসিতে পূর্ণের আমের দুঃখ দূর হইয়া গেল।

———

জয়চন্দ্রের সুগন্ধি

জয়চন্দ্র একটি সুগন্ধি আনিয়া রমেশচন্দ্রের হাতে দিলেন প্রভুর সেবার জন্য। রমেশচন্দ্র ওটি ঘরে আনিয়া রাখিলেন। পরে আর খুঁজিয়া পান না। শেষে প্রভুর ঘরে গিয়া দেখেন এসেন্সের শিশি খালি পড়িয়া আছে।

শিশিটা হাতে তুলিয়া রমেশচন্দ্র প্রভুর দিকে তাকাইলে প্রভু বলিলেন, "রমেশ রে, প্রস্রাবের জায়গাটা বড় দুর্গন্ধ হইয়াছিল। সেখানে জয়চন্দ্রের এসেন্স ঢালিয়া দিয়াছি।" রমেশচন্দ্র বলিলেন "তা' ভালই করিয়াছ।"

পরদিন জয়চন্দ্র আসিলে রমেশচন্দ্র বলিলেন, জয়চন্দ্র, তোমার খুব ভাগ্য—তোমার সুগন্ধি প্রভু নিজ হাতে নিয়া নিজ সেবায় লাগাইয়াছেন। পূর্ব্বে তোমার দেহের ব্যাধি সারাইয়াছেন তোমার মনের ব্যাধি কিছু ছিল আজ তাহাও দূর করিয়া তোমাকে নির্ম্মল করিয়াছেন। তোমার দেওয়া সুগন্ধির মত, তোমার জীবনও সুগন্ধ হইবে।

জয়চন্দ্র বলিলেন, রমেশবাবু, কেবল আপনার প্রভুই অন্তর্য্যামী নন, আপনিও। আপনিই আমায় বাঁচাইয়াছেন—আমার জীবন আপনার হাতে দিলাম। নির্ম্মল করিয়া লইয়া আপনার প্রভুর পদে অর্পণ করুন।"

———

"গোবিন্দ আয়"

গো জাতির প্রতি প্রীতি শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বাভাবিক। গাভী বা বৎস দেখিলেই যেন কেমন হইয়া যান। ব্রজের রাখালিয়া ভাবের উদয়ে বালমাধুর্য্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

গাভী-বৎসগুলিরও সেই দশা। তারা প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিলে বা অঙ্গস্পর্শ পাইলে বা মধুর কণ্ঠের ডাক শুনিলে কেমন যেন চকিতের মত উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া সকল ভুলিয়া মোহনের দিকে চাহিয়া থাকে। বহুস্থানে বহুবার এই দৃশ্য ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে ঐ দৃশ্য দর্শন করিত, তাহার হৃদয়েও সেইকালে গোকুলের গো গোপালের লীলাবিলাস স্ফূর্ত্তি হইত।

মৌলভীবাজার রামবাবুর বাড়ীতে থাকাকালে বন্ধুসুন্দর একটি সদ্যোজাত বৎস সঙ্গে মধুর লীলা করেন। বৎসটি কেবলমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে। গাভী ও বৎসের মালিক বাস করেন রামবাবুর বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে। বৎসটি মাটিতে শুইয়া আছে মায়ের কাছে। শ্রীশ্রীপ্রভু দোতালা হইতে তাহাকে—

"গোবিন্দ গোবিন্দ আয় আয়"

বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মধুর ডাক শুনিয়া বৎসটি ঠক ঠক করিতে করিতে সিঁড়ি ধরিয়া ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। দোতালার উপর শ্রীশ্রীপ্রভুর আসনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে কোলে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বৎসের অঙ্গ স্পর্শে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পুলক ও প্রভুর

স্পর্শে বৎসটির চোখে জলধারা ও মুখে লালাধারা বহিতে লাগিল। বৎস বৎসপালের মিলনে ভাণ্ডীর বনের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।

ওদিকে বৎসহারা গাভী পাগলের মত চারিদিকে হাম্বা হাম্বা করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। গো-বৎসের মালিক এদিক ওদিক রাস্তাঘাট বহু খুঁজিয়াও বাছুরের সন্ধান করিতে পারিলেন না। গাভীর ঘন ঘন কাতর ডাকে পাড়ার লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ওদিকে মাতৃহারা বৎসের কিন্তু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। বালক শ্রীমান অনঙ্গমোহন (দুর্গামোহন) রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। বাছুরটির কথা একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, একটা বাছুরকে সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়াছে। বালকের এই কথা ক্রমে গাভীর মালিক শুনিলেন। তিনি উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, প্রভুর কোলের কাছে তার বাছুর নিশ্চিন্তে শুইয়া আছে।

কিসের আকর্ষণে ক্ষুদ্র সদ্যোজাত বৎস এত দীর্ঘ সময় নিজ মাতৃ-সান্নিধ্য ছাড়িয়া ক্ষুৎপিপাসা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া এতগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, নিশ্চিন্তে অবস্থান করিল—তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। বাছুরের মালিক যখন বাছুরকে আনিতে চেষ্টা করিলেন, তখন মনে হইল বাছুর প্রভুর সান্নিধ্য ছাড়িয়া আসিতে চায় না। শেষে যখন জোর করিয়া কোলে তুলিয়া আনিলেন, তখন বাছুর প্রভুর দিকে তাকাইয়া কাতর ভাবে হাম্বা হাম্বা করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভুও বাছুরের দিকে তাকাইয়া গোবিন্দ যাও গোবিন্দ যাও” বলিতে লাগিলেন।

———

এছাহেক ফকিরের দর্শন

ঢাকা অঞ্চলে বহু মুসলমান ফকীর দরবেশ বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অনেক ফকীর দরবেশই প্রভু বন্ধুসুন্দরের রূপগুণ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ছিলেন। প্রভু বন্ধুসুন্দরও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। কারণ, যেমন ছিলেন ফকীররা, তেমন ছিলেন প্রভু হিন্দুমুসলমান ভেদ বুদ্ধির বহু উর্দ্ধে। শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় নিজেকে ফকীর বলিয়া পরিচয় দিতেন ও লিখিতেন।

ঢাকার বিখ্যাত এছাহেক ফকীর থাকিতেন নয়াবাজারের নিকট। শ্রীশ্রীপ্রভু আছেন মৌলভী বাজার। ফকীরের প্রভু-দর্শনের ব্যাপার লইয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ফকীর সাহেব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, এক দিব্যমূর্ত্তি নবী ফরিদপুর হইতে ঢাকায় আসিয়াছেন, রামবাবু জজের বাড়ী আছেন।

ফকিরসাহেব অনুসন্ধান করিয়া, পরদিন সকালেই যথাস্থানে উপনীত হইয়াছেন। দুয়ারে যাহাকে পাইলেন, তাহাকেই নিজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফরিদপুর থন পিরভু আইচে, আমি দেখবার লাইগা আইচি। দেহন্ যাইব না?" রমেশচন্দ্র দোতালায় প্রভু থাকিবার ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐস্থানে প্রভু আছেন, আপনি যান দর্শন করুন গিয়ে।"

রমেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ফকীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কী, আমার যাইয়া দেহন লাগব? তিনি নিজে দেহা দিব না? যদি আমার গিয়াই দেহন লাগে তো ঘরে বইসাই দেহুম। এই

বলিয়া ফকীর চলিয়া গেলেন। রমেশচন্দ্রের আর কোন কথাই শুনিলেন না। ইহার তিনদিন পর, পূর্ণচন্দ্র সুধন্বকুমার কালিন্দীমোহন প্রমুখ প্রিয়জনদের লইয়া রমেশচন্দ্র সন্ধ্যায় বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন। নিত্যই যান তিনি। তাহারা স্নান করিয়া ফিরিবার সময় নয়াবাজার ঐ ফকীরের দরগার নিকটস্থ পথ ধরিয়া ফিরিতেছিলেন। দরজা অতিক্রম করিবার কালে সকলে মিলিয়া "জয় জগদ্বন্ধু" বলিয়া উচ্চধ্বনি দিয়াছেন।

ধ্বনি শুনিয়াই ফকীর সাহের দরগার বাহির হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া পূর্ণচন্দ্রের মুখখানির দিকে অপলকে তাকাইয়া থাকিলেন। টপটপ করিয়া পবিত্র অশ্রুবিন্দু গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। ফকীর কোনপ্রকারে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—

"পিরভু, তুমি দেহা দিলা। তুমি দেহা না দিলে না খাইয়া মইরা যাইতাম। তিনদিন কিছুই খাই নাই। তুমি যে ফরিদপুর থন আইছ,মুই খোয়াবে দেখ্‌ছি। আমি তোমারে ভকতি করুম।"

এই কথা বলিয়া প্রণাম করিতে যাইতেই, পূর্ণচন্দ্র রমেশ-চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রমেশচন্দ্র ফকিরের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া তারপর পূর্ণচন্দ্রকে প্রণাম গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রমেশচন্দ্রের আদেশ পাইয়া পূর্ণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ফকীর আর্তভাবে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। পুনঃ উঠিয়া বলিলেন, "কও, আমার আর কোন ভয় নাই।" পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "কোন ভয় নাই।" ফকীর ঐরূপ তিনবার

জিজ্ঞাসা করাতে পূর্ণচন্দ্রও তিনবার ঐ উত্তর দিলেন। কথাটা বলিবার কালে পূর্ণচন্দ্রের মুখখানাও যেন হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের শ্রী ধারণ করিল। পরমুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। ফকীর দরগায় চলিয়া গেলেন। রমেশচন্দ্র স্বগণে যথাস্থানে আসিলেন।

বাসায় পৌঁছিয়াই পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ রমেশচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! এ কী হ'ল।" রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভুই তোমার ভিতর দিয়া ফকীরকে ঐরূপ দর্শন দিয়াছেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমাদের সকলকে ফকীর পূর্ব্বে অনেকবার দেখেছে ও ভালই চিনে। আজ চিনল না কেন? সে আজ আর তোমাকে দেখে নাই, প্রভুকেই দেখেছে। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় আবার যাইয়া দেখ, তোমাকে প্রভু মনে করে কি না?"

পরীক্ষার্থ পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্বকুমার পুনরায় ফকীর সাহেবের কাছে গেলেন, পরম হাস্যময় বদনে ফকীর পূর্ণ ও সুধন্বের মাথায় হাত দিয়া বাৎসল্যভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওরে তোগো কপাল ভালো। আসল জিনিষ পাইছিস্। ধইরা থাকিস। মধুর চাক পাইছিস্। ধইরা থাকলে মধু খাইতে পারবি। আমি তোগো লাইগা দোয়া করুম।" পূর্ণ ও সুধন্ব ফিরিয়া আসিয়া সবকথা রমেশচন্দ্রকে জানাইলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "পূর্ণ, যিনি স্ফটিকস্তম্ভ হইতে প্রহ্লাদকে দেখা দিয়াছেন, তিনি তোমার ভিতর দিয়া ফকীরকে দর্শন দিবেন—ইহাতে অত আশ্চর্য্যান্বিত হও কেন?"

দুইটি ভাব

শ্রীভগবান যখন মানব লীলায় আসেন, তখন তাহাতে দুইটি ভাব বিরাজমান থাকে। একটি ভগবদ্ভাব, অপরটি মানবীয় ভাব। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরে দুইটি ভাব—একটি "হরিপুরুষ" ভাব, অপরটি "জগদ্বন্ধু" ভাব।

হরিপুরুষভাবে তিনি আপনাতে আপনি। স্বয়ং স্বরূপে সমাবিষ্ট। জগদ্বন্ধুভাবে তিনি জগতের সকল নরনারীর প্রিয়। যখন আপনজন সমভিব্যাহারে থাকেন, তখন তিনি বন্ধুরূপে সকলের পরম প্রীতির বিষয়। শ্রীহরিপুরুষরূপে হরিশব্দবাচ্য একমাত্র পুরুষ তিনি। অনন্ত বিশ্বের আশ্রয়ের আশ্রয়। জীব জগৎ যা কিছু সবই তাঁহার আশ্রিত।

জগদ্বন্ধুরূপে তিনিই ভক্তের আশ্রিত। নির্ম্মল প্রেমে বাঁধা। নিখিল ভক্তের ভক্তিরসের তিনি তখন পরম বিষয়। সংক্ষেপে বলিলে, তিনি পুরুষরূপে আশ্রয়-তত্ত্ব, বন্ধুরূপে বিষয়-তত্ত্ব। এই দুইটি ভাবে কোনও কোনও সময় বিরোধও বাধে।

কুরুক্ষেত্রে ব্রজপ্রিয়াগণের সহিত সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ভাব স্থিত। আশ্রয়-তত্ত্বরূপে বিরাজিত। কিন্তু গোপিণীগণ তাঁহাকে প্রীতির বিষয়-তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিতে লালসান্বিত। তাই তখন ভক্ত-ভগবানের কথাবার্ত্তাও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

গৌরসুন্দর রহিয়াছেন ভক্তভাবে, প্রিয়জন কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে ভগবান জানিয়া। সানন্দে কীর্ত্তনে ছুটিয়া

আসিয়া গৌরহরি নিজনাম শুনিয়া বিমনা হইয়া গম্ভীরভাবে ফিরিয়া গিয়াছেন। এখানে ভক্ত-ভগবানের ক্রীড়া হইয়াছে আপাত বেদনাদায়ক। আনন্দলীলার সমুদ্রে এগুলি বিভিন্ন সঞ্চারিভাবের তরঙ্গ।

ভাব-বিরোধিতা

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর আছেন মৌলভীবাজার বোর্ডিং বাড়ীতে। রমেশাদি প্রিয়জনেরা স্ব স্ব কার্য্যে গিয়াছেন। পার্শ্বে মাত্র নবদ্বীপ একা। কেন যেন, তাহাকেও চান না। কাজের ছল করিয়া অন্যত্র পাঠাইলেন। "নবদ্বীপ, তুমি যাও ত, চৌধুরী বাজার মহাপ্রভুর বাড়ীতে। গিয়া মোহান্তজীকে বলিবে, ওখানে কয়েকদিন থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা দর্শন করিব।" কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া নবদ্বীপ চলিয়া গেলেন।

বন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীহরিপুরুষভাবে তন্ময় হইয়াছেন। পরিপূর্ণ ঈশ্বরীয়ভাবে আনন্দে ডুবিয়া আছেন। পরমাত্মা পরম আত্ম-স্বরূপে তন্ময় আছেন।

শ্রীমান রামদাস আসিয়াছেন ঢাকার নিকটে এক ভক্তগৃহে উৎসব করিতে। দূর সম্পর্কিত এক ভক্ত-মাতুলের প্রীতির আকর্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন ঢাকা সহরে। শ্রীশ্রীপ্রভুর মৌলভী-বাজারের স্থিতিস্থান ওখান হইতে বেশী দূরে নয়।

প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবার পর আর এত সান্নিধ্যে আসেন নাই। ওখানে প্রভু আছেন জানা অবধি প্রতি মুহূর্ত্তে দর্শন লালসা তীব্রতর হইতেছে। মধ্যাহ্নবেলায় রামদাস বহির্গত হইয়াছেন প্রভু দর্শনে—এ যেন ব্যথিতা-বিরহিনীর দিবাভিসার।

পথের বাহির হইয়াই রামদাস শ্রীশ্রীপ্রভুর একটি নাগরী পদ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। ক্রমে সুর মধ্যমে উঠিল।

কি ক্ষণে হেরিনু গোরা সুরধুনী তীরে।
ঘিরিল মানস মোর নিরাশা তিমিরে॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিতধন গৌরাঙ্গসুন্দর।
পঙ্গু হয়ে বাঞ্ছা মোর লঙ্ঘিতে ভূধর॥
মাঝে কুল পারাবার, বহে খরতর ধার,
পরপারে গোরা গুণমণি।
নাহি মোর পুণ্যফল, প্রেমরাগ ভক্তিবল,
মুই অতি সামান্যা রমণী॥

রামদাসজী পদ গাহিতেছেন, আর আখর যোজনা করিতেছেন। ক্রমে গানের আখর চলিতে লাগিল, পদকর্ত্তা বন্ধুসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া। "তুমি গৌর-আদরিণী", "তুমি গৌর-সোহাগিণী", "তুমি গৌর-গরবিণী"। "গৌর-গরবিণী" কথাটি গায়কের বড়ই মধুর লাগিল। ফিরিয়া ফিরিয়া বন্ধুসুন্দরকে "গৌর-গরবিণী" সম্বোধনে ডাকিতে লাগিলেন।

গান শেষ করিয়া রামদাস দণ্ডবৎ করিয়া অন্তরের সংবাদ অন্তর্য্যামীকে জানাইয়া চলিয়া গেলেন। দেবতা নীরব হইয়া

নিজ কক্ষেই রহিলেন। কোনই সাড়া দিলেন না। বদ্ধকক্ষে যে কেহ আছেন, এরূপ কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না।

রামদাসজী চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই নবদ্বীপ আসিলেন।

মানীর অপমান

নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলেই শ্রীশ্রীপ্রভু অতীব সুগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ছাখ্ নবা, রামদাস এসেছিল, আমাকে ভয়ানক অপমান করেছে। সে আমাকে গৌর-গরবিণী বলে সম্বোধন করেছে। পুরুষকে প্রকৃতি সম্বোধন! যা—এখনি রামীকে নিষেধ করে আয়, প্রতিজ্ঞা করায়ে আয়, আর যেন ঐরূপ সম্বোধন কখনও না করে। আমি একমাত্র পুরুষ। পুরুষকে প্রকৃতি সম্বোধন কর্‌লে কতদূর অপমান করা হয়? মানীর অপমান মৃত্যুতুল্য।"

নবদ্বীপ দাস প্রভুর আদেশ অনুসারে রামদাসের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রামদাস তাহার মাতুল মহাশয়ের বাসাতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নবদ্বীপ সেই বাসার অনুসন্ধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামদাসজীকে বলিলেন—"আপনি আর কখনও প্রভুকে প্রকৃতি সম্বোধন কর্‌বেন না, প্রতিজ্ঞা করুন। প্রভু আপনার সম্বোধনে ভয়ানক অপমানিত হয়েছেন।"

রামদাস বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি আর কখনও ঐরূপ কর্‌বো না।" নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, প্রভু নিজেই কাপড়-চোপড় গুছাইয়া পোটলা বাঁধিতেছেন। নবদ্বীপকে কহিলেন, "এখনই চলিয়া যাব। ঘোড়ার গাড়ী আন।"

নবদ্বীপ দাস বলিলেন, "প্রভু এখন তো ট্রেণের সময় নয়।" প্রভু বলিলেন, "যা বলি শোন।" ঘোড়ার গাড়ী আসিল। প্রভু ঢাকা ষ্টেসনে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে ট্রেণের অপেক্ষায় রহিলেন। শেষে যথাকালে ট্রেণ ধরিয়া নারায়ণগঞ্জ আসিলেন।

আর্ত্তিতে আবির্ভাব

নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভু হঠাৎ ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পূর্ণচন্দ্র কিছুই জানিতে পারেন নাই।

পূর্ণচন্দ্র যেমন মাঝে মাঝে প্রভু-সেবার দ্রব্যাদি নিজ গৃহে তৈয়ারী করাইয়া লইয়া আসেন, সেইদিনও সেইরূপ লইয়া আসিয়াছেন। সেবার দ্রব্যাদি রমেশচন্দ্রের হাতে দিতেই তিনি বলিলেন, "পূর্ণ, প্রভু ত গতরাত্রে চলে গেছেন।" প্রভু চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া পূর্ণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

নয়নধারা বর্ষণ করিতে করিতে পূর্ণ বলিলেন—"প্রভু যদি চলিয়া গিয়াছেন তাহা হইলে আমাকে দিয়া এত দ্রব্য তৈয়ারী

করাইয়া আনাইলেন কেন? আমি এখন এসব দিয়া কি করিব? হায় হায়! আমার কি অপরাধ হইল। আমি কী মহা অপরাধ করিয়া সেবায় বঞ্চিত হইলাম। হা জগদ্বন্ধু, এ তোমার কী খেলা!" পূর্ণ যখন এইরূপ আর্ত্তি করিতেছেন, তখন যে-ঘরে প্রভু ছিলেন, সেইঘরের ভিতর হইতে হাততালির শব্দ আসিল। যেরূপ হাততালি দিয়া প্রভু রমেশচন্দ্রকে ডাকিতেন ঠিক সেইরূপ। শব্দ শুনিয়াই পূর্ণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, —"ঐ ত প্রভু ঘরে আছেন। কর্ত্তা (রমেশবাবু) কী আমায় পরীক্ষা করছেন। আর ছলনা করবেন না। সেবার দ্রব্য প্রভুর কাছে পোঁছিয়ে দিন।"

পূর্ণের অবস্থা দেখিয়া রমেশচন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া তাহার আনীত দ্রব্যাদি প্রভুর ঘরে দিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরে আবারও শব্দ হইল। পূর্ণ বলিলেন, "ঐ যে প্রভু ডাক্‌ছেন।" রমেশচন্দ্র প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর পূর্ণকে ডাকিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। নিয়া গিয়া বলিলেন, "পূর্ণ, এই দেখ শূন্য ঘর। ঘরে প্রভু নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! তোমার দেওয়া সেবার দ্রব্য প্রভু সবই গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেখ সন্দেশের খানিকটা নাই। লুচি দু'খানা ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন। মিষ্টান্নের পাত্রেও শ্রীহস্ত দিয়া বেশ একটু খাইয়াছেন।"

সকল ভক্তেরা গৃহমধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেলেন। রমেশ বলিলেন, "ভক্তের আর্ত্তিতেই ভগবানের আবির্ভাব।

পূর্ণের আর্ত্তিতে যে প্রভু স্বয়ং হেথায় এসেছেন, এতে আর সন্দেহ নাই।”

প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও সকলে বুঝিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভুর সাক্ষাৎ অধরামৃতের মতই প্রাণমাতান সৌরভযুক্ত।

ভগবানের ভগবত্তা ভক্তবাৎসল্যেই পর্য্যাপ্ত।

“ওরা আমায় সবাই চিনে”

এদিকে শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকা ষ্টেসনে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে ট্রেণের সময় পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলেন। পরে যথাকালে ট্রেণ ধরিয়া নারায়ণগঞ্জ আসিলেন। নারায়ণগঞ্জ আসিয়া গোয়ালন্দগামী ষ্টীমারে প্রথম শ্রেণীর কেবিনে উঠিলেন। নবদ্বীপ দাস সার্ভেন্টএর টিকেট করিয়া কেবিনের তুয়ারে বসিয়া থাকিলেন।

কেবিনের সম্মুখভাগে ফাঁকা জায়গায় কতগুলি চেয়ারে কতিপয় ইউরোপীয়ান বসিয়াছে। তাহারা প্রভুর রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছে।

অদূরবর্ত্তী তুইটি চেয়ারে উপবিষ্ট তুইজন ইউরোপীয়ান মহিলা দেখাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে কহিলেন, “ঐ দেখ, উহাদের একজনের আমার প্রতি বাৎসল্যভাব। আর একজনের মধুরভাব।” অপর একটি সাহেবকে দেখাইয়া বলিলেন, “উহার আমার প্রতি সখ্যভাব।”

নবদ্বীপদাস বলিলেন, "প্রভু, উহারা ত কেহ আপনাকে চিনেন না। উহাদের আপনার প্রতি ঐসব ভাব কিরূপে সম্ভব ?

প্রভু বলিলেন, "ওরা আমায় সবাই চিনে। আমি সংসারের সকলেরই নিজজন। কাহারও বা আমাকে মনে আছে, কেহ বা ভুলিয়া গিয়াছে। যাহারা ভুলিয়া রহিয়াছে তাহারাও আমায় দেখিলে আকুল হইয়া উঠে। ঐ দেখ, ওরা প্রাণের শুদ্ধ প্রীতির সহিত আমার দিকে কেমন সুন্দর দৃষ্টিপাত করিতেছে।" নবদ্বীপ দেখিলেন, সত্য সত্যই উহারা চিরপরিচিতের মত অতি অনুরাগভরে প্রভুর শ্রীবদনের দিকে চাহিয়া আছে। উহারা প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে একে অপরের কাছে মোহন রূপের বর্ণনা করিয়া কথা বলিতেছে। দেখিয়া মনে হয় উহাদের আনন্দ আর ধরিতেছে না।

"পাখীর সুর আমি বুঝি"

ষ্টীমারখানি নদী ভাঙ্গনের ধার দিয়া গ্রাম ঘেসিয়া চলিতেছে। বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপদাসকে তীরস্থ পাখীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপ, ঐ শোন ঘুঘু ডাকিতেছে ও সিন্ধু রাগে ধ্বনি করিতেছে। ঐ শালিকগুলি কানাড়া গাহিতেছে। ঐ যে চিলটা ডাকিতেছে, ওটা মালকোষ আলাপ করিতেছে।

অদূরে 'বউ কথা ক' পাখীর ডাক শুনিয়া বলিলেন, "ও কি রাগ গাহিতেছে, জানিস্ ?" নবদ্বীপদাস বলিলেন, "প্রভু, আমি ও সব কিরূপে জানিব।" প্রভু উত্তর করিলেন, "ওর কণ্ঠে ধানশ্রী

রাগ। দেখ, এ সব সাধারণ লোকে কিছু বোঝে না, পাখীর সুর আমি বুঝি। ওরা কখনও কখনও অন্তরের কথা নিবেদন করে। আমাকে জানায়।”

ষ্টীমারখানি মাঠের ধার দিয়া যাইতেছে। মাঠের শ্যামল শোভা দেখিয়া বন্ধুসুন্দরের ভাব-গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া উঠিল। রূপও যেন অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

একখানি চওড়া বেঞ্চের উপর বন্ধুহরি বসিয়া আছেন। রাঙা টুক্‌টুকে চরণ দু'টি জানুর উপর শোভা পাইতেছে, হেমদণ্ড ভুজ দু'টি ঈষৎ দোলাইয়া কথা বলিতেছেন। আকর্ণ বিশ্রান্ত আঁখি দু'টি রসাবেশে ঢলঢল।

“আমার তত্ত্ব আমি বল্‌ছি”

কিছু সময় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, প্রভু বন্ধুহরি বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—“আমার তত্ত্ব তোরা কেহই জানলি না, বুঝলি না। এখন আমার তত্ত্ব আমি বল্‌ছি, মনোযোগপূর্ব্বক শুনবি, গ্রহণ করবি, জগতের সকলকে জানাবি।”

বন্ধুসুন্দর বলিতে লাগিলেন—“অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে সেই, জান্‌লি?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরিকর। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধাম—বৃন্দাবন—বৃক্ষলতা পশুপাখী ইত্যাদির সমষ্টি। আর শ্রীশ্রীগৌরলীলার সর্ব্বপরিকর ও নবদ্বীপ ধামের সর্ব্বসমষ্টি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ও ধাম আর শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর ও ধামের সমষ্টি শ্রীহরিপুরুষ তত্ত্ব। আমি একক সর্ব্বসমষ্টি।

The Lila Combination of all Thing's.

শ্রীশ্রীহরিপুরুষের প্রকাশ নাম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু মহাবতারণ মহাউদ্ধারণ।

"আমি সকলের কেন্দ্র"

আপন তত্ত্ব আপন শ্রীমুখে বলিতে বলিতে ভাবের উল্লাসে বন্ধুসুন্দরের নয়নযুগল নিমীলিত হইয়া আসিল, কিছুক্ষণ নীরব ভাবে স্থির অচঞ্চল রহিলেন। শ্রীদেহে একটা শিহরণ খেলিল। তারপর আবার চক্ষু খুলিয়া নবদ্বীপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমাকে শুধু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কিংবা শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বলিলে চলিবে না। তবে কি আমি তা নই? আমি তাহাই বটে। তবে তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। বুঝলি! যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান আসিতে পারেন। যুগাবতারের ভগবান ও স্বয়ং ভগবানে কিছু পার্থক্য আছে। যুগাবতারে সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশ পায় না। একই ভগবান যুগাবতারে যে শক্তি লইয়া আসেন, তাহা অপেক্ষা

অধিক শক্তি লইয়া আসিয়া মহাউদ্ধারণে কার্য্য করেন। এটি শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি।

আরও প্রমাণ আছে। যুগাবতারের ভগবান আর স্বয়ং ভগবান একই জিনিষ। তবে শক্তি প্রকাশের তারতম্য আছে। যখন স্বয়ং ভগবান আসেন, তখন যুগাবতারের ভগবান তাহাতেই মিলিত হন। বুঝলি !"

"আর শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবি কি? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আসবার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিনবি। শক্তি প্রকাশ কর্‌লে ও জানালে জগৎ জানতে পারে।"

"আমার আগমনে জগতে সকল সাধু মহাপুরুষের আগমন। আমি সকলের কেন্দ্র।"

"তুই সকলকে আমার এই তত্ত্ব বল্‌বি ও সকলকে জানাবি। অনেক ভক্ত অভিমানে অবতার সেজে বস্‌বে। সাবধান! সকলকে নিষেধ করে দিস, কেহ যেন আমার জন্য নিতাই অদ্বৈত না সাজে। এবার আমার একাধারেই সব।"

"শরৎকে সংবাদ দে"

সন্ধ্যার পর প্রথম রাত্রিতে ষ্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। বন্ধুসুন্দর ষ্টীমার হইতে অবতরণ করতঃ নবদ্বীপ-দাসকে বলিলেন, "নবা, শরৎকে সংবাদ দে।"

শরৎচন্দ্র রায় গোয়ালন্দ ষ্টেসনের বড় বাবু। ইনি নবদ্বীপ দাসের আপন পিসতুত ভাই। নবদ্বীপ যখন বাল্যে চরনারায়ণপুর পিসীমার বাড়ী থাকিয়া রাজবাড়ী স্কুলে পড়াশুনা করিতেন, তখন শরতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হয়। নবদ্বীপ যখন প্রভুর কৃপালাভ করেন, তখন শরৎচন্দ্রের বন্ধু-দর্শন লালসা বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমে ঐ লালসা অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মনোনীত হইয়াও ঐ পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না, প্রভু দর্শনের উন্মাদনায়। প্রভু তখন নবদ্বীপ হরিসভায়। ধূলটের সময় বেণীনগরের নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন প্রভুর দর্শনে, শরৎও তখন তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়াছিলেন, সাধের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া। অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্ধুহরির রূপমাধুরী পান করিয়া শরৎ আনন্দভরে বলিয়াছিলেন, "ওরা দিচ্ছে পরীক্ষা, আমি দেখছি চৈতন্যলীলা।"

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কনিষ্ঠ ভুবনের (নবদ্বীপ দাস) মত বন্ধুসুন্দরের পদোপান্তে থাকিয়া চিরজীবনের মত সেবা ভাগ্য

বরণ করিতে। কিন্তু বন্ধুসুন্দর তাহাকে বলিয়াছিলেন, "শরৎ, তোকে সংসার ভোগ কর্‌তে হবে।"

এসব কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। এখন সেই শরৎচন্দ্র বিবাহাদি করিয়া সংসারাশ্রমী হইয়াছেন। এই গোয়ালন্দ ঘাটের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে তিনি এখন সসম্মানে অধিষ্ঠিত।

গোয়ালন্দ ঘাটে নামিয়াই প্রভু নবদ্বীপকে কহিলেন, শরৎকে সংবাদ দিতে। শরৎ নবদ্বীপের দাদা। কিন্তু নবদ্বীপ প্রভুর সেবানন্দে এমন তন্ময় যে, ওখানে দাদা চাকুরীতে আছেন, তাহা তাহার স্মরণেই আসে নাই। কিন্তু ভক্তবৎসল বন্ধুসুন্দর প্রিয় ভক্তের কথা কদাপি ভুলেন না। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে ছুটিয়াছিলেন, আজ অযাচিত ভাবে তাহাকে নিজ শ্রীচরণ সেবাভাগ্য দান করিতে বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপকে বলিলেন, "শরৎকে সংবাদ দে।"

শরৎচন্দ্রের বাসা অতি ছোট। সেখানে কোথায় প্রভুকে বসিতে দিবেন ভাবিয়া তিনি চিন্তাযুক্ত হইলেন। চিন্তাপূর্ণ মনে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীচরণে প্রণত হইতেই প্রভু বলিলেন—"শরৎ, তোমার বাসায় আমি যাব না—এখানেই কোথাও ব্যবস্থা করিয়া দেও।"

শরৎ বুঝিলেন, প্রভু অন্তরের কথা জানিয়াছেন। একটি গুদামঘরে নূতন চাটাই পাতিয়া তাহার উপর নূতন কম্বল বস্ত্রাদি দ্বারা শয্যা পাতিয়া দেওয়া হইল। প্রভু পরমানন্দে সেখানে বিশ্রাম করিলেন। সাধ্যমত দ্রব্যাদি আনিয়া শরৎচন্দ্র সেবার

ব্যবস্থা করিলেন। প্রভুর গ্রহণানন্তর দুই ভাই প্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিলেন।

দুই ভাই প্রভুর দুই চরণ পার্শ্বে বসিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। কত স্পর্শসুখ পাইলেন, কত অমৃতময়ী বাণী শুনিলেন। দুই ভাইয়ের কৈশোরের স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠিল।

তারকেশ্বরের বিদায়

শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপদাসকে লইয়া ঢাকা হইতে ফরিদপুর অঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চারিদিক হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিতেছেন। তারকেশ্বর বণিক আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে।

তারক প্রণাম করিতে গেলে প্রভু তিন পা পিছাইয়া গেলেন। প্রণাম লইলেন না। যেমন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন সেই আদর-মাখা সুরে "তারক রে" বলিয়া সম্বোধনও করিলেন না। তারক বুঝিলেন, তাহার অপরাধ অন্তর্য্যামী জানিতে পারিয়াছেন।

কলিকাতা থাকাকালে একদিন রামবাগানে এক কীর্ত্তন আসরে একটি ভক্তের সঙ্গে তারকের সুর তাল লইয়া কলহ বাধে। কথায় কথায় চটিয়া গিয়া তারক ভক্তটিকে করতাল দ্বারা আঘাত করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি কলিকাতা হইতে ফরিদপুর চলিয়া আসেন।

অপরাহ্নে বালকভক্তগণ শ্রীঅঙ্গনে আসিয়াছেন। তাহাদিগকে দিয়া তারককে নিকটে ডাকাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাদের সমক্ষেই অন্য দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মানুষ কেমন করিয়া মানুষকে মারে! কেন মানুষ হিংসা ছাড়ে না।" তারপর তারকের দিকে তাকাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, "তোমার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে। তুমি গৃহে যাও। সংসারী হও।"

বেদনাহত তারক ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিলেন। অনেক ক্ষমা চাইলেন। প্রভু গম্ভীর থাকিলেন। তারকের হাতে সেবা লইলেন না। পর দিবস দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া প্রভুর পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া তারক বিদায় লইলেন। যাইবার কালে একখণ্ড কাগজ আশিস-স্বরূপ তাঁহাকে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

"অকৈতবে বিষয়বৃত্তি করিও। আদর্শ গৃহীবৈষ্ণব হইও। প্রতি জীবে নিতাইয়ের স্বরূপ দেখ। মাইর খাইও, মারিও না। জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত করলে নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়, জানিও।"

জ্যোতীশবাবুর আম

ভক্তবর রমেশচন্দ্রের অগ্রজ জ্যোতীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একদিন তিনি কোন নিজ প্রয়োজনে ফরিদপুর রেল ষ্টেসনে গিয়াছেন। হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে একটী বড় আমের ঝুড়ি। কলিকাতা হইতে আসিয়াছে প্রভু জগদ্বন্ধুর নামে। ঠিক ঐ সময়ই একটি বালকভক্ত ঐ আমের ঝুড়ি আনিতে ষ্টেসনে আসিয়াছে। বালকটি জ্যোতীশবাবুর পরিচিত। তিনি হাসিতে হাসিতে বালকটিকে বলিলেন, 'শ্রীঅঙ্গনে অনেক আম এসেছে তো? বৈকালে অঙ্গনে গেলে তো আম খাওয়া যাবে। বালকটি বলিল "বেশ তো যাবেন।"

অপরাহ্ণে জ্যোতীশবাবু তাহার একজন বন্ধুলোকসহ শ্রীঅঙ্গনে বেড়াইতে যান। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাদিগকে আদরে বসাইয়া "দাদা এসেছেন, দাদা এসেছেন" বলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে একটি ভক্তকে বলিলেন—"দাদাকে আম খাওয়াও।"

ভক্তটি আদেশমত সুন্দরভাবে আম তৈয়ারী করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বসাইলেন, তাহাদিগের পাতের আম ফুরাইয়া গেলেই শ্রীশ্রীপ্রভু ভক্তটিকে আবার দিতে ইঙ্গিত করেন। এইরূপে ইঙ্গিত করিয়া করিয়া তাহাদিগকে বহু আম খাওয়াইলেন। তাহাদের উদর পূর্ত্তি হইল। আর খাওয়া চলিবে না।

অবশেষে তাহারা যখন বিদায় হইয়া যান, তখন শ্রীশ্রীপ্রভু

বলিলেন, "আরও আম নিয়ে যান, বাসার সবাইকে খাওয়াবেন।" এই বলিয়া প্রভু ভক্তটিকে ইঙ্গিত করিলেন— "আমের ঝুড়িটা আন, ওটি দাদার বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও।"

জ্যোতীশবাবু আম নিতে একান্তভাবেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন—"দাদা, আপনি আমের ঝুড়িটা নিলে আমি সুখী হবো। না নিলে দুঃখিত হবো।" এমনভাবেই প্রভু কথাটি বলিলেন যে, জ্যোতীশবাবু আম না নিয়া পারিলেন না।

সহরের যে বালকটি সেদিন আমের পার্শ্বেল আনিতে ষ্টেসনে গিয়াছিল, পর দিবস জ্যোতীশবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে ওসব কথা প্রভুকে কিছুই বলে নাই। তার উহা মনেই ছিল না।

"পুলুবাবুর মধুরভাব"

"জয় জয় মহাপ্রভু পুলিন প্রাণ বন্ধু"

—স্মরণমঙ্গল

কুলীনগ্রামবাসী মহাপ্রভুর চিহ্নিত পার্ষদ। বসু রামানন্দের বংশধর বিপিনবিহারী ও পুলিনবিহারীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। পুলিনবিহারীর প্রভুর প্রতি প্রীতির আকর্ষণ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল।

পুলিনবিহারী বড় গায়ক ছিলেন। গানের দ্বারা ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা তিনি প্রভুর সেবা করিতেন। নানাপ্রকারের গন্ধদ্রব্য তিনি প্রভুর জন্য পাঠাইতেন। প্রভুর প্রসাদী গন্ধ চন্দনাদি নিজেও নিজ দেহে গ্রহণ করিতেন। শ্রীশ্রীপ্রভু কোনও ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "পুলুবাবুর মধুর ভাব।"

মধুরভাবে তিনি সর্ব্বদা ঢল ঢল থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডীর হৃদয়েও আনন্দের উদয় হইত। "জয় জয় মহাপ্রভু" শব্দটি তাঁহার মুখে সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত। এইজন্য "জয় জয় মহাপ্রভু" তাঁহার পরিচয়ের একটী অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল।

মধুরভাবে তিনি প্রভুর নিকট অনেক পত্র লিখিতেন। পত্রগুলি অনেক সময়ই ডাকে দিতেন না। তিনি জানিতেন, প্রভু অন্তর্য্যামী তাহাকে ডাকে চিঠি দিয়া মনের কথা জানান দরকার হয় না। আবার কচিৎ কখনও কোনও পত্র ডাকেও দিতেন। একদিন একখানা পত্রে প্রাণের উচ্ছ্বাস নানাভাবে

জয় জয় মহাপ্রভু পুলিনপ্রাণ বন্ধু

শ্রীপুলিনবিহারী বসু

লিখিয়া পত্রখানি ফরিদপুর ভক্তবর দুঃখীরাম ঘোষের ঠিকানায় প্রভুর কাছে পোষ্ট করেন। দুঃখীরাম ঠিকানা কাটিয়া উহা রামবাগান হরিসভায় পাঠাইয়া দেন, প্রভু ওখানে আছেন মনে করিয়া। পত্র নবদ্বীপ দাসের হাতে পড়ে। তিনি উহা যথাস্থানে প্রভুকে পৌঁছাইয়া দেন।

পুলিনবিহারীর পত্র

১। কাহা জীবনধন ভুবন মোহন
কাহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয় পুরী, আও আও
নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল
সাধকি সাগর হিয়া'পর শুকাল
শিরতাজ মেরি শিরসে আও
হা হা প্রিয় বঁধূ এ কোন সাজা।
"পুলিন"

২। আসল যে জানে সে জানে
যে জানে সে জানে প্রাণে প্রাণে
চোখে চোখে রেখে তবু
তোমারি মন পেলাম না।
"পুলিন"

৩। আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।
আমি সারাদিন তোমা লাগিয়া
রহিব বিরহ-শয়নে জাগিয়া
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে আসিয়া
এ মুখপানে চেয়ে হাসিও।

"পুলিন"

৪। নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশি পাগলের মত
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
রয়েছ নয়নে নয়নে॥

জোড়াবাগান হরিসভা ইতি—১০ই মাঘ

শ্রীবহুবল্লভ!

ক্ষমা ক্ষমা ক্ষমা হৃদয়ের অন্তস্তলের ক্ষমা। তোমারি কৃপায় প্রভু তোমারে চিনেছি। অব্যবস্থিত চিত্ত—"পুলিন"

কুম্ভমেলায় "সত্যযুগ"

বাংলা ১৩০৮ সনের মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা। সকল সম্প্রদায়ের সাধুসজ্জনের বিরাট সমাবেশ। "সত্যযুগের আবির্ভাব" বলিয়া বড় বড় প্লাকার্ড রাস্তায় টানান হইয়াছে। সাধুদের শোভাযাত্রাতে ও কাহারও কাহারও হাতের পতাকায় "সত্যযুগ" কথা লেখা দেখা যায়। অনেকের মনের বিশ্বাস, কলিযুগ কাটিয়া গিয়া এখন হইতেই সত্যযুগের সূচনা আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু হরিকথা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"কলিসংখ্যা পূর্ণ বটে। পঞ্চসহস্র মাহে বটে। এইমাত্র সংখ্যা বটে।" মহাপ্রভুর আগমনে, সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পাদস্পর্শে ও কীর্ত্তন-রোলে কলির পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আর মাত্র পাঁচ হাজার মাস থাকিল। পাঁচ হাজার মাসে ৪১৬ বৎসর ৮ মাস। অর্থাৎ ৪১৬। ১৭ চৈতন্যাব্দে কলিসংখ্যা শেষ হইবে। ঐ কুম্ভমেলার বৎসর তাহাই হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহরিকথার বাণী ও কুম্ভে সমাগত বিশিষ্ট সাধুসজ্জনদের অনুভূতি মিলিয়া গেল।

কলিসংখ্যা শেষ হইলেও বর্ত্তমানে যুগসন্ধিক্ষণ চলিতেছে। এই বৎসরের কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীপ্রভু গমন করিয়াছিলেন। কোথায় ছিলেন, কতদিন ছিলেন, কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। একটি মাত্র ঘটনা ভক্তমুখে শ্রুত আছি,—

"এমন সুন্দর পুরুষ ত কখনও দেখি নাই"

জটিয়াবাবা প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেইবার বহু সংখ্যক শিষ্য প্রশিষ্য সঙ্গে কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তিনি অনুগতজন সঙ্গে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন।

সেই সময় এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষবর গঙ্গায় অবগাহন করতঃ নগ্নদেহে জ্যোতিরাশি বিকীরণ করিতে করিতে গোস্বামিপাদের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া যান। তিনি ঐ রূপ দর্শন করিয়া, "ধর ধর এমন সুন্দর পুরুষ ত কখনও দেখি নাই" বলিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার পশ্চাদনুশরণ করেন। পুলকে তাঁহার জটাগুলি খাড়া হইয়া উঠে।

সমুদ্রমন্থনের সুধাবণ্টন কালে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব যেরূপ উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন, আজ শিবাবতার বিজয়কৃষ্ণও বন্ধুসুন্দরের রূপমাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া সেইরূপ ভাবাবেগে ছুটিয়া চলিলেন। মেঘে বিদ্যুতের মত সেই মোহনমূর্ত্তি অল্প সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রেমের পাগল জটিয়াবাবাও সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া পড়েন।

ভক্তগণের মধ্যে কেহই জানিলেন না, কাহাকে দেখিয়া গোসাইজীর এই ভাববিহ্বলতার উদয় হইল। একমাত্র গোসাইজীর শিষ্য বালকৃষ্ণ জানিলেন, ঐ দিব্য পুরুষ শ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দর।
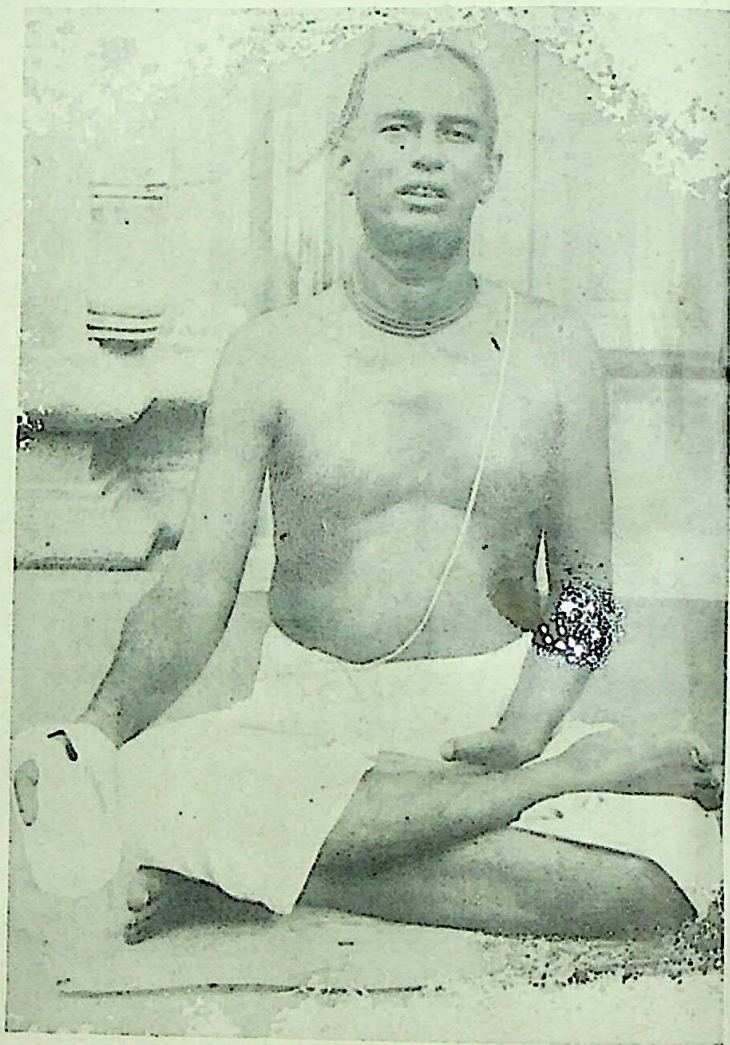
শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভক্তবর তারক গাঙ্গুলী

কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর পল্লী। ঐ পল্লীর সুরিপাড়া অঞ্চলে বাস করিতেন ৺প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ তারকনাথ। তারক বাল্যাবধি হরিভক্তিপরায়ণ।

বরাহনগরে একটি হরিসভা ছিল। ভক্ত-সজ্জন মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথা আস্বাদন করিতেন। কোনও সময় নবদ্বীপ দাস মহাশয় প্রভুর সেবার্থ ভিক্ষা সংগ্রহ উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে বরাহনগর ঐ হরিসভায় উপস্থিত হন।

নবদ্বীপ দাসের মধুর কণ্ঠে শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত পদকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ
যদি চাও গোকুল বৃন্দাবন।
(ও সে) নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম ধন ॥

এই কীর্ত্তনে হরিসভার ভক্তদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহিত। শ্রীমান তারক মাঝে মাঝে ঐ হরিসভায় যাইতেন। নবদ্বীপ দাসজীর মুখে মধুর কীর্ত্তন শুনিয়া তারকও মুগ্ধ হন। তাঁহার ইচ্ছা হয় নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে পরিচিত হইতে। গঙ্গার ঘাটে দুইজনের দেখা ও পরিচয় হয়। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নবদ্বীপ তারককে প্রভু বন্ধুসুন্দরের বার্ত্তা বলেন। তারক মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনেন। মনের কোণে সাধ জাগে দর্শনের।

তারক তার বাবাকে বলে—"মামাবাড়ী যাব।" তারকের মামাবাড়ী মেদিনীপুর জেলায়। বাবা দুইটাকা পাথেয় দেন। তাহা লইয়া তারক নবদ্বীপের সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম রওনা হন। তারকের বয়স তখন পনর বৎসর। স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন।

যেখানে সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোল বাড়ী ছিল, সেখানে একটা বড় বকুল গাছ ছিল। উহার তলে একখানি ঘরে প্রভু বন্ধুসুন্দর আছেন। নীরবে আপন মনে আছেন।

তারক পিছনে কিছুটা দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নবদ্বীপ আগাইয়া আসিয়া প্রভুর দরজায় "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিলেন। বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপের সাড়া পাইয়াই দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিয়া যেন শ্রীমান্ তারককে দর্শন দিবার জন্যই দরজা জুড়িয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন। শ্রীঅঙ্গ ঢাকা। শ্রীবদন উন্মুক্ত। শ্রীবদনের রূপের মাধুর্য্যে তারকের নয়ন ভরিয়া যায়। শ্রীনয়নের কারুণ্য-দৃষ্টিতে তারকের জীবন ভরিয়া যায়।

প্রভু নবদ্বীপকে জিজ্ঞাসা করেন, "ও ছেলেটা কেরে?" নবদ্বীপ ওর কী পরিচয় দিবেন? বলিলেন—"প্রভু, ও তারক।" "তারক! আচ্ছা বেশ।" শুধু নামটিতেই প্রভু যেন তাহাকে সর্ব্বতোভাবে চিনিয়া লইলেন।

পথে আসিতে তারক ও নবদ্বীপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিজেরা খাইবার জন্য শাকআলু ও বাতাসা কিনিয়াছিলেন। কিনিয়া আর খাওয়া হয় নাই। মনে করিয়াছেন—নিয়া প্রভুকে দিয়া অবশেষ প্রসাদ পাইব। নবদ্বীপ শাকআলু ও বাতাসার পুটলি

প্রভুর কাছে রাখিয়া কহিলেন, "ইহা তারক আনিয়াছে আপনার জন্য।"

মধুর হাসিয়া প্রভু বলিলেন, "আলু বাতাসায় ভগবানের সেবা হয় না। তারককে বল আড়াইসের রসগোল্লা আনিতে।"

নবদ্বীপ তারকের কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—"তারক, প্রভু বলিলেন, "আলু বাতাসায় ভগবানের সেবা হয় না। আড়াইসের রসগোল্লা আনিতে আদেশ করিলেন।"

তারক বলিলেন, "ভাই, সঙ্গে যাহা আছে, তাহা দ্বারা রসগোল্লা কিনিলে আর বাড়ী যাইবার খরচ থাকিবে না।"

নবদ্বীপ বলিলেন, "দেখনা একবার সঙ্গে কি আছে। প্রভু শ্রীমুখে চাহিয়াছেন, আনাই উচিত। শেষে তোমার খরচের যাহা হয় হইবে। প্রভুর সঙ্গে এতদিন আছি, এরূপ ভাবে চাহিতে কখনও দেখি নাই। তোমার মহাভাগ্য।"

তারক হিসাব করিয়া দেখিলেন। বাবা দুইটাকা দিয়াছিলেন। পথে একটাকা সাড়ে তিন আনা খরচ হইয়াছে। মাত্র সাড়ে বারো আনা আছে। পাঁচ আনা করিয়া রসগোল্লার সের। ঠিক আড়াই সেরের মূল্যই আছে।

এইরূপ হিসাবের মিল দেখিয়া নবদ্বীপ কহিলেন, "তারক, প্রভু তোমার যা কিছু আছে সব চান।" তারকেরও তাহাই মনে হইল। প্রভু যেন সঙ্কেতে বলিতেছেন, "তোর সব সম্বল আমায় দিয়া আমাকেই সম্বল কর্।"

তারক রসগোল্লা আনিলেন। সব খরচ করিয়া তাহার মনে

একটা বিপুল আনন্দ হইল। সন্ধ্যায় প্রভু ভক্তদের ডাকাইয়া হরিকীর্ত্তনানন্দ করাইয়া সব রসগোল্লা বিলাইয়া দিলেন।

তারক প্রায় দেড়মাসকাল নবদ্বীপ থাকিলেন। প্রায় প্রত্যহ প্রভুর দর্শন করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর নবদ্বীপ আসেন নাই। নবদ্বীপে যাহা যাহা দর্শনীয় বস্তু আছে, দেখিলেন। সব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, বন্ধুসুন্দরের মত এমন মধুর বস্তু আর কিছুই নাই।

"পরীক্ষা করিও না"

আর একসময় শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা কুমারটুলী ফটিক মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। তারক তখন তাহাদের বরাহনগর বাড়ী হইতে প্রত্যহ দর্শন করিতে আসিতেন। কয়েক-দিন পর প্রভু শেঠের বাগানে গিয়া থাকেন। ঐ সময় তারক শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকটে থাকিয়া সেবা করিবার ভাগ্যলাভ করেন। নিত্য রান্না করিয়া প্রভুকে ভোগ দিতেন।

বাগবাজার মদনমোহন পাড়ার একটি দোকানের মিঠাই শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবায় লাগিত। প্রভু ঐ দোকানের রসগোল্লা গ্রহণ করিতেন। ষ্টার থিয়েটারের নিকটে একটা কচুরীর দোকান ছিল। ঐ দোকানী ভক্তলোক ছিলেন। প্রভু ঐ দোকানের কচুরী সেবা লইতেন। তারক প্রভুর ভাব বুঝিয়া সেবার দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন।

তারকের একটা স্বভাব ছিল, প্রায়শঃ প্রভুবন্ধুকে পরীক্ষা

করিতেন। কোনও দ্রব্য সেবায় দিয়া মনে মনে ভাবিতেন, যদি প্রভু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বুঝিব ইনি ভগবান।

একদিন ছোট একটি রাধাকৃষ্ণের মৃন্ময় মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া প্রভুর ঘরের কাছে রাখিলেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু যদি উহা স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তবে বুঝিব উনি সেই বস্তু। প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন।

একদিন বাজার হইতে ছোট একটি খেলনা বল কিনিয়া আনিলেন। প্রভু যেখানে ভোগ গ্রহণ করিতে বসেন, তাহার কাছে ঐটি রাখিয়া দিয়া তারক ভাবিলেন, যদি ঐ বলটি হাতে তুলিয়া খেলেন, তবে বুঝিব ইনি ভগবান। প্রভু উহা তুলিয়া খেলিয়াছিলেন।

কয়েক দিন পর তারকের মনে হইল, প্রভুর আহারের পর কিছু ভোজন-দক্ষিণা দেওয়া উচিত। তারক তদবধি প্রত্যহ ভোগ দিয়া ভোগের পার্শ্বে একটি সিকি রাখিয়া দিতেন। মনে ভাবিতেন, উহা যদি প্রভু তুলেন, তবে বুঝিব উনি অন্তর্য্যামী বটেন। প্রভু প্রত্যহই ঐ সিকি তুলিয়া রাখিতেন।

অনেকদিন পরে একদিন সবগুলি সিকি একত্র করিয়া একটা কাগজের পুটলি করিয়া তারকের কাছে ফেলিয়া দিলেন। এক খাতায় লিখিয়া দিলেন,—"তুমি, পরীক্ষা করিওনা কারণ পরীক্ষা মৃত্যু ঘটায়॥ পরীক্ষায় আত্মা পচিয়া যায়॥ আত্মা পচাই শবত্ব॥"

তৎপর তারক আর প্রভুকে পরীক্ষা করিতেন না। একদিন তারক দেখিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু ঘরের মধ্যে দিন-দুপুরে ছয়খানি মোমবাতী একই সময় জ্বালাইয়া একদৃষ্টে শিখাগুলির কম্পন

দর্শন করিতেছেন ও মধুর হাসি হাসিতেছেন। তারক লুকাইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। বন্ধুসুন্দরের বালচাপল্য ও মাধুর্য্য দর্শনে তারকের আনন্দের অবধি রহিল না।

শেঠেরবাগানে অবস্থান কালে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকা দিয়া শুধু হাতখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার নাড়ী নাই। তারককে শুঁকে দেখতে বল।" তারক দেখিলেন, বাস্তবিকই স্পন্দন বন্ধ।

শ্রীশ্রীপ্রভু আবার বলিলেন, "আমার পা দিয়া মরা গন্ধ বেরুচ্ছে। তারককে শুঁকে দেখতে বল।" গন্ধ লইয়া তারক দেখিলেন, সত্য সত্যই মরা গন্ধ।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে যে দিব্যগন্ধ বাহির হইত, তাহা দূর হইতে অনুভব করিয়া তারকনাথ দিবানিশি বিভোর থাকিতেন। আজ সেই মধুর গন্ধ না পাইয়া মঙ্গলময়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিত হইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু তখন তারকনাথের দক্ষিণ হস্তের উপর নিজ হস্তখানি মেলিয়া ধরিলেন। তারক দেখিলেন, রক্তকমলের মত সুকোমল কর-পত্রে মাত্র দুইটি রেখা। একটি আয়ুরেখা ও অপরটি তাহা হইতে শাখা রেখা। অন্য কোনও রেখা নাই।

তারকনাথ ভক্ত ডাক্তার শ্যামলাল বাবুকে ডাকিয়া প্রভুকে দেখাইলেন। ডাক্তার প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিলেন। বন্ধুসুন্দর ঐ ডাক্তার-প্রদত্ত একশিশি ঔষধ খাইয়া স্নানান্তে "ভাল হইয়া গিয়াছি" বলিয়া বালকের মত মধুর হাসিতে লাগিলেন।

"আমি পৃথিবীর কেন্দ্র"

একসময় তারকের মন এখানে ওখানে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন তাহাকে অতি আদরে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—

"তারক, আমি পৃথিবীর কেন্দ্র
আমাকে ছে'ড়ে কোথাও যেতে নেই।"

তারপর একখানি খাতা শ্রীহস্তে লইয়া, আপন মনে নানাকথা তাহাতে লিপিবদ্ধ করেন। খাতাখানি তারক পরমাদরে মাথায় তুলিয়া লন ও কণ্ঠহার করিয়া রাখেন। ইহাতে কী যে লিখিয়াছেন, লেখক শ্রীশ্রীপ্রভুই জানেন। খাতাখানির উপর নাম লিখিয়াছেন উদ্ধারণ। মূল্য লিখিয়াছেন এক টাকা। এরূপ কেন লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে "কুতুকী" ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরম কৌতুকপ্রিয় 'কুতুকী' ভগবান বন্ধুসুন্দরের কৌতুকময় লেখা ঐ খাতার একটী প্রতিলিপি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল—

———

পাতা-ঢাকা টাকা

কোন বিশিষ্ট ধনী-মহাজন তাহার কোন ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে লভ্যাংশের এক অংশ প্রভুর সেবায় দিবেন, এইরূপ মানত করিয়াছিলেন। ঐ ব্যবসায় লাভ হইলে পর ধনীব্যক্তি হিসাবমত কিছু টাকা লইয়া শেঠের বাগানে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীপ্রভু গৃহের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। "প্রভু, দয়া করিয়া দুয়ার খুলিয়া আমার এই সামান্য টাকা গ্রহণ করুন।" তিনি এইকথা বহুবার বলিলেও প্রভু দরজা খুলিলেন না।

ধনী লোকটি অগত্যা ঐ টাকা শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের পিছনে রাখিয়া যান। পাছে কেহ লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সামনে রাখিলেন না। পিছনে একখানি কলার পাতার উপর রূপার টাকাগুলি রাখিয়া অপর একখানি পাতাদ্বারা উহা ঢাকিয়া রাখেন। পাতা-ঢাকা টাকা দুই তিনদিন একইভাবে পড়িয়া থাকে।

সেদিন ডোমপল্লীর বুজিরাম আসিয়া প্রভুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। প্রভু বলিলেন—"রাম! আজ তোদের বালকদের প্রভাতী কীর্ত্তনে খোল বাজে নাই কেন রে?" বুজিরাম সভয়ে কহিল, "প্রভু, কাল সন্ধ্যাকীর্ত্তনে খোলের বায়া ফাঁসিয়া গিয়াছে। কেহই তাহা আপনাকে জানাইতে সাহসী হয় নাই।" প্রভু কহিলেন—"এই ঘরের পিছনে পাতা-ঢাকা টাকা আছে—একখানি নূতন খোল কিনিতে যত টাকা লাগে,

তুমি ঐ টাকা হইতে লইয়া যাও। সকালে মৃদঙ্গধ্বনি না শুনিয়া আধমরা হইয়া আছি। সন্ধ্যায় বাঁচাইও।" বুজিরাম প্রয়োজনীয় টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় নূতন মৃদঙ্গের রোলে বন্ধুসুন্দর গৃহমধ্যে দুলিতে লাগিলেন।

"জলে পোকা পড়িয়াছে"

শ্রীশ্রীপ্রভু শেঠের বাগানে আছেন। চম্পটী মহাশয়, নবদ্বীপ দাস, তারকনাথ সকলেই রামবাগানে থাকেন। ফরিদপুরের হরিদাস মোহন্তও তাহাদের সঙ্গে আছেন। চম্পটী মহাশয়ের আনুগত্যে শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবায় কার্য্যাদি করেন। ডোম ছেলেদের কীর্ত্তন শিক্ষা দেন। প্রত্যহ একটি সেবা নিয়মিতরূপে করেন। প্রভুর পানীয় জল গঙ্গা হইতে এককলসী করিয়া আনেন। খুব প্রত্যূষে গঙ্গায় স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে জল আনেন। কলসীতে বস্ত্র ঢাকা দিয়া জল তুলেন। প্রভু আমার-দেওয়া এই জল পান করিবেন, ভাবিয়া হরিদাস আনন্দে ফুলিয়া উঠেন। ঐ একটি সেবার আনন্দের রেশ হরিদাসের বুকে সারাদিন ধরিয়া মাতামাতি করে।

একদিন সকালে জল আনিতে যাইবার পথে হঠাৎ হরিদাসের ফরিদপুরে বাড়ী ঘর ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে। অনেকদিন যাবত তাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি।

কিভাবে তাহারা আছে কোনই ত খোঁজ লই না। এইসব ভাবিতে ভাবিতে মনটা ভারী হইয়া উঠে। এই অবস্থাতেই জল ভরিয়া যেইমাত্র প্রভুর মন্দিরের দুয়ারে রাখিয়াছেন, অমনি গৃহ হইতে প্রভু কহিলেন, "হরিদাস, ও জলে পোকা পড়িয়াছে, সেবায় লাগিবে না।"

হরিদাস কহিলেন, "না প্রভু, পোকা পড়িবে কিরূপে! আপনার নির্দ্দেশমত বস্ত্রপূত করিয়া আনিয়াছি।"

"বাহিরের পোকা নয়, তোমার মনের পোকা।" শ্রীশ্রীপ্রভুর কণ্ঠ হইতে উত্তর আসিল।

হরিদাস লজ্জায় অধোবদন হইলেন। প্রভু আবার বলিলেন, "হরিদাস, আজই ফরিদপুর চলে যাও। ছেলেমেয়েগুলি রয়েছে, অনেকদিন কোন খোঁজখবর লওয়া হয় নাই।"

শ্রীশ্রীপ্রভু যে অন্তর্য্যামী হরিদাস তাহা ভালই জানিতেন। তখনি ঠিক মনের চিন্তাগুলি ঐভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়ায় হরিদাস অপ্রতিভ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার মনে ভাবিলেন, আজই যে ফরিদপুর যাইবার আদেশ দিলেন, গাড়ী ভাড়া কোথায় পাব।

অমনি প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, পাথেয়ের কথা ভাবছ। এই ঘরের পিছনে গিয়া দেখ পাতা-ঢাকা টাকা আছে। প্রয়োজন মত টাকা লইয়া যাও।" হরিদাস ঘরের পিছনে গিয়া ভাড়ার মত টাকা লইয়া আসিলেন। প্রভু আবার বলিলেন, "হরিদাস, আরও কুড়ি টাকা লও, ছেলেমেয়েদের কাপড় জামার জন্য।" হরিদাস আদেশ পালন করিলেন।

প্রভুর আদেশের উপর কথাটি বলিবার সামর্থ্য ছিল না কাহারও। হরিদাসকে ফরিদপুর রওনা হইতে হইল। ষ্টেসনে যাইবার পথে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু বাজার করিলেন। যথা সময়ে গৃহে পোঁছিয়া একদিন পুত্রপরিজনসহ বেশ আনন্দে কাটাইলেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই হরিদাসের মন অস্থির হইয়া উঠিল। প্রত্যহ তিনি এই সময় গঙ্গায় স্নান করিয়া প্রভুর জন্য জল আনিতেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। বড়ই উদ্বেগ বোধ হইল। হরিদাস শয্যা হইতে উঠিয়া একটি নূতন মাটির কলসী মাথায় লইয়া পদ্মানদী অভিমুখে ছুটিলেন।

"জলের পিপাসায় আসিলাম"

পদ্মানদী তখন ফরিদপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী। তিন মাইল পথ অতি আবেগে ছুটিয়া পদ্মায় ছাপাইয়া পড়িয়া হরিদাস স্নান করিলেন। যেমন গঙ্গায় তুলিতেন, তেমনই কলসী ভরিয়া জল তুলিলেন। তীরে উঠিয়া জলের কলসীটি দেবপূজায় ঘটের মত অতি যত্নে বসাইলেন। তৎপর তাহার সম্মুখে নতজানু বসিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজ প্রভুকে কে জল দিয়াছে? হয়ত কেহই দেয় নাই। হায় হায় হতভাগা আমি কেন সেবা ছাড়িয়া আসিলাম। প্রভুর তো সকালেই জলের দরকার! হয়ত এতক্ষণে পিপাসায় কষ্ট পাইতেছেন। চম্পটী ঠাকুর হয়ত টহলে বাহির হইয়া গিয়াছেন,

নবদ্বীপদাদাও হয়ত সঙ্গে গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস হয়ত ভিক্ষাকার্য্যে অন্যত্র গিয়াছেন। আহা! প্রভুর তবে জলের অভাবে কষ্ট হইতেছে। কী দুর্ভাগ্য আমার! প্রভু পতিতপাবন, কত করুণা করিয়াছিলেন—আমি হীন দুরাচার, বাগদী বুনা, আমার আনা জল কত আদরে নিতেন, সেই মহাসেবার ভাগ্য ছাড়িয়া কেন আসিলাম! কেন দুর্বুদ্ধি হইল!

হরিদাস এইসব কত কি ভাবিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, কলিকাতা রামবাগানে আবার আজই চলিয়া যাই। আবার ভাবিলেন, বিনা আদেশে গেলে যদি শ্রীচরণ পাশে না রাখেন। আমি কি দুর্ম্মতি! এখন আমি কি করিব, কোথায় যাব? আজকের এই কলসীভরা জল কেমনে প্রভুর সেবায় লাগাইব? ভাবিতে ভাবিতে হরিদাস হাহাকার করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষে কলসীটির সমীপে মাথা নীচু করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"হরিদাস!" মধুমাখা একটি ডাক পৌঁছিল হরিদাসের কানে। "এযে প্রভুর কণ্ঠ।" হরিদাস ভাবিল স্বপ্ন দেখিতেছি। মাথা উঁচু করিলে যদি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে হরিদাস মাথা তুলিলেন না।

"হরিদাস!" দ্বিতীয় ডাক আসিল। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব গন্ধ হরিদাসের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আর তো মাথা নীচু করিয়া থাকা চলে না। মাথা তুলিয়া পিছনে তাকাইয়া হরিদাস দেখিলেন প্রভু স্বয়ং দাঁড়াইয়া! স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, জাজ্জ্বল্যমান প্রভু দাঁড়াইয়া।

"প্রভু আপনি!" কম্পিত কণ্ঠে হরিদাস কহিলেন।

"হাঁ, হরিদাস, জলের পিপাসায় আসিলাম, জল দেও।"

হরিদাস এদিক ওদিক চাহিলেন, ঘটী গ্লাস কিছু নাই, কিরূপে জল দিবেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পদ্মকর তুটি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া হরিদাসের সম্মুখে পাতিলেন। হরিদাস কলসী হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। প্রভু তিন অঞ্জলি পান করিলেন।

হরিদাসের নয়নে গলদশ্রু। শ্রীশ্রীপ্রভু জলপানান্তে সিক্ত হস্তখানি হরিদাসের নয়নে দিলেন। সকল বেদনা মুছিয়া গেল।

পদ্মাতীরে ভক্ত-ভগবানের এই মহামিলন দৃশ্য কতক্ষণ থাকিল, জানি না। ভাগ্যবান ভক্ত আজও ধ্যাননেত্রে এই নিত্যলীলা দর্শন করেন।

নৈশভ্রমণ লীলা

যাতুমণি বাইজীর প্রতি প্রভুর কৃপার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাতুমণির বাসা ছিল শেঠের বাগানে। তাহার পাশের বাড়ীতেই প্রভুর বাসা। শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে আশ্বিন মাসের (১৩০৮) প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত প্রায় দেড়মাসকাল পতিত-পাবন বন্ধুসুন্দর সমাজে পতিতাদের পল্লীর পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছেন। শুধুমাত্র অবস্থান দ্বারাই তাহাদের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন।

যাদুমণির কণ্ঠটি মধুর ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভুর কয়েকটি গান তিনি গ্রামোফোনে রেকর্ড করাইয়াছিলেম। প্রভুর গান তিনি প্রাণ দিয়া গাহিতেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর জননীরাও যোগ দিতেন। উহার ফলে অনেকের পুঞ্জিত মালিন্য ধুইয়া গিয়াছিল। ভক্তিদেবীর কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছিল। পতিতপাবনের এই পতিতপাবনী লীলার আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি ?

শেঠের বাগানে থাকাকালে শ্রীশ্রীপ্রভু সারাদিন গৃহাবদ্ধ থাকিতেন। সন্ধ্যার পর ঘোড়ার ফিটিং গাড়ী বা পাল্কী গাড়ীতে ভ্রমণে বাহির হইতেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে শেষরাত্র ৩টা পর্য্যন্ত অনবরত কলিকাতার রাস্তায় বেড়াইতেন। অনেক সময় ময়দানে ঘুরিতেন। একবিন্দুও নিদ্রা যাইতেন না। কোন্ গভীর আস্বাদনে যে সারা নিশি তন্ময় থাকিতেন তাহা কে বলিবে ? প্রভাতে গঙ্গায় স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেন। সারারাত্র গাড়ীতে ঘুরিতে অনেক ভাড়া লাগিত। ঐ টাকা চম্পটী ঠাকুর জোগাড় করিতেন, নানাস্থানে ভিক্ষা করিয়া। প্রভুর যখন যে দ্রব্যাদি প্রয়োজন, সেই জন্য ভিক্ষা করিতেন কৃষ্ণদাস। নবদ্বীপদাস প্রভুর সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রভুর গৃহের চাবি তার হাতে থাকিত।

নৈশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভু প্রত্যহ চন্দ্রপাত কীর্ত্তন ও শ্রীরাধার দশমদশার বিরহ কীর্ত্তন শুনিতেন। প্রভুর আদেশে নিত্য নবদ্বীপদাস উহা গাহিতেন। প্রভু অনেক গানের সুর তখন শিশ দিয়া শিখাইয়া দিতেন। প্রসঙ্গক্রমে

অনেক মধুর কথা কহিতেন। নিজ-রচিত চন্দ্রপাত ও শ্রীরাধার চরম দশম দশার গান শুনিয়া প্রভু আত্মহারা হইতেন। কখনও তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ বিরহাবেশেই সমস্ত রজনী কাটিত। শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারাবলী পরিদৃষ্ট হইত। তখন শ্রীশ্রীঅঙ্গের শ্রী সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইত। দর্শন করিয়া ভক্ত নবদ্বীপ দাস আনন্দে ভাসিতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর ভোগ রন্ধনাদি সেবা করিতেন তারকনাথ। শ্রীশ্রীপ্রভু নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাগজে ফর্দ্দ করিয়া লিখিয়া দিতেন। একদিন এক কাগজে তারকনাথকে "সপ্তম" বলিয়া লিখিলেন। ইহাতে সকলেই তাহাকে প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতেন। তারকনাথ সকল ভক্তগণেরই প্রীতির পাত্র ছিলেন। একাধিক্রমে বিশ বাইশ দিন নৈশ ভ্রমণের পর একদিন প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় গাড়ীতে বাহির হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তথাপি প্রভু বাহির হইতেন, যদি চম্পটী গাড়ী আনিতেন। সারাদিন বৃষ্টির জন্য চম্পটী ঠাকুর ঐদিন গাড়ী ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ঐজন্য তিনি গাড়ী আনেন নাই। গাড়ী না আনায় বেড়ান বন্ধ হইয়া গেল।

নবদ্বীপ দাস প্রত্যহ প্রভাতী টহল কীর্ত্তন করিতেন। কোনদিন চম্পটী ঠাকুরের সঙ্গে যাইতেন। কোনদিন বা একাকী যাইতেন। টহল হইতে ভক্তগণ ফিরিলে শ্রীশ্রীপ্রভু দরজা খুলিয়া নাম শুনিতেন। যেদিন রাত্রে বেড়ান বন্ধ হইল ঐদিন সকালে প্রভু আর দরজা খুলিয়া টহল কীর্ত্তন শুনিলেন না।

যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনে বাধা পড়িয়াছে, তাই অন্তরে বেদনা। পরে দেখা গেল কথাবার্ত্তা বলাও বন্ধ করিয়াছেন।

প্রভু কথা বলা বন্ধ করিলেন। রাত্রে বেড়ান বন্ধ করিলেন। চন্দ্রপাত কীর্ত্তন ও বিরহগান শ্রবণও বন্ধ করিলেন। ইহাতে নবদ্বীপ দাস বিশেষ মর্ম্মান্তিক ভাবে অসোয়াস্তি ও বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। অতি ব্যাকুলভাবে প্রভুকে জানাইলেন, "আপনি কথা না বলিলে আমার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা লাগে।" উত্তরে প্রভু লিখিয়া দিলেন, "আমার আলজিভ্ খসে গেছে। কথা বলিবার শক্তি নেই।"

এই সময় একদিন চম্পটী ঠাকুরের কোন ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহারে ও কথায় নবদ্বীপ দাস বুঝিতে পারিলেন যে, চম্পটীর ইচ্ছা—প্রভুর গৃহের চাবি ও অন্যান্য সেবার দায়িত্ব "একমাত্র সপ্তম" তারকনাথের হাতেই থাকে। চম্পটী ঠাকুরের ব্যবস্থা ও মর্য্যাদা কেহই ক্ষুণ্ণ করিত না। নবদ্বীপ তখন নীরবে ব্যথিত চিত্তে সেবার সকল দায়িত্ব তারককে বুঝাইয়া দিয়া নবদ্বীপধাম চলিয়া গেলেন।

ভক্তবাৎসল্য

"ভক্তের সমান নাই অনন্তভুবনে"

—বৃন্দাবন দাস

নবদ্বীপ ধামে গিয়া নবদ্বীপ দাস পাগলের মত হইয়া গেলেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া আহার নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল হা প্রভু হা প্রভু বলিয়া হা হুতাস ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দুইদিন কাটিল। তৃতীয় দিনে অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে একখানি পত্র লিখিলেন,—

প্রাণের দেবতা!

অসহনীয় দুঃখে কাঁদিয়া মরিতেছি। চাঁদবদন দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। মধুকথা শ্রবণে বঞ্চিত হইয়াছি। প্রত্যহ কীর্ত্তন শোনাইবার ভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শেষে জানিনা, কোন মহাপরাধে সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি। এই বিড়ম্বিত জীবনে এখন আর কী প্রয়োজন আছে?

অপরাধী

নবদ্বীপ দাস

ভক্তের বেদনাভরা পত্র পাইয়া ভগবান যেন বিচলিত হইলেন। উত্তরে লিখিলেন—"নবদ্বীপ! তুমি পত্রপাঠ শ্রীধামে প্রভুর জন্য বাড়ী ভাড়া করিবে। নূতন বাড়ী চাই। অথবা নূতন হোয়াইটওয়াস করা বাড়ী চাই। গোটা বাড়ী যেন হয়। কলিকাতা আসিয়া প্রভুকে লইয়া যাইবে। আমি যথাসময় প্রস্তুত থাকিব। —জগদ্বন্ধু।

পত্র পাইয়া নবদ্বীপ পরম উল্লাসে বাড়ী খুঁজিতে লাগিলেন। হরিসভার পশ্চিমে তমালতলা রোডে শ্যামলামাতার বোনঝি জগদিদির একটি একতালা বাড়ী ছিল। জগদিদির দেহরক্ষার পর ঐ বাড়ীর দায়িত্ব ছিল মহাপ্রভুর বাড়ীর সেবাইত শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামিজীর উপর। গোস্বামিজী শ্রীশ্রীপ্রভুকে অসীম শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবেশ অবতার বুদ্ধিতে গভীর ভক্তি করিতেন। নবদ্বীপ দাস তাঁহার নিকট গিয়া সবকথা বলিতেই তিনি পরমানন্দে ঐ বাড়ী প্রভুকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন।

তাঁহার নিকট হইতে চাবী লইয়া বাড়ীটি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তালা লাগাইয়া নবদ্বীপ কলিকাতা শেঠের বাগানে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর বাহির হইতে প্রভুকে সকল কথা জানাইলেন। প্রভু একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন, "সন্ধ্যায় গাড়ী লইয়া আসিবে, প্রস্তুত আছি।"

খরচপত্রাদি কোথায় পাওয়া যাইবে ভাবিয়া নবদ্বীপ যাদু-মণিকে সকল জানাইলেন। তিনি দেড়শত টাকা দিলেন। এই টাকার কথা প্রভুকে জানাইলে প্রভু লিখিয়া দিলেন, একশত আমাকে দিও, পঞ্চাশ পাথেয়ের জন্য তুমি রাখিও।"

সন্ধ্যায় নবদ্বীপ ঘোড়ার গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র প্রভু গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। প্রভু চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তারকনাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ব্যথাভরাকণ্ঠে বলিলেন, "নবদ্বীপদা, আপনিইত বরাহনগর হইতে এ জীবাধমকে আনিয়া প্রভুর সেবাভাগ্য দিয়াছেন—আজ আপনিই যদি

আমার নিকট হইতে প্রভুকে কাড়িয়া লন তাহা হইলে আমি বাঁচিব কিরূপে ?"

নবদ্বীপ দাস তারকনাথকে লইলেন। যথাসময় নবদ্বীপধাম পেঁীছিলেন। প্রভু নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিলেন। চম্পটী ঠাকুর কয়েকদিন পরই বিপিনবাবু কৃষ্ণদাস প্রমুখ বহুভক্ত সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়া খুব কীর্ত্তনানন্দ করেন। কিছুদিন পরে তাহারা কলিকাতা চলিয়া যান।

এই তমালতলা রোডের বাড়ীতে থাকাকালেই বড়বাবাজী রাধারমণ চরণদাসজী শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। সে কাহিনী পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইস্থানে থাকাকালেই ফরিদপুর হইতে ত্রিকালগ্রন্থ ছাপা হইয়া আসে, প্রভু উহা পোড়াইয়া ফেলেন।

কয়েকদিন পর স্বেচ্ছাময় প্রভু নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর চলিয়া আসেন। সেই বৎসরই কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট রেললাইন হয়। সুতরাং পূর্ব্বের মত হাঁসখালি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘপথ পদব্রজে আসার আর প্রয়োজন ছিল না।

———

"আমি শবাকার হইয়া পড়িতেছি"

ফরিদপুর পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকায় রমেশচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। "রমেশ, আমার দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। আমি শবাকার হইয়া পড়িতেছি।"

আবার কয়েকদিন পর আর একখানা পত্রে লিখিলেন, "আমার ললাটে আবার গোলোক দেখা দিয়াছে। আমি বেশ সুস্থ আছি।" ইহার কয়েকদিন পর শ্রীশ্রীপ্রভু এক অভিনব খেলা খেলিলেন।

"জর্মির ঘরণী জলযাচক বন্ধু"

বন্ধু স্মরণমঙ্গল।

শ্রীশ্রীপ্রভু হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মণকান্দা গিয়া গোশালায় বসিলেন এবং দিগম্বরীদেবীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিদি উপস্থিত হইলে বন্ধুহরি বলিলেন, "আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার কোলে মাথা রেখে শুই।"

প্রভুর ভাব-বিহ্বল আধ আধ কথা শুনিয়া দিদি বলিলেন, "এটা গরুর ঘর, এখানে আঠালী লাগিবে। তুমি ঘরে চল।" এই বলিয়া পূর্ব্বদিকের ঘরে লইয়া গেলেন এবং মেজের উপর বিছানা করিয়া শোয়াইলেন।

বাড়ীর সকলে প্রভুবন্ধুর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। বড়বৌ, মেজবৌ, দিগম্বরীদেবীর কন্যা ক্ষীরোদাসুন্দরী, তাঁহার কন্যা

সরসী, তারিণী চক্রবর্ত্তীর কন্যা ব্রজবালা, পুত্র নরেন, গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র গোপেশ্বর ও শ্রীনাথ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। সকলে প্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ-মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরীদেবী জগতের জন্য আহার্য্য তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "লোকে বলে আমার কেউ নাই, এই দেখ আমার সবাই আছে।"

বন্ধুসুন্দর যে সবাইকে 'আমার' মনে করিতেছেন, ইহাতে সকলেই পরমসুখ অনুভব করিলেন। কথা বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দর হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া ফরিদপুরের দিকে ছুটিলেন। দিদি দিগম্বরী পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিতে পারিলেন না। সকলেই ধরিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইল।

বন্ধুসুন্দর ছুটিতে ছুটিতে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া জমির নামক একজন মুসলমানের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট জল চাহিলেন। জমিরের স্ত্রী বলিল, "ঠাকুর, তুমি বামুন, আমরা মুসলমান, তোমাকে জল দিব কি করিয়া।" প্রভু বলিলেন, "জল দিবে না?" প্রভুর কথার মধ্যে এমন একটী করুণ সুর ছিল যে, জমিরের স্ত্রী আর জল না দিয়া থাকিতে পারিল না। বাটীতে করিয়া জল দিল। জল লইয়া প্রভু কিঞ্চিৎ মস্তকে ও কিঞ্চিৎ চরণে ঢালিলেন। তারপর বলিলেন, "তুই গরীব।"—এই বলিয়া পরিধানের বস্ত্রখানি ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খানিকক্ষণ পরে বাহির হইলেন। তখন পরিধানে অপর একখানি নূতন বস্ত্র। কোথা হইতে বনানীর মধ্যে কাপড় আসিল কে বলিবে? নূতনবস্ত্র পরিধানে বন্ধুসুন্দর বদরপুর বাদল বিশ্বাসের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না জমির বা তার স্ত্রী কাহারও। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর চাকর পেনা ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া জমির বস্ত্রখানি চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পরে জমিরের স্ত্রী পাড়া-প্রতিবেশীর মুখে শুনিল যে, প্রভুর বস্ত্র অমূল সম্পদ। উহা ঘরে থাকিলে মঙ্গল হইবে। জমিরের স্ত্রী তখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ী গিয়া দিগম্বরীদেবীর নিকট অনুনয় করিয়া কাপড়খানা চাহিয়া আনিল। বহুযত্নে জমির উহা গৃহে রাখিল।

কয়েকদিন পর জমিরের ছেলের কঠিন ওলাউঠা হইল। ঐ বস্ত্র ধুইয়া জমির-গৃহিণী পুত্রকে জল খাওয়াইল। উহাতেই তাহার অসুখ সারিয়া গেল। তৎপর হইতে গ্রামের কাহারও অসুখ হইলে বস্ত্রধৌত জল খাওয়াইলে সারিয়া যাইত। বস্ত্রখানি এক এক সময় এক এক রং ধারণ করিত। ভাগ্যবতী জমির-গৃহিণী যে অমূল্যনিধি পাইল, তাহা ভজন সাধন করিয়াও অনেকের ভাগ্যে জুটে না।

ভাবোন্মাদ অবস্থা

চৈত্রের শেষ ভাগ (১৩০৮) অপরাহ্ন বেলা দিগম্বর বেশে বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকাঁদা বাড়ীর উঠানের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী দিগম্বরী একখানি বস্ত্র আনিয়া তাড়াতাড়ি পরিতে দিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বস্ত্রখানি পরিধান না করিয়া রাখিয়া দিলেন।

বহুলোক আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু যাহাকে সামনে পান তাহাকেই বলেন—"বলত আমি শব না বৈতরণী?" এই কথার ভাবার্থ কেহই বুঝিতে পারে না। সকলেই শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া থাকে ও ভাববিহ্বল শ্রীমূর্ত্তিখানি দর্শন করে।

সকলেই নীরবে দর্শন করিতে লাগিল। কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। শ্রীশ্রীপ্রভু ভিতর বাড়ী হইতে বহির্বাটীতে আসিলেন। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর একটি ভৃত্য বাহির-বাড়ীতে কাজ করিতেছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলত আমি শব না বৈতরণী?"

ভৃত্যটি অবাক হইয়া শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। প্রভু পুনঃ বলিলেন, "বল দেখি কি খোয়াব দেখেছিলি? খোয়াবে যা বলেছি তা মনে আছেত?" ভৃত্যটি নীরবে নিম্নদৃষ্টিতে রহিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার জীবনের একটী গুপ্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন। আমি তা জানি, কেমন? সত্যি বল?"

ভৃত্যটি সজল চোখে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভু তখন ভৃত্যটির হাত ছাড়িয়া ধীরে ধীরে তুলাগ্রাম মাঠের দিকে চলিলেন।

দর্শক ও ভক্তগণ প্রভুর অনুসরণ করিলেন। প্রভুও দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া পালাইলেন। কেহ সঙ্গে ছুটিয়া ধরিতে পারিল না! সেই দিন ও রাত্রি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ থাকিলেন।

ফরিদপুরের বালক ভক্তগণ, গোয়ালচামট গ্রামের ভক্তগণ সকলে শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া প্রভুবন্ধুকে না দেখিয়া হায় হায় কি হইল বলিয়া আর্ত্তভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সারাদিন প্রভুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

"আমি শব না বৈতরণী?"

পরদিবস অতি প্রত্যুষে কেদার কাহা নিজ শয্যায় বসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিতেছেন। "জাগ জীবন কিশোরী বিভাবরী পোহাইল"—গান করিতেছেন, আর চক্ষের ধারা ঝরিতেছে। সারাদিন বন্ধুসুন্দরের সংবাদ পাওয়া গেল না, এই ভাবনায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে।

গানের পদ গাহিতেছেন, "হাতে ঝারি সহচরী দ্বারপাশে দাঁড়াইল।" কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সখী হাতে ঝারি লইয়া সেবার তরে দাঁড়াইয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে কেদারের মনে ভাবনা হইতে লাগিল যে, তিনি নিজে হাতে ঝারি

লইয়া বন্ধুসুন্দরের সেবা করিতেছেন। চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে-ছিলেন। হঠাৎ সাড়া পাইয়া চক্ষু খুলিলেন।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, বন্ধুসুন্দর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। মনে হয় কোথাও কোন কাঁদার মধ্যে শয়ন করিয়া গড়াগড়ি করিয়াছেন। কেদার তৎক্ষণাৎ জলপাত্র লইয়া শ্রীঅঙ্গ ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেদারের ধ্যান সার্থক হইল।

শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিতে কেদার বুঝিলেন সেই প্রভু আর নাই। যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। আজ আর মুখে 'কাহা কাহা' মধুর ডাক নাই। নয়নের সেই দৃষ্টি নাই, সেই হাসি নাই, তাঁহার গান শুনিয়া পূর্ব্ববৎ উল্লাস নাই। কেবল একটী কথাই মুখে—

"বলত, আমি শব না বৈতরণী ?"

কাহা ঐ কথার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কেবল কাঁদেন আর জল আনিয়া আনিয়া নবনী-কোমল শ্রীঅঙ্গ ধৌত করেন। ভক্ত কর্ত্তৃক সুস্নাত হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীঅঙ্গনে চলিলেন। কেদার তাহাতে সুখী হইলেন। কারণ তার ক্ষুদ্র কুটিরে বন্ধুসুন্দরকে বসিতে দিবার মতও স্থানাভাব।

"কেউ আমার দিকে চাইল না"

ভক্তবর বাদল শ্রীশ্রীপ্রভুর ভাবোন্মাদ অবস্থার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া শ্রীঅঙ্গনে আসিলেন এবং পাল্কী করিয়া লইয়া গেলেন বদরপুরে। পরদিবস সকাল হইতে ভাবের আবেগ আরও বাড়িল। সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত ভাবের পুলক প্রকট হইয়া উঠিল।

হঠাৎ প্রলাপোক্তি করিতে লাগিলেন, "আমার মহাব্যাধি হয়েছে। কেউ আমার দিকে চাইল না। আমি শব হ'য়ে গেলাম। প্লীহা বার সের, যকৃৎ অর্দ্ধমণ ওজনের হয়েছে। শীঘ্র ডাক্তার ডাক।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বাস মহাশয় ভীত হইলেন। ফদিরপুর সহরে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ডাক্তার সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন। সুরেশচন্দ্র সংবাদ পাইয়া মহাচিন্তিত হইয়া ফরিদপুর সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীধরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বদরপুর উপনীত হইলেন।

বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে পশ্চিমদুয়ারী একখানি গৃহে একখানি খাটের উপর শ্রীশ্রীপ্রভু শায়িত আছেন। সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত। এইরূপ অনাবৃত অবস্থায় কখনও থাকেন না।

দক্ষিণ পার্শ্বে দিদি দিগম্বরীদেবী বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র ডাক্তারবাবুকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার প্রভুর শয্যাপার্শ্বেই বসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ডাক্তার-বাবুর হাতে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বলুন ত বাবু, আমি শব না বৈতরণী ? আমি যে গেলাম। শব হয়ে গেলাম। মহাব্যাধি। মাথা গুড় গুড় হয়ে গেছে। নাড়ী সব বসে গেছে। হায়! মানুষ হরিনাম করে না। ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন, এই আছে এই নাই। যেমন আমি পূর্ব্বে ছিলাম, আবার আজ শব হয়ে গেছি। সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার। আপনি মস্ত বাবু। বেল্টিমোরের ডাক্তার।"

ডাক্তারবাবুকে এইকথা বলিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু সুরেশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। "হাত দেখত, আমার নাড়ী কি বলে ?" সুরেশচন্দ্র প্রভুর হাত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কোন হাতের নাড়ীরই স্পন্দন নাই। তবে, নিজের ভয় হইলেও, বাহিরে প্রভুকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলিলেন, "চিন্তা নাই, এই ত ডাক্তরবাবু এসেছেন। পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীপ্রভুকে পরীক্ষা করিয়া নাড়ীর গতি বা হৃদয়ের স্পন্দন কিছুই পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও কিছু রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না। রোগ স্থির না করিয়া ডাক্তার কোন ঔষধ দিতে সাহসী হইলেন না। সন্ধ্যার সময় সুরেশচন্দ্র ও ডাক্তার শ্রীধর বিদায় চাহিলে প্রভু বলিলেন, "কাল আবার আসিও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে।"

"এই নেও আমার পরিচয়"

পর দিবস বেলা একটায় সুরেশচন্দ্র ডাক্তারবাবুকে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছিলেন। প্রভুও পূর্ব্বদিনের মত সেই গৃহের মধ্যে খাটে শয়ন করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত। অনেক ভক্ত-সজ্জন চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা বাতাস করিতেছেন, কেহ বা শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুকে দেখিয়াই প্রভু নিকটে ডাকিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সুরেশচন্দ্র শ্রীধরবাবু সহ প্রভুর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু উভয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন,—

"এই হাতে বেণ্ট দিলাম। চিরদিন আমার হ'য়ে থাক্‌বে। আমায় কেউ মানে না। আজ আমি আমার পরিচয় দিয়া মুক্ত হব। কাগজ কলম আন।"

আদেশমত কাগজ কলম কালি আনা হইল। শ্রীশ্রীপ্রভু সুরেশচন্দ্রকে লিখিতে বলিলে, তিনি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে লেখা প্রভুর পছন্দমত হইল না। তখন তিনি নিজেই কাগজ কলম লইয়া শ্রীহস্তে লিখিলেন,—

১। আমি ভিন্ন কিছুই নাই।

২। হরি।

৩। মহাউদ্ধারণ।

৪। পুরুষ।

৫। জগদ্বন্ধু।

৬। পরব্রহ্ম।

৭। সৃষ্টি।

"এই নেও আমার পরিচয়। আমি আজ হতে মুক্ত হলাম। সবকে আমার কথা বলবে। চিরজীবন ভ'রে, নিত্য চিরদিন আমার কথা বলবে। আমার কথা লিখবে। সদা প্রচার করবে। আমি কী তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? হায় হায়! কেউত আমার কথা শুনে না, হরিনামও করে না। আমি তোমাদের দেহ হস্ত পদ প্রাণ মন সব। তোমরা আমার কথা রাখ। হরিনাম কর। আমি তাই শুনতে শুনতে ধূলিতে পৃথিবীর সমস্তে আকাশে মিশিয়া যাই। আমার শপথ তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক। তোমাদের মঙ্গল হউক। তা'হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়।"

"তোমরা হরিনাম করে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে লও। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই। তোরা মানুষ না হলে, হরিনাম না করলে আমি আর ঘর থেকে বের হব না। ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হয়ে যাব। তোরা সবাই হরিনাম কর। হরিনাম প্রচার কর।"

"সকল মানুষের বাতাস"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার ষাট সহস্র ব্যাধি। উঠ্‌লেই চান্দ্রায়ণ হয়। বাবুজি, ডাক্তার বাবুকে বলে আমায় এমন ঔষধ দেও, যা'তে আমি ধূলির মত পৃথিবীর সমস্তে মিশে যেতে পারি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করিয়া। "আমায় নিয়ে চলুন, আমি এখনই আপনার বাড়ী যাব। পৃথিবীর সকল মানুষের বাতাস না লাগলে আমার শরীর ভাল হবে না।"

ডাক্তার শ্রীধর বলিলেন, "আমার বাসায় আপনাকে রাখিবার মত স্থান নাই।" এইকথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রভুবন্ধু করুণ ভাবে সুরেশচন্দ্রের দিকে তাকাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমায় নিবে? আমি তোমার বাসায় যাব। বাসায় না হয় সহরে যে কোন স্থানে ফেলে রাখ থাকবো।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, আমার অভিভাবকগণ ত অমনি খড়্গহস্ত। প্রভুর কাছে যাতায়াত করি, এই ত তাদের কাছে মহাপরাধ। তদুপরি যদি প্রভুকে বাড়ীতে নিয়া যাই তাহা হইলে হয়ত তাঁহারও লাঞ্ছনা ভোগ হ'তে পারে, তাদের হাতে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সুরেশচন্দ্র একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন।

অন্তর্য্যামী সুরেশের অন্তর বুঝিয়াই বলিলেন। "কি, তুমিও

নেবে না? আমার কি কেউ নাই?" এইকথা শুনিয়া সুরেশ-চন্দ্রের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তখন প্রভুকে নিজ বাসায় নিয়া যাইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া বুঝি বা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "আমি গেলে তোমায় মারবে। আমায়ও মেরে ফেলবে। থাক, যাব না।"

সুরেশচন্দ্রের মনে তখন নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি তখন নির্ভীক ভাবে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, কেউ কিছু বলতে পারবে না।" কথা শুনিয়া প্রভু সুখী হইলেন। পাল্কী আনিতে আদেশ করিলেন, সুরেশচন্দ্র পাল্কী আনিতে যাইতে উদ্যত হইলে প্রভু বালকের মত বলিলেন, "তুমি গেলে আর আসবে না। বাদল, তুমি যাও।" বিশ্বাসজী পাল্কী আনিতে গেলেন। ডাক্তারবাবু ঔষধ কিছু না দিয়াই পদধূলি লইয়া বিদায় লইলেন।

"হরিনাম করে আমায় রক্ষা করুন"

বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের মামা বাড়ীতে দালানের ইট কাটা হইতেছিল। ঐ কার্য্যে মোহন্ত সম্প্রদায়ের কতিপয় ভক্ত ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু তাদের একজনকে বলিলেন, "আমায় মাথায় নিয়া উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ গাছগুলিকে প্রদক্ষিণ কর।"

ভক্তটি প্রভুর আদেশ পাইয়া আনন্দে অধীর। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে তুলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুরূপ চলিতে

লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর জল খাইতে চাহিলেন। ভক্তটি প্রভুকে মাদুরের উপর নামাইলেন। সুরেশচন্দ্র জল আনিতে উদ্যত হইলে প্রভু বারণ করিলেন। ঐ মোহন্ত (বুনা) ভক্তকে জল আনিতে আদেশ দিলেন। তিনি আনিয়া দিলে তার জল পান করিয়া তার ও তার জলের প্রশংসা করিলেন।

পুনরায় প্রভু ঐ ভাগ্যবান মোহন্ত ভক্তটির মস্তকে আরোহণ করিয়া যশোহর রাস্তার পার্শ্বে গেলেন। তৎপর পাল্কীর অপেক্ষায় পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন।

দর্শন করিবার জন্য বহুশত নরনারী আসিয়া মুহূর্ত্তে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন শ্রীশ্রীপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটী কারুণ্যের প্রস্রবণ। যেন জগত ভাসাইবার জন্য শ্রীঅঙ্গ বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীব হরিনাম করে না এইজন্য প্রভুর বেদনা অপরিসীম। বেদনার মূর্ত্তিখানি ভাবে ঢলঢল করিতে লাগিলেন। পাল্কী আসিলে শ্রীশ্রীপ্রভুকে পাল্কীতে তুলিয়া সুরেশ-চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া সুরেশচন্দ্র নিজ থাকিবার গৃহে প্রভুকে নিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য তখন পাড়ার অনেক নরনারী আসিল। জ্যোতীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। প্রভুবন্ধু তাহার স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত ও সুরেশচন্দ্রের স্কন্ধে বামহস্ত অর্পণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, "দাদা, শিশুকালে কত যত্ন করে পালন করেছেন। সব মনে আছে। আমি গেলাম। শব হয়ে গেলাম। আজ আপনাদের শরণ নিলাম। এখন আপনারা হরিনাম করে আমায়

স্মরণ করে রক্ষা করুন। নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই। হায়! হায়!!

জ্যোতিশবাবু সান্ত্বনা দিয়া বন্ধুসুন্দরকে ঘরে নিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র চরণ সেবা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বালকগণ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে গেলেন। প্রভুর আহার হইতে রাত্র আটটা বাজিল। প্রভুর আদেশে সুরেশচন্দ্র নিজহাতে আহার করাইয়া দিলেন।

বালকগণ প্রভুর খাটের নীচে শয়ন করিলেন। প্রভু সমস্ত রাত্র জাগিয়া কাটাইলেন। বালকগণই পালা করিয়া জাগিলেন। প্রভু অনেক রহস্যময় কথা সেদিন ব্যক্ত করিলেন।

"হরিনামে দেহ হয়"

পর দিবস প্রাতে ডাক্তার শ্রীধরবাবু আসিলেন। ডাক্তার-বাবু আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে হাত দিয়া ধূলা লইতে গেলেন। শ্রীচরণ সরাইয়া লইয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "ছি! আপনি পায়ে হাত দিবেন না। আপনি বেল্টিমোরের বাবু, মস্ত ডাক্তার। আপনি দেবতা। আপনি পায়ে হাত দিন কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন, "আমি যে কে, আমি যে কে বাবুজী, তা আপনি চিনেন? পৃথিবী আর আমি এক। আমার এটা কারণ শরীর। এখন শব। দুটি মাত্র বস্তু, পৃথিবী আর আমি। এখন কিছুই নাই। হরিনামে দেহ হয়।"

ডাক্তারবাবু নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন। কিছুই বুঝিলেন না। কিছুক্ষণ পর চলিয়া গেলেন। কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীপ্রভু

বলিলেন, "বৃন্দাবন দাসকে ডাকিয়া আন।" বালকগণ বৃন্দাবন দাস (সুধন্য মিত্র) কে ডাকিয়া আনিলেন। বৃন্দাবন দাস আসিলে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার নিকট ষাট সহস্র ব্যাধির কথা বলিয়া ঔষধ চাহিলেন।

বৃন্দাবন দাস প্রবীণ ভক্ত। প্রভুর ভাব অবস্থা তাঁহার অনেক জানা ছিল। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা ঔষধ দেব।" বৃন্দাবন দাসজীর সঙ্গে প্রভু অনেক রহস্যালাপ করিলেন। চলিয়া যাইবার সময় বৃন্দাবন দাস সুরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভুর অসুখ কিছুই নয়। তোমারা প্রভুকে একটু ভাল করে খেতে দাও। আর সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন কর। এক বোতল লিমনেড আনিয়া রাখ। ঔষধ চাহিলে ঔষধের গ্লাসে ঢালিয়া একটু একটু দিও।"

বালকগণ বৃন্দাবন দাসের পরামর্শানুসারে সোডা ও লিমনেড আনিয়া রাখিলেন। ঔষধ চাহিলে একটু একটু দিতে লাগিলেন। সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রভু আনন্দে মৃদঙ্গ চাহিয়া নিজেই বাজাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন আনন্দ হইল।

আবার ঔষধ চাহিলেন। বালকগণ লিমনেড দিলেন। প্রভু উহাকেই ঔষধ মনে করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং "খুব ভাল অষুধ ক্রমশঃ ভাল হইয়া যাইতেছি" বলিতে লাগিলেন। রাত্রি আটটায় আহার্য্য দেওয়া হইল। কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট অংশ সব আদেশানুযায়ী জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

"হরিনাম কর, শুনি"

রাত্রিতে পার্শ্বের বাড়ী কীর্ত্তন হইতেছিল। প্রভু কীর্ত্তন শুনিয়া শয্যার উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "ওরে আমি ওখানে যাব। আহা বেশ গাচ্ছে।" বালকগণ প্রভুকে ঘিরিয়া রহিলেন।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর গানের তাল কাটিয়া গেল। প্রভুবন্ধু অবশাঙ্গ হইয়া শয্যায় হেলিয়া পড়িলেন। কিছু সময় পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"উঃ কী শুষ্ক, হৃদয় শুকা'য়ে যায়। মানুষ কেন পাপ করে! কেন পাপে মলিন হয়ে যায়!! পাপে ঘৃণা হয় না কেন!!! হরিনামেও পাপ চিন্তা! কি আশ্চর্য্য! কলির কি ছলনা! কীট কুহকে দূরে লয়ে যায়। তবু মানুষ হরিনাম করে না। তাই শব হয়ে যায়। মড়া হয়ে থাকে। হায়! হায়! তোমরা হরিনাম কর, শুনি।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর খেদপূর্ণ কথা শুনিয়া বালকগণের হৃদয় গলিয়া যায়। তাহারা খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন শ্রীশ্রীপ্রভুর নিজের পদ—

জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে।
আমি ধোয়াব শ্রীপদ আজি নয়ন ধারে॥
প্রকাশি সে রূপ রাশি, তামস বিনাশ আসি,
আমি সকল ভুলে নয়ন খুলে হেরি তোমারে॥
প্রেমসুধা বরিষণে, জুড়াও এ তাপিত জনে,
তোমার রূপসাগরে বিশ্বম্ভর ভাসাও আমারে॥

তব প্রেমধনে ধনী, কর গৌর গুণমণি,
রাখ বন্ধু দাসে পদপাশে কৃপা সঞ্চারে ॥

যতক্ষণ গান হইল প্রভু নীরবে শ্রবণ করিলেন ও আনন্দে চরণ দোলাইয়া মধুর হাসিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রায় শেষ, বালকগণ প্রভাতী গান ধরিল—"উঠ উঠরে গুরু গৌরাঙ্গ বলে, প্রেমস্বরে প্রাণভরে কুতুহলে।"

"প্রভু সত্য নিত্য বস্তু"

গান শেষ হইলে প্রভু খাইতে চাহিলেন। বালকগণ সকলেই প্রভুর জন্য বাল্যভোগ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। খাবার দেওয়া হইলে প্রভু খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। সুরেশচন্দ্র খাওয়াইয়া দিলেন। আহারান্তে প্রভু বলিলেন,—

"তোমরাই আমার একমাত্র নিত্য সত্য অভিভাবক। চিরদিন আমার হয়ে থে'ক। আমি ভিন্ন এ জগতে তোমাদের আর কেহ নাই। হরিনামে নিত্য নিষ্ঠায় থে'ক, কাল কলিতে ছুঁতে পারবে না। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা করে চল, পদে পদে সাবধান থেক। কারো সঙ্গে যাবে না। গুরু আছে, গুরু ভাই নাই। প্রভু সত্য নিত্য বস্তু। চিরদিন আমায় দেখো। শব হয়ে যেও না। আমি আছি ভয় কি।"

"আমার ভার চিরদিন তোমাদের মস্তকে। পাপ করো না। রক্ত জল করো না। আয়ু ও বংশ নষ্ট করো না। আনন্দ

পাবে। কেউ আমার কথা শুনল না। আমায় বিশ্বাস করল না। চান্দ্রায়ণ হল। শব হয়ে গেলাম। এখন বৈতরণী কুলে কারণ জলে ভাস্‌ছি। তোমরাও যেমন, আমিও তেমন, আমায় মিশায়ে লও।"

এইপ্রকার অনেক কথা বলিয়া প্রভু নীরব হইয়া শয়ন করিলেন। বালকগণ সব শুনিলেন। সব কথা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বালকগণ কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ঢাকায় রমেশচন্দ্রকে জরুরী পত্র দিলেন।

"আমার শবদেহে জীবন সঞ্চার হইতেছে"

সপ্তাহ কাল শ্রীশ্রীপ্রভু এইরূপ ভাববিহ্বল অবস্থায় সুরেশ-চন্দ্রের গৃহে থাকিলেন। বালকদের সেবা গ্রহণ করিলেন। নানা উপদেশ বাক্য বলিলেন। বালকগণের অভিভাবকেরাও পূর্ব্বের বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া প্রভুর সেবাযত্নে তৎপর হইয়া পরম আদর করিতে লাগিলেন।

বালক অক্ষয়কুমারকে শ্রীশ্রীপ্রভু "পাঠক" বলিয়া ডাকিতেন। আজ পাঠককে সম্বোধন করিয়া সকলকে কহিলেন —"পাঠক, তোমাদের আর কি শুনিবার, কি দেখিবার, কি চাহিবার আছে এখন বল, যাহা চাও তাহাই দিব।" অক্ষয়-কুমার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, "তোমাদিগকে বলিবার

কিছুই বাকী রহিল না। সব বলে নিরস্ত হলাম। আমার শপথ, কেউ আমার মত শব হয়ে যেও না। শব মড়া কাতর। তোমরা আমার মস্ত অভিভাবক মনে রেখো।"

কিছু সময় পর শ্রীশ্রীপ্রভুর ভাব অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। এই সাতদিন সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিলেন। হঠাৎ যেন জানিতে পারিলেন যে তিনি নগ্ন। পাঠককে বলিলেন, "বাবুজী, আমার কাপড় দেও, চাদর গায়ে দিয়ে দেও, আমার শবদেহে জীবন সঞ্চার হতেছে।"

সুরেশচন্দ্র প্রভুকে কাপড় পরাইয়া দিয়া, গাত্রবস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। তখন প্রভু কহিলেন—"বাবুজী, এখন আপনারা বাহিরে যান। আমি না ডাকলে কেউ আসবেন না। আমাকে স্পর্শও করবেন না।"

এতক্ষণ যাহাদিগকে 'তুই' তুমি সম্বোধন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাদিগকে "আপনি" বলিতে লাগিলেন। বালকগণ সকলে বাহিরে চলিয়া গেলেন। প্রভু একাই নিজ ঘরে নীরবে রহিলেন।

"পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায়"

রমেশচন্দ্র ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়া পৌঁছিলেন। সুরেশচন্দ্রের পত্রেই তিনি প্রভুর ভাব অবস্থার বিষয় অবগত ছিলেন। আসিয়াই প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভু আদর করিয়া কাছে বসাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রই প্রভু রমেশচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেন। রমেশচন্দ্র চরণতলে বসিয়া শ্রীচরণে হাত বুলাইতে বুলাইতে সবকথা শ্রবণ করেন।

পরদিন বন্ধুসুন্দরকে লইয়া রমেশচন্দ্র ঢাকা চলিয়া যান। ঐদিন বাংলা ১৩০৮ সনের বৎসরের শেষ দিন। নববর্ষের প্রথম দিন হইতে বালকভক্তগণ বন্ধুহারা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। বন্ধুহারা শ্রীঅঙ্গনও বিরহিনীর মত শোভা-হীন হইয়া রহিল।

ঢাকা পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর ভাবোন্মাদ অবস্থা অনেকটা প্রশমিত হইল। রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "ছাখ রমেশ, এমন সময় আসবে, যখন আমি জড়ার মত হব। কোন জ্ঞান থাকবে না, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায়। সে সময় তোরাই আমার রক্ষা কর্ত্তা, একমাত্র অভিভাবক। দেখিস্ তখন কোন দুষ্টলোকে যেন আমায় কষ্ট দিতে না পারে। প্রভুর ভার তোমাদের মস্তকে। আর কিছুই বলিবার নাই।" অপর একদিন রমেশ-চন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—"রমেশ, তোকে কলিকাতায় যা দেখিয়েছিলাম মনে আছে?" রমেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া মনে

আছে, ইহা জানাইলেন। রমেশচন্দ্র বুঝিলেন, সেই 'চন্দ্রভাল' দর্শনের কথা বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন, "সে কথা কাহাকেও বলতে তোকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তুই সে কথা সকলকেই বলতে পারিস্।" প্রভুর কথা শুনিয়া রমেশচন্দ্র হাসিলেন।

কীর্ত্তনের শক্তি

শ্রীযুত চম্পটী ঠাকুর, বিপিনবিহারী বসু মহাশয়কে শ্রীশ্রী-প্রভুর দর্শনার্থ কলিকাতা হইতে ফরিদপুর লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিতে পান শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকায় আছেন। সুরেশচন্দ্রের নিকট হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া চম্পটী ঠাকুর বিপিনবিহারী ও নবদ্বীপ দাস ঢাকা পৌঁছেন। রাত্র প্রায় ১২টায় শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে উপনীত হন।

শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া ভক্তদের আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলেন। নিজে মৃদঙ্গ লইয়া চম্পটীও বিপিন-বিহারীর সঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে রমেশ-চন্দ্রও আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দেন। ডাক্তার উষারঞ্জন তখন প্রায়শঃ প্রভুর কাছে আসিতেন। সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া গভীর রাত্রেই আসিতেন। তিনিও ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গভীর রাত্রে তিন চারটি ভক্ত সঙ্গে প্রভুর কীর্ত্তনে কী একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। খোল করতাল, নাম প্রেম, ভক্তিরূপে অদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌর গদাধর শ্রীবাস যেন সাক্ষাৎ

প্রকট হইলেন। আর সকলের সম্মিলন যে বন্ধুসুন্দর, ইহা সকলের মর্ম্মে যেন অঙ্কিত হইল। কীর্ত্তনের ধ্বনি যে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া চৌদ্দভুবনের মহামাঙ্গল্য বিধান করে, ইহা তাহাদের কাছে কথার কথা মাত্র থাকিল না, একটা অনুভূত সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

কীর্ত্তনান্তে প্রভু ভিতরে গেলে বিপিনবিহারী কীর্ত্তনস্থলীতে অনেকক্ষণ ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। উষাবাবু বলিলেন, কীর্ত্তনের যে এতটা শক্তি আছে, তাহা আজই প্রভু হৃদয়ঙ্গম করাইলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটী মহাশয়কে অবিলম্বে কলিকাতা চলিয়া যাইতে বলেন এবং কতগুলি দ্রব্যের ফর্দ্দ দেন। ঐসব দ্রব্য জোগাড় করিয়া কলিকাতায় থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া যেন প্রভুকে শীঘ্রই কলিকাতা লইবার ব্যবস্থা করেন এই কথা বলেন। আদেশ শিরে লইয়া চম্পটী ঠাকুর, বিপিনবাবু ও নবদ্বীপ দাস কলিকাতা চলিয়া যান।

শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকা অবস্থান কালে একদা জয়নিতাই পদ-প্রান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"প্রভু, ভগবানের লীলা আরম্ভ হয়েছে তবে জীব জানতে পারছে না কেন?"

শ্রীশ্রীপ্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন,—"কি বল্লে, দেবেন, দেবেন, দেবেন, লীলা আরম্ভ হয়েছে জীব জানতে পারছে না। যেদিন লীলা আরম্ভ হবে সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে একদিনে মদ্যপান গোহত্যা উঠে যাবে।"

কালিন্দীমোহন

ফরিদপুরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন রসিকলাল চক্রবর্ত্তী। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীয় জামাতা শ্রীমান কালিন্দীমোহন। রসিক-বাবুর বাসাতে থাকিয়া কালিন্দীমোহন ফরিদপুর ঈশান স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়িতেন।

কালিন্দীমোহনের বাড়ীর নাম কালীমোহন। শ্রীশ্রীপ্রভুই তাহাকে কালিন্দীমোহন বলিয়া ডাকেন। তাহার পিতা লাল-মোহন মুখোপাধ্যায় ঢাকা জেলায় তারপাসা গ্রামে বাস করিতেন। বাল্যে কালিন্দী হাসরা স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্য্যন্ত পড়েন। তৎপরেই, বাল্য বয়সে বিবাহ করিয়া খুড়া শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া পড়িতে ফরিদপুর আসেন।

ঈশান স্কুলে তখন রমেশচন্দ্র শিক্ষকতা করেন। তাহার স্নেহছায়ায় আশ্রয় পাইয়া কালিন্দীমোহন শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। একদিন ফরিদপুর খেলার মাঠে বন্ধুসুন্দরের রূপমাধুর্য্য দর্শনে এমনি মুগ্ধ হন যে, ঐ মধুরিমা আস্বাদনের লোভে ব্রাহ্মণকান্দার পথে পথে বহু ছুটাছুটি করিয়াছেন।

অভিভাবকেরা জানিতে পারেন কালীমোহন সাধুর দলে মিশিয়া সাধু হইয়া যাইতেছে। তাহারা তাহাকে ফরিদপুর স্কুল ছাড়াইয়া কুমিল্লা স্কুলে নিয়া ভর্ত্তি করেন। এই সময় রমেশচন্দ্রও ফরিদপুর ছাড়িয়া ঢাকা যান।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে বলেন, "কালিন্দীকে ঢাকা আনিয়া ভর্ত্তি করাইয়ে দে। রমেশচন্দ্র কালিন্দীকে আনিতে

কুমিল্লা যান। রমেশচন্দ্রকে দেখিয়া কালিন্দীর অভিভাবকেরা সঙ্কুচিত হন ও কড়া নজর রাখেন। রমেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে কালিন্দীর ফরিদপুরের স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। তিনি রাত্রিকালে রমেশের সঙ্গে পলায়ন করেন।

কালিন্দীর অভিভাবকেরা থানায় এজাহার দেন। পুলিস গিয়া দুজনকে এক রেলষ্টেসনে ধরিয়া ফেলে। পুলিস কালিন্দীকে ছাড়িয়া দেয়—রমেশচন্দ্রকে হাজতে রাখে।

পরে কালিন্দীর সাক্ষীতেই রমেশচন্দ্র মুক্তি পান। সাক্ষীতে কালিন্দী বলে যে, সে তখন আর নাবালক নহে এবং রমেশচন্দ্রই তাহার প্রকৃত অভিভাবক। কুমিল্লায় অভিভাবকেরা কেহই নহেন। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়। কালিন্দী রমেশচন্দ্র সঙ্গে ঢাকায় আসেন।

ইহার কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু ভাবোন্মাদ অবস্থায় রমেশ-চন্দ্র সঙ্গে ফরিদপুর হইতে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসিয়া রামধন শাহ মহাশয়ের বাগানে পুকুর পারে ঘরে থাকেন। কালিন্দীমোহনকে নিকটে দেখিয়া প্রভুবন্ধু বলেন, "কালিন্দী-মোহন, তুমি রামশাহের কাছে গিয়া বল, প্রভু তাহার নূতন তোলা মন্দিরে থাকিবেন।"

কালীমোহনকে "কালিন্দীমোহন" বলিয়া প্রভুর এই প্রথম ডাক। মধুমাখা ডাক শুনিয়া ও কৃপাদেশ পাইয়া কালিন্দী আনন্দে গলিয়া যান। আনন্দভরা হৃদয়ে আজ্ঞা পালনে অগ্রসর হন।

শ্রীরামশাহ মহাশয়ের প্রতি কৃপা

প্রভুর আজ্ঞা লইয়া কালিন্দীমোহন শ্রীযুত রামশাহ মহাশয়ের নিকটে গমন করেন এবং প্রভু যাহা বলিয়াছেন ঠিক তাহাই বলেন। প্রভুর কথা ভক্তমুখে শুনিয়া বৃদ্ধ শাহ মহোদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন, "নূতন মন্দিরে প্রভু থাকিবেন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু একটি দুঃখের কথা, এতদিন প্রভু আসেন যান, একটিবারও দর্শনের ভাগ্য পাইলাম না। আমি মহাপাতকী, তাই ভাগ্য মন্দ।

কালিন্দীমোহন বলিলেন, "দাদা, আপনি এখনি আসুন দর্শন পাবেন। আমার সঙ্গেই আসুন।" শাহ মহাশয় তখনই বাহির হইয়া চলিলেন কালিন্দীর সঙ্গে। কালিন্দী মনে মনে কাতরভাবে প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে শাহ মহাশয়কে লইয়া প্রভুর গৃহের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু একখানি ক্যাম্পখাটে পদ্মহস্ত দুইখানা দুইদিকে ছড়াইয়া দিয়া বিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া আছেন। "আসুন দাদা" এই দর্শনের সময়, বলিয়া কালিন্দী শাহ মহাশয়কে নিয়া পিছনের দিকের দরজা দিয়া শ্রীচরণের কাছে উপনীত হইয়াছেন।

রাঙা চরণযুগল সম্মুখে পাইবার ভাগ্য পাইয়া শাহ মহাশয় নিজ মস্তক তাহাতে ঠেকাইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুও নিজ দক্ষিণ চরণখানি তাহার শিরে বুলাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ শাহ মহাশয় একেবারে যেন কৃতকৃতার্থতা বোধ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনে এমন শোভাময় শ্রীচরণ আর কখনও দেখেন

নাই। এমন শীতল অঙ্গস্পর্শ সুখও জীবনে আর কখনও পান নাই।

আনন্দে ভরপুর হইয়া শাহ মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন ও গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, যখন ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা রাধামাধবের মন্দিরে থাকুন। ইহা আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল।"

"ওর কাছায় বাঁধা আছে চৌদ্দ টাকা"

একদিন প্রভু রমেশচন্দ্রের হাতে একটা ফর্দ্দ দিয়া বলেন, এইসব দ্রব্য কালিন্দীমোহনকে বল, আমার জন্য কিনে আনতে।

ক্ষীরমোহন এক ভাড়,
ঘড়ী চেন,
রবারের দুই জুতা,
সিল্কের চাদর একখানি।

রমেশচন্দ্র কালিন্দীমোহনের হাতে ফর্দ্দ দিলেন। ফর্দ্দ হাতে লইয়া কালিন্দী বলিলেন, "আমার ত হাতে টাকা নাই" রমেশচন্দ্র ঐকথা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন, "ওর কাছায় বাঁধা আছে চৌদ্দ টাকা।"

সত্য সত্যই কালিন্দীর কাছার খোটে চৌদ্দ টাকা ছিল। প্রভুর কথা শুনিয়া কালিন্দী লজ্জায় মরিয়া গেলেন ও বাজার করিয়া দিলেন।

"ছোটও হতে পারি, বড়ও হতে পারি"

একদিন কালিন্দীমোহন একটি নূতন কোট তৈয়ারী করিয়াছেন, নিজে পরিধান করিবার জন্য। কোটটি ধুইয়া শুকাইতে দিয়াছেন। প্রভু রৌদ্র হইতে কোটটি নিয়া নিজেই গায়ে দিয়া বসিয়াছেন।

উহা দেখিতে পাইয়া কালিন্দীর প্রাণে আনন্দ আর ধরিতেছে না। মনের আনন্দ মনে চাপিয়া রাখিয়া তিনি প্রভুকে শুনাইয়া শুনাইয়া চেঁচামিচি করিতে লাগিলেন,—"এ কী ব্যাপার! আমার নূতন কোটটা কে নিল? এ বাড়ীতে এত চোর এল কোথা হতে? এমন বাড়ীতে বাস করা যাবে না—ইত্যাদি।

প্রভু শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে কালিন্দীমোহন প্রভুর কাছে গিয়া বলিলেন, আমার গায়ের কোট আপনার বিরাট বপুতে লাগিল কেমন করিয়া?" বস্তুতঃ কালিন্দীর বয়স তখন ১৬।১৭, আর প্রভুর বয়স প্রায় ত্রিশ এবং শ্রীহস্তাদি অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ।

কালিন্দীর প্রশ্নে প্রভু মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কালিন্দী, আমার এটি এমিবার দেহ। ছোটও হতে পারি, বড়ও হতে পারি।"

"নাম কর, সময়ে বুঝতে পারবি"

শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন একখণ্ড বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন,—

বৈষ্ণবে রুচি
শুদ্ধা ভক্তি
কৃষ্ণ রস
গোপীভাব
যুগল প্রেম
ইহার উপরে আর কিছুই নাই।

রমেশচন্দ্র লেখাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন। কথাগুলি অতীব মধুর লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, গোপীভাবটি কি বস্তু?"

প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরণ খেলিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে, সে অপ্রাকৃত ভাব-মাধুর্য্য তুই এখন বুঝতে পারবি না। সময়ে বুঝবি।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "গোপীভাবের একটু আভাস পেতেই বিদ্যাপতির ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গিয়েছিল। এখন তোকে বললে তুই ধারণা করতে পারবি না। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে মারা যাবি। আমি তোর অকাল মৃত্যুর কারণ হতে পারবো না। নাম কর, সময়ে বুঝতে পারবি।"

———

"তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু"

একদিবস রমেশচন্দ্রকে শ্রীশ্রীপ্রভু নিকটে ডাকিয়া ভাব-বিহ্বল অবস্থায় বলিতে লাগিলেন—ছাখ রমেশ, "ব্রজলীলায় প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিল অষ্টসখী। গৌরলীলায় রসপাত্র ছিল সাড়ে তিনজন মাত্র। ওসব লীলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। এবার বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব। তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

"তোরা যথাসাধ্য নৈষ্ঠিক ভাবে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ ঠুকঠাক যা পারিস করতে থাক। সময়ে আমি এক এক ঘায়ে এক একটা কন্টিনেণ্ট বা মহাদেশ ঠিক করে দেব। মদ্যপান, গোহত্যা একদিনে উঠে যাবে।"

অপর একদিন বলিলেন, "এখন আমি ঘরে ঘরে সেধে বেড়াচ্ছি। কেউ হরিনাম করলে না। তোরাও আমার কথা শুনলি না। দেখবি এমন দিন আসবে, যে সময়ে একটা কথা শুনবার জন্য কাঁদবি। তখন খুঁজেও পাবি না। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ঘিরে থাকবে। হরিনাম প্রেমে ধরা টলমল করবে। মনে রাখিস আমার হাত কেউ এড়াতে পারবি না।"

"দায় ঠেকে আমার শরণ নেবে"

একদিন একটি ভক্তকে বলিলেন, "ওরে, তুঠেঙ্গে মানুষ এত চালাক আমি প্রভু আমায় ফাকি দিতে চায়। সাধু সন্ন্যাসী তারাও স্বার্থপর। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উন্মত্ত। সময়ে দেখবি, কি ধনী কি দরিদ্র, কি সাধু কি অসাধু, সকলেই নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। তখন দায় ঠেকে আমার শরণ নেবে।"

কয়েকদিন যাবত রমেশচন্দ্রের হাতে অর্থ নাই। অতি কষ্টে খরচ চালান। একদিন প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, আমরা আর খরচ চালাতে পারি না তুমি এখন যাও।"

রমেশের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "ছিঃ আমাকে কি যেতে বলতে আছে! আমি আসি বলে তোরা তুটো খেতে পাস। আমি যেখানে থাকি সেখানে কোন অভাব থাকতে পারে না। আমার সেবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী করজোড়ে সদা সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকেন।"

অপর একদিন রমেশচন্দ্র মেসের খরচ নাই জানাইলে শ্রীশ্রীপ্রভু একটি ঘটভরা টাকা রমেশচন্দ্রের সম্মুখে ধরিলেন। রমেশচন্দ্র উহা হইতে সেইদিনকার প্রয়োজন মত বাজার করিতে তুইটি টাকা তুলিয়া লইলেন মাত্র।

এতগুলি টাকা কোথা হইতে আসিল এবং পরে অবশিষ্ট টাকা কোথায় গেল, রমেশচন্দ্র তাহা জানিবার জন্য কোনদিনই কৌতুহলী হন নাই। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও ভক্তের ধৈর্য্য তুই-ই নিরুপম।

অতঃপর শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে লইয়া ফরিদপুর চলিয়া আসেন। আসিয়া নবদ্বীপ দাসকে কলিকাতায় পুনঃ পত্র দেন, ফরিদপুর আসিয়া প্রভুকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনবাবুর চেষ্টায় প্রভুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাটি সংগ্রহ হইলে, নবদ্বীপ দাস ফরিদপুর আসেন। শ্রীশ্রীপ্রভুকে লইয়া কলিকাতা যান। এবার আসিয়া চাষাধোপাপাড়া প্রিয় ভক্ত হররায়ের বাড়ীতে উঠেন। এই সময় হররায় দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পুত্র প্রভুগতপ্রাণ শ্রীমান গৌররায় যথাশক্তি শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার ব্যবস্থাদি করিয়া দেন।

"ইংরেজকে সুহৃদ বলে জানবি"

এই সময় পাদ্রী সাহেবদের অপপ্রচারে দেবদেবীর নিন্দাবাদে ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুদের মন বেদনাযুক্ত হইয়াছিল। চম্পটী ঠাকুর A Key to the Missionary নাম দিয়া একটি ছোট্ট বই ছাপেন। তাহাতে পাদ্রীদের বহু অপকীর্ত্তির কথা ও খৃষ্টানধর্ম্মের দোষত্রুটির কথা লিখেন।

পাদ্রী প্রচারকদের মুখপাত্র ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তখন শ্রীরামপুরে ছিলেন। চম্পটী একখণ্ড পুস্তিকা ও তৎসহ একখানি কড়া চিঠি লিখিয়া উক্ত সাহেবকে পাঠাইয়া দেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া চম্পটীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতুল, ইংরেজকে কি চিঠি দিয়ে উত্তেজিত করতে আছে?" চম্পটী বলিলেন, "প্রভু, যাকে পত্র দিয়েছি, তিনি ত পাদ্রী।"

গম্ভীর স্বরে প্রভু কহিলেন, "পাদ্রী! ওরা কি তোদের মত দু'হাত দু'পাওয়ালা মানুষ? অসুর। অসুরকে উত্তেজিত করলে সমস্ত পৃথিবী হলাহলে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিন্তু অসুরকে বশ করে কাজ করিয়ে নেবার শক্তি তো কারো নাই। সে শক্তি আমার। কারণ, আমি ওদের weak points জানি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু পুনরায় বলিলেন, "ওরে, ইংরেজ তোদের জগন্নাথ পুরী যাবার রেলগাড়ী করে দিয়েছে। পাবনা ফরিদপুরে আসবার রেলগাড়ী করে দিয়েছে। তাইত তোরা এত সহজে আমার কাছে আসতে পারিস।"

"মহাপ্রভু যখন নীলাচলে থাকতেন, তখন নদে শান্তিপুরের ভক্তেরা যারা তাঁকে দর্শন করতে যেত, তারা কি আর ফিরে আসবে বলে যেত? উইল করে যেত। ইংরেজ ভক্ত-সেবা করছে। সুতরাং মহাপ্রভুর কৃপা পাবার যোগ্য পাত্র।"

"এই যে হরিনাম সংকীর্ত্তন, যার জন্যে ঘর বাড়ী ছেড়েছিস, চাকরিবাকরি ছেড়েছিস, মাগছেলে ছেড়েছিস্, এই হরিনাম সংকীর্ত্তনকে যদি আপনার করতে চাস ও প্রবল দেখতে চাস, তাহলে ইংরেজের সহায়তার প্রয়োজন। সুতরাং আজ থেকে ইংরেজকে সুহৃদ বলে জানবি। ইংরেজ চরিত্রে যে মহত্ত্ব আছে, তা'হতে শিক্ষা নিবি। তাদের দোষগুলিকে ঘৃণা করিয়া মানুষগুলিকে ভালবাসবি। তোরা পরাধীন বলিয়া তাদের দোষগুলির অনুকরণ করিস, আর মহত্ত্বগুলি দেখতেই পাস না।"

"বিনা অস্ত্রে ভারত স্বাধীন"

একদিন চম্পটী ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদমূলে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ভারতের পরাধীনতা কি মোচন হবে না? আর হবেই বা কি করিয়া? ভারতবাসী শক্তিহীন, অস্ত্রহীন। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে কি দিয়া?"

শ্রীশ্রীপ্রভু একটি কাগজে লিখিলেন,—

"ইংরেজ শাসন—নেড়ে-রাজ ভয়।
ইণ্ডিয়ান-ওসেন ম্যন অব অয়ারে ছেয়ে যাবে।
টুপিওয়ালারা টুপি খুলে সেলাম দিয়ে চলে যাবে।
বিনা অস্ত্রে ভারত স্বাধীন হবে।"

ভক্তবর জয়নিতাইকে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

"কলেজ কোতোয়ালী। দেশ পশ্চিম। তৈলহীন দেশ। উষ্ণ খান্ত ক্ষেত্র। দরকার বাঙ্গালী।"

"তুই অপবিত্র হলি কেমন করে!"

প্রেমের পাগল চম্পটী ঠাকুর রামবাগান হইতে প্রভাতী কীর্ত্তন করিতে করিতে লাটসাহেবের বাড়ী হইয়া ধর্ম্মতলা চৌরঙ্গী হইয়া হকসাহেবের বাজারে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাজার। বাজারের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চম্পটীর প্রেমগাঁথা কীর্ত্তনে নরনারী মুগ্ধ। কেবল আসুরিক শক্তি ক্ষুব্ধ।

কসাইপট্টির মধ্য দিয়া চলিয়াছেন, বেহালবেশে "গুরু

গৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতুহলে” গাহিয়া। কতিপয় দুষ্ট লোক কীর্ত্তন করিতে চম্পটীকে মানা করিল। তারপর ঠেলা মারিল। তারপর তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ করে না দেখিয়া উহারা তাহার গলায় কতগুলি রক্তমাখা নাড়ীভুঁড়ি জড়াইয়া দিল।

চম্পটীর ওদিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নাই। রক্তাক্ত নাড়ী-ভুঁড়িকে পুষ্পমাল্যের মত জ্ঞান করিয়া তিনি আনন্দে হরিহুঙ্কার দিয়া চলিলেন। রামবাগান ফিরিতে বেশ বেলা হইল। পথিমধ্যে গলায় জড়ান নাড়ীভুঁড়িগুলি পড়িয়া গিয়াছে। রক্ত ক্লেদ তখনও গায়ে শুকাইয়া আছে। চাষাধোপাপাড়া আসিয়া চম্পটী কীর্ত্তন শেষ করিলেন।

পরম দয়াল বন্ধুসুন্দর চাষাধোপাপাড়া ভক্ত হররায়ের বাড়ীতে আছেন। চম্পটী মহাশয় নাম ছাড়িয়া দেবার পর-মুহূর্ত্তেই প্রভু তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। একটু নিকটে আসিলে পিপাসার জন্যে পানীয় জল চাহিলেন।

চম্পটী নিজেকে অপবিত্র মনে করিয়া প্রভুকে জল দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। ধীরে বলিলেন, “আমি স্নান করে আসি, তারপর। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, “কেন কী হয়েছে?” চম্পটী মহাশয় তখন পথের কাহিনী সব প্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন।

সব শুনিয়া প্রভু কহিলেন, “যখন ঐসব ঘটে, তখন তোর মুখে কি নাম ছিল? না নাম ছেড়ে দিয়েছিলি?” “না প্রভু, নাম ছাড়ব কেন? খুব নাম করতেছিলাম।” “তবে কি ওদেরে মনে মনে গালি দিচ্ছিলি?” “না প্রভু তাও করি নাই।”

"হাতে করতাল ছিল ত ?" "নিশ্চয়ই ছিল। একমনে নামই কর্‌ছিলাম।"

সবকথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে প্রভুবন্ধু কহিলেন, "তা'হলে তুই অপবিত্র হলি কেমন করে? যার অন্তরে গোবিন্দ, মুখে গোবিন্দ, হাতে করতাল, সে ত মূর্ত্তিমান পবিত্রতা! তাকে অপবিত্র করবে কে ?"

পরম পবিত্র নাম জিহ্বা স্পর্শ মাত্র সর্ব্বজীবকে অসীম কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তোর মুখে ছিল হরিনাম। তুই ত চিরপবিত্র। আজ আর স্নান করতে হবে না। দে, জল দে।"

চম্পটী নিঃসঙ্কোচে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে জল দিলেন। সেই জল প্রভু পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন।

পবিত্রীকরণে নামের মহাশক্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়া চম্পটী আনন্দে হরি হরিবোল বলিতে বলিতে নাচিয়া চলিতে লগিলেন।

ডোম-রমণীদের বীরপণা

চাষাধোপাপাড়া হররায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীপ্রভু আছেন। প্রভু যখন একা থাকিতেন, তখন সেবক যাহারা থাকিতেন তাহারা বাহির দিয়া তালাবদ্ধ করিয়া যাইতেন। প্রভুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা বিশেষ ইঙ্গিতেই দরজা খোলা হইত।

হররায় মহাশয়ের ভাইপো নিতাই। যৌবন বয়স, বেশ

শক্তিশালী চেহারা। দেব দ্বিজে ভক্তি রাখে, তবে একরোখা। নিজে যা ভাল বোঝে তার উপর আর কাহারো কথা শুনতে চায় না। সামান্য কারণে রেগে উঠে। নিতাই প্রভুবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধা করে কিন্তু এতদিন তাদের বাড়ীতে প্রভু আসেন, কোনদিনই সে দর্শন পায় নাই, এ জন্য সে ক্ষুণ্ণ।

নিতাই প্রভুর দর্শন করিবেই। সে প্রভুর সেবক নবদ্বীপ দাসকে বলে, দরজা খুলিয়া দেন। নবদ্বীপ বলেন, প্রভুর আদেশ ছাড়া দরজা খুলিব না। ইহাতে নিতাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রোধিত হইল। দরজা ভাঙ্গিয়া প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সে তখন একদল গুণ্ডা জোটাইয়া নিয়া আসিল।

বাড়ীর লোক ভয়ে ভীত হইয়া নিতাইকে বিরত করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত নিতাই কিছুতেই বিরত হইল না।

যেইমাত্র সে প্রভুর ঘরের তালা ভাঙ্গিবার জন্য উদ্যত হইল, অমনি ডোমপল্লীর ডোম-রমণীগণ সংবাদ পাইল যে, প্রভুর দরজার তালা ভাঙ্গিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া নিতাই প্রভুর ঘরে ঢুকিতেছে। ইহাতে প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে মনে করিয়া ডোম-রমণীগণ ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া দৌড়িয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিল।

তাহারা বীরদর্পে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"নিতের এতবড় স্পর্দ্ধা! দেখবো সে কেমন নিতে। গুণ্ডা জুটিয়ে এনে আমাদের প্রভুর ঘরের দরজা ভাঙতে চায়! আমরা ছেলে মেয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করবো। ও বড়লোকের

ছেলে, ওর মূল্য বেশী। আমাদের কাঙ্গালের ছেলের মূল্য কি ?"

প্রভু বন্ধুসুন্দরের প্রতি প্রীতি স্নেহমাখা আর্ত্তি মিশ্রিত ডোম রমণীদের বীরপণায় পাষণ্ডের প্রাণও কাঁপিয়া উঠিল। গুণ্ডারা দৌড়িয়া পলাইল। প্রভু গৃহে নীরব হইয়া রহিলেন।

মহাভাবাবিষ্ট

ঐ ঘটনার পর শ্রীশ্রীপ্রভু নির্জ্জনতর থাকিবার স্থান ঠিক করিতে আদেশ করেন। নিমতলা ষ্ট্রীটে লাহাপাড়ায় একটি বাসা ঠিক হয়। ৺হররায়ের বাড়ী হইতে প্রভু লাহাপাড়া চলিয়া আসেন। এখানে থাকাকালে অধিকাংশ সময়ই প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত থাকিতেন। নারীবেশ ধারণ করিয়া একেবারে নারী হইয়া যাইতেন। সর্ব্বদা ভাবে টলমল করিতেন।

সর্ব্বদাই একাকী থাকিতেন। চম্পটী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাস বাহির হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। দিনের মধ্যে একবার দুইবার আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। রাধারূপিণী বন্ধুসুন্দরের মোহনমাধুর্য্য এক ঝলক মাত্র দেখিয়া চম্পটী ঠাকুরও ব্রজের সখীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। প্রভুর কোন বিঘ্ন না হয়, এইভাবে অতি সন্তর্পণে ভোগের দ্রব্যাদি গৃহে রাখিতেন নবদ্বীপ দাস। এইভাবে আট দিন

কাটে। এই সময়কার মহাভাবাবিষ্ট বন্ধুসুন্দরের বর্ণনা করা মানুষের লেখনীর অসাধ্য।

নবম দিনে শ্রীশ্রীপ্রভু ঐরূপ রাধা-বেশ-ভূষিত অবস্থায় দালানের ছাদের উপর উঠিয়া কিছুসময় পাইচারী করেন। তখন সন্ধ্যার সময়। প্রভুর রূপের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সন্ধ্যার আঁধার যেন ঘুচিয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর অনেক লোকই প্রভুর নারীবেশ ও রূপের ছটা দর্শন করে।

কতিপয় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির যুবক অনুমান করে যে, নবদ্বীপ দাস ও অতুল চম্পটী কোনও এক সুন্দরী রমণীকে ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছে অসৎ অভিপ্রায়ে। গুণ্ডা জোটাইয়া অনেক লোক প্রভুর বাড়ী ঘেরাও করে। চম্পটী ও নবদ্বীপ দাস আসিলে তাহাদিগের উপর কঠোর গালিবর্ষণ করে ও দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করে। তাহারা বিপদাশঙ্কায় কিছুতেই রাজী হন না। এই ব্যাপার লইয়া ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

পরদিন শ্রীশ্রীপ্রভু নিজ শক্তিবলে ঐ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যান। পুনরায় চাষাধোপাপাড়া হররায়ের বাড়ীতেই চলিয়া আসেন।

"আজ হতে কথা বন্ধ করলাম"

এই সময় প্রভুর কথাবলা ক্রমেই কমিতে লাগিল। অধিকাংশ বিষয়ই কাগজে লিখিয়া দেন। অতি দরকারী কথা ছাড়া বলেন না। চম্পটী ঠাকুর ও নবদ্বীপ দাস এই দুইজন ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা মোটেই বলেন না।

সর্ব্বদাই ভাবে ঢলঢল থাকেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাওয়াও কমিতে লাগিল।

একদিন নবদ্বীপকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ হতে কথা বন্ধ করলাম।" তখন রাত্রে রাত্রে গড়ের মাঠে খুব বেড়াইতেন। নবদ্বীপ সঙ্গে থাকিতেন বটে কিন্তু বেড়াইতেন যেন একাকী নীরবে। সঙ্গে যে কেহ আছে ইহাও যেন মনে নাই। শ্রীশ্রীমুখের পূর্ব্ববৎ কথা শুনিতে না পাইয়া নবদ্বীপ খুব ব্যথা অনুভব করিতেন। জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে (১৩০৯) শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ দাসকে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর চলিয়া আসেন।

ফরিদপুর পৌঁছিয়া শ্রীঅঙ্গনেই উঠেন। প্রভুর ঘরখানি তখন অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে কোন সময় ভূমিস্মাৎ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রীঅঙ্গনে মাত্র একদিন বাস করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বদরপুর বাদল ভবনে চলিয়া যান।

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠাকালে ভক্ত কুঞ্জবিহারী সাহার তত্ত্বাবধানে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা পাকাপোক্ত হইয়াছিল না। সমস্ত খুঁটিই ছিল কাঁচা বাঁশের। তিন বৎসর হইতে না হইতে সকল জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সকল ভক্তই বুঝিলেন, ঐ

চালার তলায় প্রভুর অবস্থিতি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। নূতন ঘর তুলিবার ভার দেন প্রভু কৃষ্ণদাস ও নবদ্বীপ দাসের উপর।

তাহারা তাড়াতাড়ি কোন উপায় না দেখিয়া পাবনা জেলার নগরবাড়ী গ্রামে চলিয়া যান। ওখানে বিহারী সাহা মহাশয় প্রভুর কৃপা-দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়া সেবানন্দে ডুবিয়া আছেন।

সাহা মহাশয় প্রভুর গৃহের জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি ও চাল নির্ম্মাণ করিয়া বাঁশের দ্রব্যাদি অর্পণ করেন। জলে ভিজাইয়া ঠিক করিয়া ঐ সকল ফরিদপুর আনিয়া ঘর তুলিতে দুই মাস সময় লাগে। এই সময় প্রভু বদরপুরেই অবস্থান করেন।

নগরবাড়ী হইতে প্রভুর গৃহের দ্রব্যাদি আসার কথা পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে।* স্পষ্টতর করিবার জন্য বলা হইতেছে যে, ১৩০৬ সনে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা কালে যে গৃহ হয়, উহা জীর্ণ হইয়া গেলে ১৩০৯ সনে দ্বিতীয়বার যে গৃহ হয় উহার সাজসরঞ্জামই নগরবাড়ী হইতে আসে। এই দ্বিতীয়বার নির্ম্মিত গৃহেই শ্রীশ্রীপ্রভু সপ্তদশবর্ষকাল মহানির্জ্জন বাস করেন। বিহারী সাহার দানে ও কৃষ্ণদাস নবদ্বীপদাসের প্রচেষ্টায় এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গৃহ নির্ম্মিত হইলে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু কৃষ্ণদাসজীকে একখানি কাগজে লিখিয়া দেন—"ত্রিকালে সর্ব্বোত্তম সেবা চালাইবা। আমার কাছে কিছু পাবে না। পাল্কী লইয়া আস।" পাল্কী আসিলে শ্রীশ্রীপ্রভু বাদল ভবন হইতে শ্রীঅঙ্গনে চলিয়া আসেন।

*১২৮৬ পৃষ্ঠা

"কৃষ্ণদাস প্রেমসেবা পিয়াসী বন্ধু"

সেবাইত — শ্রীকৃষ্ণদাসজী

"মানবজন্ম পাপ করিবার জন্য নয়, কৃষ্ণসেবার জন্য"

বদরপুর বাদলভবনে থাকাকালে একদিন দেবী নিস্তারিণীকে ডাকাইয়া আনিলেন। দেবী প্রভুর বাল্যবেলার খেলার সাথী। প্রভুর প্রতি পরম অনুরাগিণী। দেবী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই বন্ধুসুন্দর বলিলেন,—

"দ্যাখ নিচু, হরিনাম ছাড়া জীবের পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। নাম ভুলিস্ না। আমাকে বিশ্বাস করিস। জেঠী দেহত্যাগ করেছেন, তার গতি হয় নাই। তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।"

প্রভুর মুখে জন্মান্তরের কথা শুনিয়া নিস্তারিণীদেবী মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, তিনি বৈশ্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন।" এইসব বলিয়া পরে বলিলেন, "নিচু, তুই খুব সাবধানে থাকিস। নিজের কাজ করে যা। নিজের কাজ না করলে গতি ভাল হবে না। মানবজন্ম পাপ করিবার জন্য নয়, কৃষ্ণসেবার জন্য।"

এইকথা বলিয়া ভজন সম্বন্ধে আরও কতিপয় উপদেশ দিলেন। এই নিস্তারিণীদেবীকেই শৈশবে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আমি গৌরাঙ্গ, পরে জানবি।" আজ দেবী অন্তরের অন্তরে জানিয়াছেন, প্রভু বন্ধুসুন্দর গৌরসুন্দরের অভিন্ন প্রকাশ। জানিয়া তাঁহারই পাদপদ্মে জীবন বিকাইয়াছেন। জগদ্বন্ধুসুন্দর ছাড়া দেবী আর কিছুই জানিতেন না। শেষ পর্য্যন্ত জয় জগদ্বন্ধু

জপিতে জপিতে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনের রজে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐদিন বদরপুরে পূর্ণ নামক এক ব্যক্তি নিস্তারিণীদেবীর সঙ্গে আসিয়াছিল। সে অদূরেই বসিয়াছিল। প্রভু তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বড়দিদি দিগম্বরীদেবীর শ্বশুর মহাশয় সম্বন্ধে একটি গোপন কথা বলিয়া দিদির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীও বাড়ী আসিয়া সব কথা দিদিকে কহিলেন।

সব কথা শুনিয়া দিদি ভাবিলেন, তার শ্বশুরের গোপনকথা জগৎ কেমন করিয়া জানিল ? নিশ্চয়ই জগৎ অন্তর্য্যামী। সে যে অনেক সময়ই বলে "আমিই শ্রীহরি" একথা বোধকরি ঠিকই। বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী স্নেহপ্রবণা দেবী দিগম্বরী আবার ভাবিলেন, হয়ত কোন দৈবশক্তি প্রভাবে জগৎ ঐসব কথা বলে ও ঐরূপ কার্য্য করে। ঐশ্বর্য্য চিন্তায় পাছে প্রীতি শিথিল হয়, এই ভয়ে যোগমায়াদেবী দিদিকে ওসব ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতে দেন না। তাঁহার কোলের জগদ্বন্ধু সাক্ষাৎ শ্রীহরি, এই চিন্তা সাময়িক জাগিয়া উঠিলেও দিদির চিত্তে উহা স্থায়ী আসন পাতিবার সুযোগ পায় না।

"যম তো উদ্ধার হয়ে গেছে"

গোপাল মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে কোনও কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "জেঠা, পাপ নাই, যম তো উদ্ধার হয়ে গেছে।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, তাহা হইলে আমাদের হরিনাম করিবার দরকার কি ?"

প্রভু বলিলেন, "ধর্ম্ম আছে আর অপরাধ আছে। হরিনাম করাই ধর্ম্ম। পাপ ও অপরাধ এক নয়। তেমনি পুণ্য ও ধর্ম্ম এক নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধর্ম্ম অক্ষয়, পুণ্যে স্বর্গ হয়। ভক্ত স্বর্গ চায় না, সে চায় ধর্ম্ম।"

"ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ। সদা কৃষ্ণ স্মৃতি। গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু। আমাকে বিশ্বাস করিস। ছাখ, তোদের মত মূতো-মূতিতে আমার জন্ম নয়। দীনুর স্ত্রীর কখনও গর্ভ হয় নাই জানিস্।"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, ওসব কথা আর বলিবেন না। লোকে অমনি বলে, আপনার উপর পরীর দৃষ্টি আছে। একথা কেহ বিশ্বাস করবে না।" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "আর কাহাকেও বলব না। তোকেই বললাম। সময়ে সকলে বুঝবে।"

লোকনাথ সরকার

ফরিদপুর সহরের উপকণ্ঠে পূর্ব্ব উত্তর প্রান্তে কমলাপুর গ্রাম। ঐ গ্রামের ভগবান চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্র লোকনাথ। বাল্য বয়সেই লোকনাথ প্রভুর দিকে আকৃষ্ট হন। লোকনাথ প্রভুর ছয় বছরের ছোট। প্রভু যখন ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়েন, লোকনাথ তখন বাংলাস্কুলে নিম্ন শ্রেণীতে পড়েন। বাংলাস্কুল জেলাস্কুলের পশ্চিম দিকে নিকটেই অবস্থিত।

প্রভুবন্ধুর অঙ্গ-সৌন্দর্য্য, চলনভঙ্গি, বেশভূষা, সবই ছিল স্বতন্ত্র। উহা সকল ছাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। লোকনাথ এক দৃষ্টিতে প্রভুবন্ধুর দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। প্রাণের মানুষ বলিয়া মনে করিতেন।

বালক রাধিকাগুপ্ত (রামদাস বাবাজী) লোকনাথের সহপাঠী ছিলেন। ফরিদপুর বাজারের জলধর ঘোষ ঐ স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। জলধর প্রভুর ভক্ত ছিলেন। জলধরের সঙ্গে বিশেষ ভাব থাকায় রাধিকা প্রভুর দিকে অগ্রসর হন। আবার রাধিকার সঙ্গে প্রীতির ভাব থাকায় তাহার মাধ্যমে লোকনাথও প্রভুর দিকে আকৃষ্ট হয়েন। রাধিকার মুখে প্রভুবন্ধুর কথা শুনিয়া শুনিয়া লোকনাথ প্রভুর আপন জন মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। রাধিকা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াই প্রভুবন্ধুর করুণায় বৈরাগ্য লাভ করেন।

ইং ১৮৯৩ সালে লোকনাথ এম, ই, পাশ করিয়া ঈশান স্কুলে

শ্রীলোকনাথ সরকার

শ্রীনকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ভর্ত্তি হন। রাধিকার সঙ্গ হারাইয়া লোকনাথ প্রাণের সঙ্গী পাইতেছিলেন না। ইহার দুই বৎসর পর রমেশচন্দ্র ঈশান স্কুলে শিক্ষক হইয়া আসেন। তাহার স্নেহদৃষ্টি পাইয়া লোকনাথের ছাত্রজীবন পূর্ণ হইয়া উঠে।

ছাত্রজীবনে রমেশচন্দ্র Band of Hope (আশাদল সমিতি) পরিচালনা করিতেন। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, মাদক বর্জ্জন ও ছাত্রদের মধ্যে শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন। লোকনাথ ঐ সমিতির সভ্য ছিলেন। সেই সময় রমেশচন্দ্রের সঙ্গে মাত্র পরিচিত হন, হৃদ্যতা জন্মে নাই। রমেশচন্দ্র শিক্ষক হইয়া আসিলে তাহার স্নেহে আদর্শে ও উপদেশে লোকনাথের জীবন নূতন রূপ ধারণ করে। এই সময় সুরেশচন্দ্র, অক্ষয়, সুরেন্দ্র, নকুলেশ্বর, উপেন্দ্র প্রমুখ যে সকল বালক রমেশচন্দ্রের আকর্ষণে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করে, লোকনাথও তাহাদের অন্যতম। এই বালকভক্তদের কথা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

সকল বালকদেরই বাড়ীতে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, রমেশচন্দ্রের দেওয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের জন্য। লোকনাথের গৃহে অভিভাবক ছিল না। সাত বৎসর বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় বিধবা মাতাই তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। লোকনাথ মাতাকে অসীম শ্রদ্ধা করিতেন। লোকনাথ সাধ্যমত মাতৃদেবীর মন রক্ষা করিয়া রমেশচন্দ্রের উপদিষ্ট নিয়ম পালন করিতেন।

লোকনাথের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ছাত্র পড়াইয়া পড়ার খরচ জোগাড় করিতে হইত। ফরিদপুর

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হেডক্লার্ক পূর্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া লোকনাথ তাহার ছেলে পড়াইতেন। এই কারণে সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি যেরূপ নিয়মিত ব্রাহ্মণকাঁদার বাড়ী প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতেন, লোকনাথ তাহা পারিতেন না।

ঐ সময় ফরিদপুর শ্রীমদ্ হরানন্দ অবধূত নামক একজন সাধক পুরুষ আসেন। ইনি মেতরার অর্দ্ধকালীর সন্তান। পূর্ণবাবু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে মাইনর স্কুলের হেড্পণ্ডিত রাসবিহারী মুখোটী ও রমেশচন্দ্রের অগ্রজ জ্যোতিষ-বাবু প্রমুখ ফরিদপুরের অনেক বিশিষ্ট লোক তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। লোকনাথও তাঁহার যোগবিভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এইরূপ ভাবে অন্যত্র দীক্ষিত হওয়াতে রমেশচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুভক্তগণের স্নেহ প্রীতি হইতে লোকনাথ এক বিন্দুও বঞ্চিত হন নাই। তিনি যোগসাধনায় কিছুটা অগ্রসর হন। রমেশচন্দ্র ফরিদপুরের শিক্ষকতা ছাড়িয়া ঢাকাতে ইম্পিরিয়াল সেমিনারিতে শিক্ষক হইয়া যান। ঘটনাচক্রে লোকনাথও ঢাকা যান। যাহার বাড়ী তিনি গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, সেই পূর্ণবাবু ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হেডক্লার্ক হইয়া যান। লোকনাথও তাহার সঙ্গে যান। পূর্ণবাবুর বাসা ছিল উয়ারীতে। রমেশচন্দ্রও তাহার অনুগতদের লইয়া উয়ারীতে এক মেস-বাড়ী কিছুদিন ছিলেন। উয়ারীতে তখন বহু ব্রাহ্মসমাজের লোক বাস করিতেন। রমেশচন্দ্র তাহার সঙ্গীগণ সহ প্রত্যহ প্রভাতী টহল কীর্ত্তন করিয়া ঐ ব্রাহ্মপল্লী মুখরিত করিয়া রাখিতেন।

লোকনাথও প্রভাতী কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। সন্ধ্যাবেলাও যোগ দিতেন। শেষরাত্রে টহলে বাহির হইয়া সকলে বুড়ী-গঙ্গায় স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। রমেশচন্দ্র পরে টিকাটুলী রামশাহ মহাশয়ের বাগানে গিয়া থাকেন। ওখানে প্রভু আসেন বহুবার। লোকনাথ ওখানে আবার শ্রীশ্রীপ্রভুর ও প্রভুর ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করেন। রাধাবল্লভ, পূর্ণচন্দ্র, কালিন্দীমোহন, সুধন্বকুমার প্রভৃতি সকলের সহোদর তুল্য ছিলেন লোকনাথ।

"ভয় নাই আমিই আছি"

লোকনাথ ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়েন। বি, এ, পরীক্ষার পূর্ব্বে ভীষণ ভাবে জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। ব্যাধির তাড়নায় যখন শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, তখন তাহার এক অনুভূতি হয়। কাহিনীটি তাহার নিজ ভাষাতেই বলিব—

ভীষণ জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছি। মুখে অস্ফুট স্বরে প্রভু প্রভু বলিতেছি। আমি প্রভু জগদ্বন্ধুকে, আমার মন্ত্রদাতা গুরুদেবকে ও আমার দীক্ষামন্ত্রের আরাধ্য মূর্ত্তিকে "প্রভু" বলিয়া ডাকি। প্রভু আমার ধারণা জন্মাইয়াছেন যে, এই তিন-ই এক। কষ্টে পড়িলে প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকি। এরূপ ডাকিতে ডাকিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। শেষ রাত্রে যেন জাগ্রত অবস্থায় দেখিতেছি, এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার পার্শ্বে বসিলেন। জ্যোতির মধ্যে তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি আমার আরাধ্য জগদ্বন্ধুসুন্দর। দিব্যগন্ধে ও দিব্য জ্যোতিতে ঘরখানি

উদ্ভাসিত ও বিমোহিত। আমার মন প্রাণ ও চক্ষু মহামাধুর্য্যে নিমজ্জিত। মুখে বাক্য সরে না। কেবল বিহ্বল চিত্তে তাকাইয়া রহিলাম। আশা মিটে না। কি যেন কেমন হইয়া গেলাম। প্রভু আমাকে দুই হাতে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় নাই আমিই আছি।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া লোকনাথের মনে হইল যেন নবজীবন লাভ করিয়াছেন।

"কীর্ত্তন করিও ও করাইও"

শ্রীশ্রীপ্রভু তখন ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে নিজ মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। লোকনাথ গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছেন। শ্রীঅঙ্গন তখন ভরপুর। বহুদিন পর প্রভুর দর্শনে লোকনাথ আনন্দে অধীর। শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্তে একখানা কাগজ লিখিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। লোকনাথ কাগজখানি তুলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—

লোকনাথ ও ডাক্তার পূর্ণ!
প্রতিদিন টহল
প্রতিদিন কীর্ত্তন
কীর্ত্তন করিও ও করাইও
প্রতি পরীক্ষায় পাশ।

প্রভু প্রসাদ পাঠাইয়াছেন

গ্রীষ্মকাল। পথ পর্য্যটনে ও ক্ষুধায় কাতর লোকনাথ একাকী শ্রীঅঙ্গনে আসিয়াছেন। কোন উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তনানন্দ চলিতেছে। প্রভুর মন্দিরের পশ্চিম দিকে যে তেতুল গাছটি ছিল, তাহার দক্ষিণদিকে একটি ছোনের দোচালা ঘর ছিল। ক্লান্ত ও ক্ষুধাতুর লোকনাথ ওখানে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন।

হাতে এক থালায় মুড়িমুরকী আম ও মিষ্টি লইয়া একজন ভক্ত লোকনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনি কি লোকনাথ ?" লোকনাথ বলিলেন, "হাঁ আমি লোকনাথ, কেন বলুন ত ?" ভক্তটি বলিলেন, "প্রভু আপনাকে এই প্রসাদ পাঠাইয়াছেন।" লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এখানে প্রভু জানিলেন কিরূপে ?" ভক্ত বলিলেন, "তা জানি না, তিনি লোকনাথ নামক ভক্তকে এই প্রসাদ দিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি আঙ্গিনা খুঁজিয়া আপনাকে না পাইয়া প্রভুর কাছে ফিরিয়া গেলে তিনি বলিলেন, "তেতুল গাছের দক্ষিণে ছোনের ঘরে বসিয়া আছে।"

ভক্তটির কথায় লোকনাথ কেবল যে প্রভুর অন্তর্য্যামিত্বে বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, প্রভুর অপার স্নেহ করুণার কথা ভাবিয়াও অভিভূত হইলেন।

আর দ্বিধা রহিল না

লোকনাথের নিজ ভাষায় লিখিতেছি—"প্রভু আমাকে দর্শন দিয়া কৃপা করার পর আমি এক দ্বিধায় পড়িলাম। আমার দীক্ষাগুরু শ্রীহরানন্দ, আর অযাচিত কৃপাকারী জগদ্গুরু জগদ্বন্ধু। এই দুই বস্তু একটি হৃদয়ে ধারণ করা যায় কি প্রকারে ? যদিও প্রভু বলিয়াছেন "আমার একাধারেই সব" তথাপি দ্বিধা ঘুচিতে চায় না।

একদিন নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতেছি, গুরুদেবকে নিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছি। আঙ্গিনায় লোকজন নাই। আমরা উভয়ে আঙ্গিনার সম্মুখে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই প্রভু সম্মুখের দরজা খুলিয়া দর্শন দিলেন। কি যেন একটু ইঙ্গিত করিতেই গুরুদেব গিয়া প্রভুতে মিলিয়া গেলেন। ইহার পর আমার আর কোন দ্বিধা রহিল না।

শ্রীফল বিল্বসংজ্ঞক

একবার লোকনাথের পৃষ্ঠে কার্ব্বাঙ্কেল হয়। অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠে। অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া কার্ব্বাঙ্কেল ভীষণ ভাব ধারণ করে। সন্ধ্যাবেলা জাগ্রত অবস্থায় দেখিলেন, প্রভু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঔষধ বদলা"। প্রভুর দর্শনে ব্যাধি প্রায় নিরাময় হইয়া গেল। পরদিন চিকিৎসককে ঔষধ বদলাইবার কথা বলিলে চিকিৎসক স্বীকার করিলেন, দুইদিন পূর্ব্বেই ঔষধ পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল।

আর একবার ভয়ানক ভাবে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন

লোকনাথ। পেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে ব্যাধি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। শেষ-রাত্রে বন্ধুসুন্দর বলিলেন, অর্দ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় লোকনাথ স্পষ্ট শুনিলেন, "শ্রীফল বিল্বসংজ্ঞক ঔষধ পথ্য চ।"

ঠিক ঐ সময়ই লোকনাথের ঘরের পিছনদিকের বেলগাছ হইতে একটি বেল পড়িল টীনের ঘরের চালার উপর বেশ শব্দ করিয়া। ঐ শব্দে নিদ্রাবেশ টুটিয়া যায়। বেলটি আনাইয়া পোড়াইয়া খাওয়ান হইল। অতি অল্প সময় মধ্যে ভীষণ ব্যাধি নিরাময় হইয়া গেল।

লোকনাথ বলেন, "প্রভু আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন। দেহকে বাঁচাইতেছেন ব্যাধি হইতে। মনকে রক্ষা করিতেছেন বিষয় বাসনা হইতে। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে বহুদিন তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইয়াছি। এখনও পাই।"

নগরবাড়ী বিজয়

শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আছেন। কথা বলা বন্ধ করিয়াছেন। লিখিয়া দুই চার কথা জানান মাত্র।

নগরবাড়ী পাবনা জেলায় একটি বিশিষ্ট গ্রাম। ঐ গ্রামে পরম ভক্ত বিহারী সাহা বাস করেন। তাহার সঙ্গ প্রভাবে আরও বহু সজ্জন বন্ধুসুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কালিকা-বাড়ী নিবাসী ভক্তকুলমণি পূর্ণ শিকদার মহাশয়ের সঙ্গে বিহারী সাহার বিশেষ সৌহার্দ্দ। পূর্ণ শিকদার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া

বিহারী শ্রীশ্রীপ্রভুর কাছে গিয়া তাঁহাকে নগরবাড়ী যাইতে নিবেদন করিলেন। প্রভু স্বীকার করিলেন।

তাহারা পাল্কী আনিতে গেলেন। কৃষ্ণদাস প্রভুর দ্রব্যাদি গোছাইয়া দুই ট্রাঙ্কে বোঝাই করিলেন। এমন সময় বাকচর-বাসী ক্ষুদীরাম আসিলেন সেবার দ্রব্য লইয়া। কৃষ্ণদাস বলিলেন, "ক্ষুদীরামদা, প্রভু ত কাল পাবনা যাবেন। তুমি এই ট্রাঙ্ক দুটি কেদার কাহার বাড়ী রাখিয়া আস।" ক্ষুদীরাম আদেশ পালন করিলেন ও রাত্রে শ্রীঅঙ্গনে বাস করিলেন।

বিহারী ও পূর্ণ শিকদার মহাশয় প্রভুর পথে সেবার জন্য দ্রব্যাদি লইলেন। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পাল্কীযোগে রওনা হইলেন। ভক্তগণ সেবার দ্রব্যাদি লইয়া ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী আসিতে বিলম্ব ছিল। নিকটস্থ স্কুলঘরে প্রভুকে বসাইয়া বাল্যভোগের জোগাড় করা হইল। প্রভু কিছু গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। ট্রেণ আসিলে সকলে প্রভুকে লইয়া ট্রেণে আরোহণ করিলেন। ট্রেণ গোয়ালন্দ পৌঁছিলে পরবর্ত্তী ষ্টীমার আসিবার যেটুকু বিলম্ব ছিল, সে সময়টুকু প্রভুবন্ধু পুনরায় প্রিয় শরচ্চন্দ্রের সেবা গ্রহণ করিলেন।

কালীগঞ্জের ষ্টীমার আসিলে প্রভু ভক্তগণ সহ তাহাতে আরোহণ করিয়া নগরবাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। বহু ভক্ত পাল্কী লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুদর্শনে অসংখ্য ভক্তমধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের-উল্লাস দেখা গেল। ভক্তবৃন্দ-দর্শনে ও কীর্ত্তন শ্রবণে আনন্দিত হইয়া নীরব প্রভু মধুর হাসিলেন। সে হাসিতে সকলের মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল।

কাঙাল রজনী

অগণিত নরনারী স্রোতের মত চলিতে লাগিল, প্রভুর পাল্কীর পশ্চাতে। এখন সমস্যা হইল, প্রভু কোথায় উঠিবেন ইহা লইয়া। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ধনী মানী সকলেই আসিয়া প্রভুবন্ধুকে নিজ নিজ গৃহে নিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু বন্ধুহরি আর কাহারও বাড়ীতে না যাইয়া যুগীবংশীয় কাঙাল ভক্ত রজনীনাথের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। এত শত বিশিষ্ট বাড়ী থাকিতে, কাঙালের ঠাকুর এক দীনহীনের পর্ণ কুটিরে পাদপদ্ম দিয়া কাঙাল ঠাকুর নাম সার্থক করিলেন।

যাহাদের গৃহে প্রভু গমন করিলেন না, তাহারা কেহই মনে কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিলেন না। প্রভুর কাঙাল-প্রিয়তা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন ও সকল গ্রামবাসী মিলিত হইয়াই প্রভুর সেবাদি ও ভক্তবৃন্দের সেবাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেবা হইল কীর্ত্তন। সকলে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

বৃদ্ধা রজনীর মা দশজন মানুষের মত শক্তি লইয়া ছুটাছুটি করিয়া ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কাঙ্গাল রজনীনাথের ক্ষুদ্র গৃহে দ্বাপরের বিদুরের বাড়ীর শোভা-মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

সেবাইত কৃষ্ণদাস প্রভুর সেবায় রন্ধনাদি করিলেন। বালক বালিকারা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বন্ধুসুন্দরকে সাজাইলেন। কেহ বা শ্রীঅঙ্গে পুষ্প তুলসী চন্দন ছড়াইল। কেহ বা ব্যজনী

লইয়া বীজন করিতে লাগিল। কেহ বা নয়ন ভরিয়া রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে লাগিল।

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাহি আন।"

কয়েক দিন পর শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন। পাল্কী আসিল। প্রভু বহিরঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রজনীর মা প্রভুর পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য তুলসী চন্দন পুষ্প লইয়া আসিয়া প্রণতা হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু আসন করিয়া বসিলেন। রজনীর মা প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ অনেকেই এই সুযোগে শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিল। একটু সময় পর শ্রীশ্রীপ্রভু ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রজনীর বাড়ী আজ মহাতীর্থ। প্রভু স্বয়ং সেই তীর্থ-ভূমির রজঃ গায়ে মাখিলেন।

কিছুক্ষণ ধূলায় গড়াইয়া একখানি কাল ফিতা পেড়ে কাপড় পরিধান করিয়া দিব্য কন্দর্প-বিজয়ী মূর্ত্তিতে পাল্কী আরোহণে ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরবাড়ীর পুরুষনারী বন্ধু-সুন্দরকে পাইয়া যেমন আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়াছিলেন, আজ আবার তাঁহাকে হারাইয়া বিরহের দাবদাহনে তেমন দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

নগরবাড়ীর সহস্র সহস্র ভক্তপ্রাণের সজল নয়ন যতদূর পর্য্যন্ত ষ্টীমার দেখা যায় ততদূর পর্য্যন্ত ছবির মত তাকাইয়া রহিল।

কালিকাবাড়ী বিজয়

শ্রীশ্রীপ্রভুর নগরবাড়ী গমনে গ্রামখানিতে অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ বহিয়া গেল। পূর্ণ শিকদার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাহার অত্যাগ্রহেই শ্রীশ্রীপ্রভু নগরবাড়ী যাইতে সম্মতি দিয়াছিলেন।

শিকদার মহাশয় প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। নগরবাড়ীর আনন্দ দর্শন করিয়া তাহার মনে সাধ জাগিল প্রভুকে নিজ গ্রামে কালিকাবাড়ীতে লইয়া যাইবার। ভক্তের অন্তর ভগবান জানিতে পারিয়াছেন। শিকদার মহাশয় একদিন শ্রীচরণে বিশেষভাবে অনুনয় বিনয় করিতেই বন্ধুসুন্দর হাসি মুখে স্বীকৃতি দেন।

ভক্তবর পূর্ণ পূর্ণানন্দে মাতিয়া বহুভক্ত সমভিব্যাহারে বন্ধু-সুন্দরকে লইয়া কালিকাবাড়ী গমন করেন। গোয়ালন্দ হইতে পাবনাগামী ষ্টীমারে কালিকাবাড়ী যাইতে হয়।

শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনে কালিকাবাড়ী গ্রামখানি পরম আনন্দ সাগরে ভাসমান হইল। গ্রামের প্রত্যেকটি পুরুষ-নারী বালকবৃদ্ধ বন্ধুসুন্দরের দর্শনলাভে ধন্য হইল। যদ্যপি প্রভু কোন শব্দ উচ্চারণ করিলেন না, তথাপি তাঁহার মধুর হাস্যময় দৃষ্টিখানি সকলের মনপ্রাণ নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিয়া-ছিল। সকলেই পাদপদ্ম স্পর্শে মানবজন্ম সফল করিয়াছিল।

ভক্তবর পূর্ণ শিকদার মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভু একটি কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

"যম বিষ সন্ধান"

এই কথায় অর্থ শিকদার মহাশয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে একদিন তাহার ভক্তিমতী পত্নীকে সর্পে দংশন করে। ওঝারা অনেক ফু ফা করিয়া বিষ নামাইতে অক্ষম হইয়া বিদায় দিয়া যায়। তিনি তখন 'যম বিষ' কথা দুইটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন। তখন অনুসন্ধান কর্ত্তব্য ইহাই তৃতীয় শব্দের তাৎপর্য্য, ইহা বুঝিয়া মানসে বন্ধুসুন্দরকে সন্ধান করিতে থাকেন অর্থাৎ মনে গভীরভাবে বন্ধুসুন্দরের অনুধ্যান করিতে থাকেন। তখন সূক্ষ্মভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু দর্শন দেন ও শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে মৃতকে সঞ্জীবিত করেন।

কোনও সময় শিকদার মহাশয়ের মনে গৃহত্যাগ করতঃ নবদ্বীপ ধাম যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা জাগে। শ্রীশ্রীপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়া দেন,—

গৃহত্যাগ—অকৃতি।
কর্ম্ম ভিন্ন কাল নয়।
সর্ব্বকার্য্যে দায়ী নর॥

সংসারের কর্ত্তব্যকার্য্য ত্যাগ করিয়া তীর্থবাস করা শ্রীশ্রীপ্রভুর অভিপ্রেত নয় বলিয়া পূর্ণচন্দ্র বুঝিতে পারেন। তিনি তদবধি সংসার ত্যাগের বাসনা পরিহার করিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণব ভাবে নিজবাড়ীতেই বসবাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

মহামৌন মন্দির

ফরিদপুর সহরের পশ্চিমপ্রান্তে যশোহর রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত শ্রীঅঙ্গন। চালিতাগাছটির ছায়ায় পশ্চিম পার্শ্বে প্রভুর শ্রীমন্দির। মন্দির বলিতে একখানি ছোট চালা ঘর মাত্র। বার হাত দৈর্ঘ্য ও নয় হাত প্রস্থ। কয়েকখানা কাঠের খুঁটি ও অনেকগুলি বাঁশের খুঁটির উপর ঘরখানি স্থিত। মাত্র দুইটি দরজা, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে। তাহাও প্রায়শঃ বন্ধই থাকে। ডবল চাটাইয়ের ঘন পুরু বেড়া। জানালা বিহীন। আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না।

ঘরের মধ্যে আটটি পায়া বিশিষ্ট একখানি খাট। তদুপরি একখানি সামান্য শয্যা। ভক্তগণ অনেক সময় তোষক বালিস চাদর মশারী কম্বল দিতেন। তাহা কখনও গ্রহণ করিতেন, কখনও ফেলিয়া দিতেন। শয্যা পরিবর্ত্তনে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী ছিলেন না। সুতরাং শয্যাখানি বহুদিন অপরিবর্ত্তিত।

ঘরে দ্রব্যের মধ্যে একটি কলসী, একটি ঝারি। ঘরে কোনরূপ আলো দিবার ব্যবস্থা নাই। আলো শুধু বালসূর্য্য-বিনিন্দিত শ্রীঅঙ্গের ছটা। অত পুরু ঘেরা বেড়ার মধ্য হইতে গন্ধবহ অঙ্গগন্ধ চুরি করিয়া আনিয়া শ্রীঅঙ্গনের বৃক্ষলতা পশু পাখী ভক্ত অতিথি দর্শক সকলকে বিলাইত। শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা হইতে মৌন হইয়া আসেন। মৌন অবস্থাতেই নগরবাড়ী কালিকাবাড়ী ভ্রমণ করিয়া আসেন। কালিকাবাড়ী হইতে আসিয়া আষাঢ়ের মধ্যভাগ (১৩০৯) হইতে অসূর্য্যম্পশ্য ভাবে ঐ মন্দিরে বাস করেন।

প্রভু নীরব। চারিদিকের প্রকৃতিও নীরব। যেন সর্ব্বত্র মহানীরবতার রাজত্ব। শ্রীঅঙ্গনে যেন মহাগম্ভীরা লীলা-ভূমির পূর্ণ প্রকাশ। সেবকগণ কেহ একটি উচ্চশব্দে কাহাকেও ডাক হাক দেয় না। করতালি দিয়া, অনুচ্চস্বরে হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে, হরিবোল, জয় জগদ্বন্ধু ইত্যাদি কোন এক নামের ধ্বনি দিয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করে।

গোয়ালচামটের নিবিড় অরণ্যমধ্যে মহাগম্ভীরায় মহামৌনী মহাউদ্ধারণ অবতারী ব্রজের বনবিহারী ও নীলাচলের গম্ভীরাচারী বন্ধুহরি শত খুঁটি ঘেরা এক পর্ণ কুটীরে স্বানুভাবানন্দে বিরাজমান।

এই অবস্থায় ষোলবৎসর আটমাস কাল যে লীলা করিয়াছেন তাহা জীববুদ্ধির অগোচর। বন্ধুগতপ্রাণ ভক্তগণের কৃপাশিস্ মাথায় লইয়া পরবর্ত্তী সপ্তম খণ্ডে যথামতি কিঞ্চিৎ আস্বাদনে প্রয়াসী হইব; মনের এই সাধ।

টেপাখোলার দান

প্রেমধ্বনি

শ্রীশ্রীপ্রভু নীরব হইলে ভক্তগণ চারিদিকে কীর্ত্তনানন্দে মুখর হইয়া উঠিলেন। প্রভুর প্রিয় সকল কীর্ত্তন দলেই কীর্ত্তনোল্লাস বাড়িয়া উঠিল। টেপাখোলার দল সকল দল অপেক্ষা নবীন হইলেও একটি অমূল্য সম্পদ দানে সকল কীর্ত্তন-সম্প্রদায়কে তাহারা ঋণী করিয়া দিল।

মথুরানাথ, দীনু বিশ্বাস প্রমুখ ভক্তগণ পূর্ব্বে মহাজনী পদাবলী কীর্ত্তনে অভ্যস্ত ছিলেন। বৈষ্ণবীয় প্রথানুসারে তাহারা কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর সীতানাথ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জয়ধ্বনি দিতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত মধুর পদ পদাবলী কীর্ত্তনকালে তাহাদের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তাহারা মনে করিলেন, প্রভুর রচনা কীর্ত্তন করিতে প্রভুর নামের জয়ধ্বনি দিলে প্রভু কীর্ত্তনে শক্তি সঞ্চার করিয়া আনন্দ দান করিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীপ্রভুই ভক্তবৃন্দের মুখদিয়া তাঁহার অভিনব প্রেমধ্বনি বাহির করিয়া দিলেন।

"জয় জয় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর
প্রেমানন্দে হরিহরি বোল।"

ধ্বনিটি সকলেরই মনের মত হইল। ধ্বনি দিতে সকলেরই মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিত। টেপাখোলাবাসী ভক্তগণ এই ধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন ও এই ধ্বনি দিয়া শেষ করিতেন।

এই অমূল্য দান পাইয়া প্রভুবন্ধুর সকল ভক্তগণই উল্লাসিত হইলেন। সকলেই পরম উৎসাহে ও খোলা প্রাণে এই ধ্বনি গ্রহণ করিলেন।

ধ্বনি কেহ একবার কেহ বা তিনবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তীকালে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারণে ঐ প্রেমধ্বনি আরও একটু নূতন রূপ ধারণ করিলেন। প্রেমানন্দে "হরিহরিবোল" জয় জগদ্বন্ধু বোলের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিল।

কীর্ত্তনারম্ভে ধ্বনি তিনবার উচ্চারণ স্থির হইল। কীর্ত্তনান্তে "জয় জগদ্বন্ধু বোল হরিবোল হরিবোল" তিন উচ্চারণ ও "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" এই ত্রিকাল গ্রন্থোক্ত মহাবাণীর তিন উচ্চারণে টেপাখোলার প্রেমধ্বনি নবসাজে সাজিয়া মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

প্রেমের ঠাকুর নীরব হইলেন। তাঁহার নামের ও প্রেমের ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। নামীকে নীরব দেখিয়াই যেন নাম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

প্রেমধ্বনি

জয় জয় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর
প্রেমানন্দে জয় জগদ্বন্ধু বোল
জয় জয় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর
প্রেমানন্দে জয় জগদ্বন্ধু বোল
জয় জয় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর
প্রেমানন্দে জয় জগদ্বন্ধু বোল
জয় জগদ্বন্ধু বোল হরিবোল হরিবোল
জয় জগদ্বন্ধু বোল হরিবোল হরিবোল
জয় জগদ্বন্ধু বোল হরিবোল হরিবোল
হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু
হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু
হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	২৲
চন্দ্রপাত	৵০
উদ্ধারণ	১৲
সংকীর্ত্তন পদাবলী	৸০
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲
চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু	১৲
মহামৃত্যু রঙ্গ	১৲
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	৷৵০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ১মখণ্ড	২॥০
,, ,, ২য় খণ্ড	২॥০
,, ,, ৩য় ,,	২॥০
,, ,, ৪র্থ ,,	২॥০
,, ,, ৫ম ,,	২৸০
,, ,, ৬ষ্ঠ ,,	৩৲
,, ,, ৭ম ,,	যন্ত্রস্থ
বন্ধুবার্ত্তা	৩৲
বাণীবিজয়	১৲
ব্রহ্মগায়ত্রী	॥০
উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ	২৲
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল	॥৵০
শ্রীশ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল	॥০
বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	৸০
বন্ধু কে ?	৷০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৵০
ত্রয়োদশ-দশা স্মৃতি	১৲
ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও ভারতীয় সাধু	॥০
প্রেমের বাণী	৷৵০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	॥০
প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১৲
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	৸০
গীতাধ্যান ১ম খণ্ড	১৸০
,, ২য় ,,	২৲
,, ৩য় ,,	যন্ত্রস্থ
শ্রীশ্রীকেদারবদ্রী দর্শন	৷০
রামচরিত মানস	১৲
প্রভুর রঙ্গীন শ্রীমূর্ত্তি বড়	৷০
মাঝারী সাদা	৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মানিকতলা মেন রোড়। কলিকাতা—১১

যোগীভূষণ দাস, ৬৭বি, আহিরী-টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীহরিসভা, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ বুক ষ্টল, ১ গড়িয়াহাট মার্কেট বালিগঞ্জ কলিকাতা

কথামৃত ভবন, ১৩/১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা